শুভাশীষ সহ

শ্রীমতী শোভারাণী দেবী

কল্যাণীয়াসু—

কালিয়া (যশোহর)

বৈশাখ, ১৩৪৯

বেড়াইতেছিল। কেউ বা রং বেরং-এর জলফুল ও কলমীর নধর ডগা তুলিয়া ডোঙ্গা বোঝাই করিতেছিল; তাহারাও সসঙ্কোচে 'হা' করিয়া বজরাটার দিকে তাকাইয়া রহিল।

হাটুরেদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল—টেনে যা রে ভাই, টেনে যা, জমিদার মানুষ আস্‌ছে, হয়ত কি মনে ভাববে আবার!......

আবার বৈঠাগুলি একতালে ঝলাৎ ঝলাৎ শব্দে পড়িতে লাগিল। খানিক দূর গিয়া একজন বলিল—বুঝছ খুড়ো, জমিদার বাবু এসেছেন মহালে। ঐ দেখ, বজরা যে গাঁয়ের দিকেই চ'লেছে।

খুড়োর নাম সনাতন। হাটুরে সনাতন নামেই সে বিখ্যাত। খুড়ো ইতর-ভদ্র সবারই সে 'সাধারন খুড়ো'। খুড়ো বলিল—তা ত চ'লেছে, চর্মচক্ষে দেখতেই পাচ্ছি, তা এ পথে কেন বাবা?......নদীর পথ শুকিয়ে গেছে?...

—তা কেন যাবে খুড়ো, বুঝলে না?......পথ সংক্ষেপ করা হ'ল কি!......নদীপথে যে অনেকখানি ঘুর আসতে হ'ত!.....

—তা ত হ'ত, কিন্তু এই বিলের ভেতর কেন বাবা?...নদীর ধারে তোমাদের খাসা কাছারীর বাঁধান ঘাট, সেখানে গিয়ে বজরা ভিড়িয়ে আরাম ক'রে থাক। জমিদার মানুষ জমিদার মানুষের মত থাক। তা সখ ক'রে মরতে এসেছেন এই বিলের ভেতর। না আছে ঘাট, না আছে পাড়, ঝোপ ঝাড় দামের ভেতর জল ঢুকে সব একসাই হয়ে গেছে; গেরস্থর অন্দরে এখন বাঁধ গিয়ে বজরা!......

সকলেই সমর্থন-সূচক-স্বরে মাথা নাড়িয়া বলিল—তা যা ব'লেছ খুড়ো!......

খুড়ো বিজ্ঞের মত এদিকে ঘুরিয়া বসিয়া বলিল—বলি, অন্দর ছাড়া কি-রে বাপু ?…বলি, জল ত বেড়েছে আর বাড়ছে, ত পথ ঘাট এক রকম ডুবেছেই।…কি বল হে যদু ?…

যদু বলিল—সে কথা আর বলতে, খুড়ো! ভালই হ'ল। জমিদার নিজে চোখে দেখে গেল এ-সব।

খুড়ো রাগিয়া উঠিল, বলিল—ওঃ দেখে গেলেন ত সবই হ'ল। আসুক না চৈত মাস, মজা কত দেখতে পাবে'খন, যখন কাছারীর পাইক বরকন্দাজ এসে চড়াও হবে তোমার বাড়ীর ওপর। রায়বংশের জমিদারীতে যেন নতুন বাস ক'রছ, না ?……

তারিণী বলিল—তা ত হ'ল খুড়ো, তা ইনি মনিষ্যি কি রকম তা কি কিছু জেনেছ ?……বুড়ো জমিদার ত আমাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে রেখে গেছে। খাজনা দিতে একটু দেরী হ'লেই সুদ—সুদের ওপর সুদ, মাপ টাপ নেই। আমরা চাষা-ভূষা মানুষ—কথা কইতে গেলেই নায়েব মশাই আবার জুতো নিয়ে তাড়া করে আসে। বলি, ইনি ত সেই বুড়ো জমিদারেরই ছেলে গো, এখন হয়েচেন আমাদের নতুন জমিদার; তা ইনি মানুষটা কি রকম ?……

খুড়ো বলিল—কেউটের বাচ্ছা কেউটেই হয় রে বাবা, কেউটের বাচ্ছা কেউটেই হয়। ছোট হ'লেও বিষ একই। ভগবান যদি না মারেন, তা হ'লে দু'চার আনা সুদ দিতে আর সময় মত খাজনাটা ফেলে দিতে কি আর বাধেরে বাবা ?…আর বছর ত আশা ছিল সোণার ফসল ফলবে, তা দেবতা এমন বাধই সাধলেন যে, এক ফোঁটা জলও আকাশ থেকে ফেলতে যেন তাঁর কষ্ট হ'ল। বলি, ফসল যে হ'ল না, লোকে যে না খেয়ে

উপোস ক'রতে লাগল, সে খবরটা কি আর জমিদার বাবুরা জানতেন না? কিন্তু বাপধন, কাছারীর খাজনাটা কি কেউ বন্ধ ক'রতে পেরেছিলে? ...ঐ চোটে ত কত ব্যাটার লাঙল গরু ছাড়তে হ'য়েছে।......আর এবার ত ভেবেছিলাম, দু'বছরের ফসল একবারেই পাব। দেখ মাঠের অবস্থা, কি ভাবে জল বেড়েছে! শোন পাগলা খালের ডাক! বাপ্, বুকে এসে যেন ঘা লাগে।...

তারিণী বলিল—তা যা বলেছ খুড়ো—তবে কি জানো—সবই এইখানটায়...

বলিয়া ললাটে হস্ত স্পর্শ করিয়া সকলের মুখের উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া বলিল—সবই বরাত, নইলে, যে-গাঁয়ের একপাশে এমন চমৎকার নদী আর একপাশে এই এত বড় ধেনো মাঠ—সে গাঁয়ের লোকদের আজ ভাত-কাপড়ের কষ্ট হবে কেন, বলো?...

কথাটা সত্য। এত বড় বিল সহসা নজরে পড়ে না।

গ্রামের শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দূরে বহুদূরে একেবারে দিগন্তের শেষে নজরে পড়ে শুধু অস্পষ্ট সবুজ রেখা।...হেমন্তের অবসানে যখন ঘরে ঘরে নবান্নের ধুম পড়িয়া যায়, তখন এই দিগন্তবিস্তৃত বড়দলের মাঠের দিকে তাকাইলে আশায় উদ্দীপনায় মানুষের মন সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। মনে হয় সারা মাঠটিতে কে যেন কাচা সোনা ঢালিয়া রাখিয়াছে।

দুই

সূর্য্য দিক্‌চক্র-রেখার দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে, তেজ তাহার একেবারেই স্তিমিত। বাতাস এতক্ষণ ঝির্‌ঝির্‌ করিয়া একটু বহিতেছিল, তাহাও প্রায় সহসা বন্ধ হইয়া গেল। ধানের নধর ডগাগুলি জলের উপরে কোন মতে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সেগুলি পর্য্যন্ত একটু নড়ে না। পূব আকাশের এক কোণে খানিকটা জায়গা একেবারে কালো হইয়া উঠিয়াছে। ধানক্ষেতের ভিতর দিয়া যখন বজরাটি চলিতেছিল, তখন কেমন একটা কর্কশ অস্বাভাবিক শোঁ শোঁ শব্দ হইতেছিল।

বিল পাড়ি দিয়া বজরা গ্রাম সীমার প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, এমনি সময়ে বজরার ভিতর হইতে দীর্ঘাকৃতি সুদর্শন এক যুবক বাহির হইয়া ছাদের উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। যুবকের বয়স অনুমান ত্রিশ, একহারা চেহারা; মাথার সিঁথি প্রায় নাকের সোজাসুজি মাঝখান দিয়া চেরা। চুলগুলি কুঞ্চিত—অঙ্গুলি সঞ্চালনে ঈষৎ এলোমেলো; দেখিলে মনে হয় বাতাস লাগিলে এখুনি উড়িবে। পায়ে একজোড়া দামী চটি, পরণে ঢিলা পায়জামা, গায়ে রেশমের ফতুয়া, বুকের বোতাম খোলা—ফাঁক দিয়া বক্ষঃস্থলের খানিকটা দেখা যাইতেছে। সর্ব্বাগ্রে নজরে পড়ে নাকটা—খড়্গের মত চাপা অধরোষ্ঠের উপর আসিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। চঞ্চল চোখ দুইটি আয়ত, রং ফর্সা—কিন্তু কেমন যেন ফ্যাকাশে ভাব। মুখখানি দেখিতে ভাল হইলেও

কেমন যেন লাবণ্যহীন! চোখের কোণে ইহারই মধ্যে কালি পড়িয়াছে।

ইনিই শ্রীনগরের বর্ত্তমান জমিদার শোভেন্দ্র নারায়ণ রায়। এই বড়দলের বিখ্যাত বিল এবং বিল সংলগ্ন গ্রাম কালীদহ ইহারই জমিদারীর এলাকাভুক্ত। দুই বৎসরের উপর হইল প্রতাপশালী জমিদার উপেন্দ্র-নারায়ণ দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র বংশধর শোভেন্দ্রের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে এই বিশাল জমিদারী আর একটি ভারী সিন্দুক।

উপেন্দ্র নারায়ণ জমিদার হিসাবে যে শুধু অত্যাচারী ছিলেন তা নয়—চরিত্রহীন হিসাবেও তাঁহার অখ্যাতি ছিল। শ্রীনগরের বিখ্যাত রথের মেলায় শেষটায় মেয়ে বউ লইয়া সন্ধ্যার পর আর কেউ থাকিতে বড় সাহসী হইত না। তাঁহার মৃত্যুতে প্রজারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল এবং মনে মনে আনন্দের হাসিই হাসিয়াছিল, কিন্তু তবুও সকলেই একবাক্যে আজও স্বীকার করে—জমিদার উপেন্দ্র নারায়ণের নামে সত্যই বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাইত।

শোভেন্দ্র এতদিন বেশীর ভাগ কলিকাতার বাটিতেই ছিল।...পিতার মৃত্যুর পর মধ্যে মধ্যে শ্রীনগরে আসিয়া জমিদারী দেখাশুনা করিয়া ফিরিতেছে। মহাল পরিদর্শনে এ অঞ্চলে পদার্পণ তাহার জীবনে এই প্রথম।

ভৃত্য নিঃশব্দপদক্ষেপে একখানি বেতের 'সোফা' আগাইয়া দিয়া পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং মনিবের হুকুমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ভৃত্যটির নাম মধু—একাধারে শোভেন্দ্রের খাসকামরার চাকর ও

পাচক। মনিবের সঙ্গে শুধু যে মধু একা আসিয়াছে তা নয়, পাইক বরকন্দাজ মিলিয়া আরও জন চার পাঁচ আছে, তাহা ভিন্ন মাঝিমাল্লাও চারজন। মনিবের সহিত মুখোমুখী কথাবার্তা বলা বড় কারুর ভাগ্যে জোটে না—মধুর মারফতেই বলিতে হয় এবং মনিবের তরফ হইতেও হুকুম মধুর মারফতেই প্রেরিত হয়।

শোভেন্দ্র বজরার ছাদের উপরে দাঁড়াইয়া চারিদিকে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল।··· বিলের পরিপূর্ণ রূপ—অপরাহ্ন বেলায় আকাশ হইতে কে যেন সমস্ত মাঠটার উপর আবীর ছিটাইয়া দিয়াছে; দৃশ্যটি বোধ হয় তাহার খুবই ভাল লাগিল।

বহুদিন সে কলিকাতায় কাটাইয়াছে। কলিকাতায় থাকিতে শ্রীনগরের প্রসঙ্গে প্রায়ই তাহার মনে এই কথাটাই উদয় হইত—উঃ পাড়াগাঁয়ে মানুষ কি ভাবে থাকে?····· আর আজ চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল—বাঃ চমৎকার!—তাহার মনে হইল, কলিকাতার ইট-কাঠ রাস্তাঘাট, গাড়ীঘোড়া সবই যেন ঝুটো—প্রাণহীন। প্রকৃতি যেন এখানেই আপন হাতে আঙ্গুর নিঙড়াইয়া সুধা তৈরী করিয়া রাখিয়াছেন।

শোভেন্দ্র দেখিতে লাগিল—বর্ষার কাঁচের মত তকতকে ঝকঝকে বিলের জলের সঙ্গে নদীর জল সবে আসিয়া মিশিয়াছে—তারই মধ্যে জায়গায় জায়গায় নালফুলগুলি যেন দাঁত বাহির করিয়া প্রাণখোলা হাসি হাসিতেছে। ওর কোনটা লাল—কোনটা নীল কোনটা বা সবুজ। কলমীর ঝোপ জায়গায় জায়গায় ভেলার মত ভাসিতেছে। স্থানে স্থানে পাট পচাইতে দেওয়া হইয়াছে; কেমন একটা সোঁদা গন্ধ।

শোভেন্দ্র সোফার উপরে গা এলাইয়া দিল এবং পূব আকাশের দিকে চাহিয়া মধুকে বলিল—মেঘ ক'রেছে রে মোধো, জল না হয়! তারপর, কি রকম দেখ্‌ছিস্?

ঘাড় নীচু করিয়া দন্তপঙ্‌ক্তি বিকশিত করিয়া মধু বলিল—ভাল। মধুর দিকে চাহিয়া শোভেন্দ্র বলিল—কি ব'ললি?

—এজ্ঞে···

মধুর মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। মনিবকে সে চেনে—মর্জ্জি বোঝা ভার, কিসে কি হইবে শেষটায়!······সে চুপ করিয়া রহিল।

শোভেন্দ্র সরল এবং সরস কণ্ঠে বলিল—দেখ্‌ মোধো, এ সব প্রাকৃতিক দৃশ্য একা একা খালি চোখে চেয়ে দেখতে ভাল লাগে না। এ সব উপভোগ ক'রতে হ'লে চাই······

কথা শেষ করিতে হইল না। ইঙ্গিতেই মধু বুঝিল এবং অধীর আগ্রহে দ্বিতীয় আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

শোভেন্দ্র হাসিল, বলিল—ইডিয়ট্‌, ওটা ত হাতের ভেতরেই আছে, ওর এখন দরকার নেই, কিন্তু বজরা ভিড়োবি কোথায়? একটু পরিষ্কার জায়গায় বাঁধতে বল্‌! এদিকে বজরা কোথায় নিচ্ছিস্?···

এদিক্‌কার সব কিছুই মধুর নখাগ্রে। সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া বলিল—কেন, ঐ দীঘির ঘাটে······

শোভেন্দ্র ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল—ওটা কি? দীঘি?···

মধু কহিল—ঐ ত হীরেদীঘি, কত বড় প্রকাণ্ড দীঘি দেখ্‌ছেন না হুজুর? বিলের জল বেড়ে একসঙ্গে মিশে গিয়েছে তাই এখন

বুঝবার উপায় নেই, কিন্তু মাঠের জল যখন শুকিয়ে যাবে, তখন ঐ দীঘিতে জল থৈ থৈ ক'রবে।

শোভেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া দেখিল, সত্যই তাই, দীঘিই বটে। দীঘির ঘাটে পাড়ার মেয়ে-বউরা বৈকালে গা ধুইতে ও জল লইতে আসিয়াছে। মনে মনে সে বলিল—হীরা-দীঘি, বাঃ! নামটি ত বেশ চমৎকার। নামটা রাখা সার্থক হ'য়েছে।

প্রকাণ্ড দীঘি। দীঘির জলে জায়গায় জায়গায় কলমী ও পানার বড় বড় ঝোপ ও জলীয় লতার জটলা স্থানে স্থানে সবুজ ক্ষেত্র তৈরী করিয়াছে। ওধারে পদ্মবনে অজস্র পদ্ম ফুল—সেদিকে তাকাইলে মনে হয় যেন জলের উপর চাঁদের হাট বসিয়াছে। জলের কিনারায় বড় বড় ঘাস ও কাশবন। তাহারই বাঁ দিকে খেজুর গাছের গুঁড়ি দিয়া বাঁধান পাশাপাশি দুইটি ঘাট। একটা মেয়েদের অপরটা পুরুষদের।

বজরা ঘাটের খানিকটা উত্তরে সরিয়া আসিয়া কূলে ভিড়িল। শোভেন্দ্র সোফা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মেয়েদের ঘাটের দিকে বক্রদৃষ্টি হানিয়া দেখিল, দুইটি বৌ ভরা কলসী কাঁখে ব্যস্তসমস্তে সম্ভবতঃ বজরা দেখিয়াই জল লইয়া চলিয়া যাইতেছে এবং একটি মেয়ে ব্যস্ততার সহিত জড়সড়ভাবে জল হইতে উঠিবার সময় জলে ঢেউ দিয়া তাড়াতাড়িতে কলসীটা ভরিতেছে। দেখিয়া শোভেন্দ্রের হাসি পাইল, কিন্তু মেয়েটির এমনই সুন্দর মুখশ্রী যে, সে আর চোখ ফিরাইতে পারিল না। লুব্ধ দৃষ্টিতে নির্লজ্জের মত সেদিকে তাকাইয়া রহিল।

—কুঁক্ কুঁক্……

শোভেন্দ্র যেন চমকিয়া উঠিল। বলিল—ও কি রে?……

মধু পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া ছিল—পদ্মবনের দিকে মনিবের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া বলিল—ঐ দেখুন!……

শোভেন্দ্র অবাক বিস্ময়ে দেখিল, প্রায় চার পাঁচটা বেলেহাঁস ও চকাচকী পদ্মবনে খেলা করিতেছে। মুহূর্তে সে সচকিত হইয়া উঠিল, বলিল—মধু, শীগ্‌গির আমার পাখীমারা বন্দুকটা নিয়ে আয়!…

এক মুহূর্তে বজরার কামরা হইতে মধু বন্দুকটা আনিয়া হাজির করিল। শোভেন্দ্র চট্‌পট্‌ গুলি পূরিয়া লইয়াই লক্ষ্য স্থির করিল এবং মুহূর্তে ট্রিগার টানিল, শব্দ হইল—"দুম্"……

বন্দুকের গুরুগম্ভীর আওয়াজে হীরাদীঘি যেন কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘাটের উপর কিসের একটা শব্দ হইল।

শোভেন্দ্র চকিতে চাহিয়া দেখিল, সেই মেয়েটিই উঠিবার সময় কলসী কাঁখে ঢালু ঘাটের উপর হঠাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার কাঁখ হইতে মাটির কলসীটা ছিটকাইয়া শত খণ্ড হইয়া গিয়াছে। শোভেন্দ্র ভাবিল, তাহার বন্দুকের গুলীর আচমকা আওয়াজই হয়ত এই অচিন্তনীয় নাটকীয় ব্যাপারটার সূচনা করিল।

ব্যাপারটা শোভেন্দ্রের কেমন যেন ভালই লাগিল। মুহূর্তমাত্র চিন্তা করিয়া সে কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল, বলিল—যা মোধো, তোরা বজরা নিয়ে শীগগির এগিয়ে পড়্, ঐ ছাখ্, দুটো চকা ছট্‌ফট্ ক'রছে। ব্যাটারা শয়তানের ধাড়ি—ডুব মারলে আর পাওয়া যাবে না কিন্তু… আমি ডাঙ্গায় নামছি, তোরা যা শীগ্‌গির…

বজরা হইতে শোভেন্দ্র ডাঙ্গায় ঘাসের উপর লাফাইয়া পড়িল এবং

ঘাটের দিকে দ্রুত পা ফেলিতে লাগিল। বজরাও লগির ঠ্যালায় তর্ তর্ করিয়া পদ্মবনের দিকে আগাইয়া চলিল।

একটা আহত চকা ছট্‌ফট্ করিতেছিল, আর একটা 'কঁক্ কঁক্' করিতে করিতে উড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। হাত দুই উঠিয়াই ঝুপ্ করিয়া আবার পদ্মবনের ভিতর পড়িয়া গেল। তাহার পাখা আট্‌কাইয়া গেল। সেটা মুখ উঁচু করিয়া নিতান্ত অসহায়ের মত ভাসিতে লাগিল।

মধু ও আর একজন বরকন্দাজ চট্ করিয়া পাখী দুইটা পাটাতনের উপর তুলিয়া ফেলিল। তখনও সে দু'টো মরেনি। ডাকিতে লাগিল—কঁক্ কঁক্! যেন কাঁদিতে লাগিল।

শোভেন্দ্র ডাঙ্গা হইতে হুকুম করিল—যা, বজরা ওদিকে নিয়ে গিয়ে ভেড়া, আমি আসছি।

সে তখন একেবারে মেয়েদের ঘাটের সোজাসুজি রাস্তার উপরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মেয়েটি উঠিয়া কলসীর ভাঙ্গা খণ্ডগুলি কুড়াইয়া ঘাটের পার্শ্বেই ফেলিয়া দিয়া মুখ কালি করিয়া উপরে উঠিতেছে।

মেয়েটির পরণে একখানি লাল পাড় সাড়ী—আটসাট করিয়া পরা। সর্ব্বাঙ্গে আভরণের ভিতর মাত্র চারগাছি কাঁচের রঙ্গীন চুড়ি। সিঁথিতে সিন্দুরের স্পর্শ নাই। শোভেন্দ্র বুঝিল, এখনও বিবাহ হয় নাই। সারা দেহে অপরূপ লাবণ্য; শোভেন্দ্র শুধু অবাক নয়, তন্ময় হইয়া গেল। অস্ফুটে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল···কি নিখুঁত গড়ন!···লোকে বলে গোবরে পদ্ম ফুটেছে, তা এই-ই। শোভেন্দ্রের শিরায় শিরায় যেন বিদ্যুৎ-

প্রবাহ খেলিয়া গেল। তাহার মনে হইল, এই মুখখানিই সে আজীবন ধ্যান করিতেছিল।

শিরায় শিরায় পিতৃপুরুষদের যে রক্ত প্রবহমান—মানুষের পক্ষে সে রক্তের ডাক এড়ান অত্যন্ত কষ্টকর। সাধারণের পক্ষে অস্বাভাবিক হইলেও ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত শোভেন্দ্র এক্ষেত্রে যেন হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল। মুহূর্ত্তে তাহার মনে ইন্দ্রধনুর রঙের মায়া জাগিয়া উঠিল।

উঠিবার সময় শোভেন্দ্রের দিকে মুখ উঁচু করিয়া মেয়েটি একবার তাকাইল, তারপরই ঘাড় নীচু করিয়া ঘাটের একপাশ [illegible] সলজ্জ-সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া উঠিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিল।

সম্মুখেই শোভেন্দ্র বন্দুক হাতে রাস্তা আগলাইয়া দাঁড়া[illegible] লালসা-মাখান অপলক চোখ দুটি দিয়া যেন গিলিতেছে! তা[illegible] দিয়া মেয়েটি যখন যায়, সে আর কথা বলিবার লোভ সম্বরণ [illegible] পারিল না।

কণ্ঠে যথাসম্ভব মধু ঢালিয়া শোভেন্দ্র মুখখানা আ[illegible]লিল—প'ড়ে গিয়ে আপনার বোধ হয় খুব লেগেছে?…কত ক[illegible]ভিতর তাহার ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মেয়েটি থামিল না, কথা বলিল না, শুধু শোভেন্দ্রে[illegible]কবার তাকাইল এবং সেই এক চাউনীতেই শোভেন্দ্র তাহ[illegible] প্রশ্নের উত্তর পাইল।

বাপ্!…সে ত তাকান নয়—শোভেন্দ্রের মনে হ[illegible] চোখ দুইটা হইতে যেন টকটকে আগুন ছিট্কাইয়া তাহ[illegible]সিয়া পড়িল। চাউনী ত নয়—যেন সুতীক্ষ্ণ ছুরির ফলা…

মেয়েটি চলিয়া গেল···শোভেন্দ্র হতাশার নিশ্বাস ফেলিয়া সেদিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। ফুলের কুঁড়ির সদ্য ঘুম ভাঙ্গার মতই সামান্য একটি মুহূর্তের দেখা, তাহা হউক, শোভেন্দ্রের নিকট এই মুহূর্তটিই অমূল্য বলিয়া মনে হইল।

এই সময়ে একজন প্রৌঢ় বাঁ দিকের মেঠো রাস্তা বাহিয়া আসিয়া দাঁড়াইল এবং শোভেন্দ্রের দৃষ্টি তাহার উপরে পড়িতেই ঐ দশ হাত দূরে দাঁড়াইয়াই লোকটি ঝাঁকিয়া বারংবার শোভেন্দ্রকে করজোড়ে নমস্কার করিতে লাগিল।

লোকটির পরণে সাদা থান, গায়ে ফতুয়া, কাঁধে একখানা সাদা চাদর বগলে একটি ছাতা—পায়ে এক হাঁটু কাদ তাহার চোখ মুখ ও সর্ব্বাঙ্গের দিকে তাকাইলে মনে হয়, এখুনি যেন কোথা হইতে জলকাদা ভাঙ্গিয়া হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে।

শোভেন্দ্র একটু বিরক্ত হইয়াই রুক্ষস্বরে বলিল,—কে?

মুখখানি অসম্ভব রকম কাচুমাচু করিয়া গরুড়পক্ষীর মত দাঁড়াইয়া আগন্তুক কহিল—এজ্ঞে···আমি হুজুরের···

কথা শেষ করিতে দিবার সময় নাই। অধীরভাবে শোভেন্দ্র বলিল—কি চাই?···দৃষ্টি ফিরাইবার অবসর নাই, মেয়েটা বাঁ দিকের গেঁয়ো সড়ক ধরিয়াছে, এখুনি ঐ বাঁশঝোপের আড়ালে পড়িবে।

আগন্তুক বলিল—এজ্ঞে···আমি হুজুরের দাসানুদাস—এই কালীদহের কাছারীর নায়েব—শ্রী···

মেয়েটি আড়ালে পড়িয়াছে, তাহাকে আর দেখা যাইতেছে না··· আর হয়ত···

শোভেন্দ্রের মনে হইল, দুনিয়ার সমস্ত আলো তাহার চোখের সম্মুখে নিবিয়া গেল।...পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্যই যেন হঠাৎ কৃষ্ণবর্ণ যবনিকার অন্তরালে পড়িয়া গেল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চোখ ফিরাইয়া সে বিরক্তমুখে বলিল—হ্যাঁ, তোমার কি চাই ব'ললে ?

—এজ্ঞে...আমি হুজুরের...

স্বপ্নোত্থিতের মত শোভেন্দ্র গম্ভীরস্বরে বলিল—ও, তুমিই এখানকার নায়েব রসিক গড়গড়ি ?...তা—এখানে 'হাঁ' করে দাঁড়িয়ে কেন ? বজরার কাছে যেতে পারছ না ?...

গড়গড়ি আকাশ হইতে পড়িল। বলে কি ? এ যে বাপের উপর দিয়া যায় !...মহালে এই প্রথম আসিয়াই বেশ নমুনা দেখাইল ত !

কিন্তু নিরুপায় ! প্রভুর সহিত ভৃত্যের যাহা সম্বন্ধ—ভৃত্যের তাহা ভুলিলে চলিবে কেন ?...

দুই পা পিছাইয়া দাঁড়াইয়া গড়গড়ি সবিনয়ে বলিল—এজ্ঞে হুজুর—শুনলাম আপনি এসেছেন ; আগে ত খবর পাইনি। কাগপক্ষীর মুখে শুনেই অমনি দৌড়েছি।

শোভেন্দ্র দ্বিরুক্তি করিল না। উদ্ভ্রান্তের মত পা ফেলিয়া বজরার ছাদের উপরে উঠিয়া পায়চারী করিতে লাগিল। নায়েব গড়গড়ি মশাই পিছনে পিছনে আসিয়া বজরার সিঁড়ির ধারে দীঘির কিনারায় এক প্রকার জোড় হস্তেই হুকুমের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। তরুণ মনিবের মেজাজ কেন যে বিগড়াইয়াছে তাহা বুঝিতে অবশ্য চতুর নায়েব মহাশয়ের বাকী রহিল না ; কারণ এ বংশের ইতিহাস খুব ভাল করিয়াই তাহার জানা আছে।

অদৃষ্টের পাঁচালী

মধু বজরার ছাদে এক কোণে বসিয়া আহত চকা দুইটার ডানায় দড়ি বাঁধিতেছিল। সে দু'টো তখনো মরে নাই, ডাকিতেছিল—।

পায়চারী করিতে করিতে কি ভাবিয়া শোভেন্দ্র লাথি মারিয়া মধুর হাত হইতে পাখী দুইটাকে জলের ভিতর ফেলিয়া দিল এবং কোনদিকে না তাকাইয়াই নামিয়া আসিয়া সোজা কামরার মধ্যে গিয়া ঢুকিল।

অপরাহ্নের শেষ রক্তছটা তখন প্রায় মুছিয়া গিয়াছে। বিলের ভিতর ধানের ডগায় ডগায় তখনও ম্লান এক ফালি আলো ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। নিবাত নিস্তরঙ্গ বিলে মাছ ধরিবার জন্য পল্লী-চাষীরা 'কোঁচ' হাতে ধানক্ষেতের ভিতর স্থিরনেত্রে শ্যেন দৃষ্টি মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে—কখন মাছের দেহ আন্দোলনে কোন্ ধানের ডগাটি নড়িবে……

তিন

বজরার কামরার ভিতরে একখানি আরাম কেদারায় শোভেন্দ্র নারায়ণ অর্দ্ধশায়িত। ভৃত্য মধু কর্ক্ খুলিয়া বোতল হইতে তরল দ্রব্য কাচের গ্লাসে ঢালিতেছে। কামরার দ্বারে গরুড় পক্ষীর মতই দণ্ডায়মান নায়েব রসিক গড়গড়ি। বজরার পিছনের কামরায় বরকন্দাজ ও মাল্লারা চুপি চুপি কথাবার্ত্তা বলিতেছে। দীঘির জলে মাঝে মাঝে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হইতেছে, বোধ হয় মাছ লাফাইতেছে। দীঘির কূল হইতে ব্যাঙের ডাক ও কূল-ঘেঁসা বন হইতে 'ঝিঁ ঝিঁ'র একটানা শব্দ মৌনসন্ধ্যার সমস্ত আবহাওয়াকে মুখর করিয়া তুলিয়াছে।

এক চুমুকে খানিকটা মদ গলাধঃকরণ করিয়া গ্লাস্‌টা সরাইয়া রাখিয়া শোভেন্দ্র বলিল—তারপর গড়গড়ি, কাছারীর খবর কি ?…

সবিনয়ে গড়গড়ি বলিল—এজ্ঞে…আপনার কৃপায় কাছারীর খবর ত ভালই…তবে…

—তবে ?…

—এজ্ঞে না—কিছুই না। আদায়-পত্র আমার কাছারীতে বরাবরই ভাল, দয়া ক'রে রেকর্ড দেখবেন হুজুর।—তবে আর বছর জল না হওয়ায় আজন্মা হ'ল—ফসল কিছুই হ'ল না, তবুও আপনি ত জানেন হুজুর—খাজনা ত দূরের কথা, একটি পয়সা সুদও কেউ আমার কাছ থেকে মাপ পায়নি।

শোভেন্দ্র সিগারেট ধরাইয়া এক গাল ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল—ভাল।

সাহস পাইয়া গড়গড়ি বলিল—খাজনা সময়মত [illegible] না দিলেই পাইক দিয়ে বাড়ীর ওপর থেকে টেনে এনে কাছারীর [illegible]ই জুতো মেরে পিঠ-মোড়া দিয়ে ফেলে রেখেছি, লাঙল গরু ঘটি[illegible] বেচে খাজনা মেটাতে দিশে পায়নি।

কথাগুলির মধ্যে একটু অতিরঞ্জন রহিয়াছে, গড়গড়ি তাহা বুঝিল, কিন্তু বলা বাহুল্য, সে কেবল মনিবের মনস্তুষ্টির [illegible]ই।

শোভেন্দ্র বলিল—বটে ?...

—এজ্ঞে···হ্যাঁ হুজুর।

শোভেন্দ্র হঠাৎ ফিরিয়া বসিল, বলিল—আচ্ছা গ[illegible]ড়, আমার সম্বন্ধে এখানকার লোকের কিরকম ধারণা বল ত ? ..

এতক্ষণে গড়গড়ির সমস্ত সঙ্কোচ দূর হইল। শো[illegible]দ্রের কথায় সে একেবারে গলিয়া গেল। বলিল—আপনাদের জমিদ[illegible]তে বাস ক'রে তারা মহাসুখে আছে, ব'লতে গেলে একরকম—[illegible]রাজত্বে বাস ক'রছে।

শোভেন্দ্র হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসির বেগ সামলাইয়া বলিল—গড়গড়ি, এতক্ষণে চিনলাম তোমায়। তুমি দেখ্‌ছি শুধু রসিক নও, একেবারে সুরসিক। এইমাত্র না তুমি ব'ললে যে, প্রজাদের জুতো মেরে ঘর দোর নিলেমে তুলে খাজনা আদায় কর ? তবুও কি তারা বলে যে, রামরাজত্বে বাস ক'রছে ? তা হ'লে তোমার এই মহালের লোকেরা অতিমানব নিশ্চয়ই, কি বল ?···না অপমানব ?

গড়গড়ি হঠাৎ যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, বলিল—তা হুজুর···

«সে যা আপনি ব'লেছেন···ঠিক কথাই···তবে কিনা···এ বছরটা যা আশা ক'রেছিলাম হুজুর···তার কিছুই হবে না দেখছি।

শোভেন্দ্র হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল—কেন ?···

—এজ্ঞে হুজুর, মাঠে যখন প্রথম জল পড়ল, মানুষের আনন্দ আর ধরে না। তারপর ধান আর পাটগাছগুলো সত্যি ঘোড়ার মত উঁচু হ'য়ে উঠলো। সবাই ভাবলো, মা বসুন্ধরা বুঝি ওবছরের ফসল এবছরে পুষিয়ে দেবেন!···হা অদৃষ্ট,···বর্ষাও এবার হ'ল খুব বেশী—তার ওপর পাগ্‌লা খালের বাঁধ ভেঙে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা হ'য়েছে, সে ত আপনি নিজে চোখেই দেখে এলেন! মাঠ সাদা হ'তে ত আর দু'চারদিন।

শোভেন্দ্র শুধু বলিল—হুঁ—

গড়গড়ি বলিল—আর বছর জল হ'ল না আর এ বছর জলেই বোধ হয় ফসল ডুবিয়ে দেবে। বড়চর আর হাত খানেক জল উঠলেই একেবারে সাদা হ'য়ে যাবে।···জমিগুলো একটু নাবাল হ'লেও বড়চরেই বিলের সবচেয়ে ভাল ধান হয়।···লোকে ত এরই মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে ব'সেছে।

শোভেন্দ্রের কণ্ঠে ঈষৎ জড়তা আসিয়াছে। সিগারকেশ্‌ হইতে আর একটা সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইয়া বলিল—ডোবে ডুবুক্, তাতে তোমার কি ?···তোমার কোন হাত আছে ব'লতে চাও ? ফসল হ'ক চাই না হোক্, তোমার তা দেখবার কোনই দরকার নেই।

হাত কচ্‌লাইয়া বেকুবের মত গড়গড়ি বলিল—এজ্ঞে হুজুর।

শোভেন্দ্র বলিল—ক'টাকা মাইনে পাও ?···

মুখ কাঁচুমাচু করিয়া গড়গড়ি নিম্নস্বরে বলিল—মাত্র দশ টাকা হুজুর··· এক গাদা পুষ্যি আমার···

—বটে— বলিয়া এক গাল ধোঁয়া ছাড়িয়া শোভেন্দ্র বলিল—কি ক'রে চলে এই দশটাকায় ? চুরি-চামারি কর না নিশ্চয়ই ?···

জিভ্ কাটিয়া গম্ভীর হইয়া গড়গড়ি বলিল—এই আপনাদের দয়ায়—ভগবানের ইচ্ছায় কোনমতে কায়ক্লেশে চালাচ্ছি হুজুর—যাকে বলে দায়ে ঠেকে চালান হুজুর···নইলে বোঝেন ত সবই।—তা হুজুর দয়া ক'রে যখন প্রথম এই মহালে এলেন, তা হাজার খানেক টাকা দুই একদিনের মধ্যেই আপনার নজর আমি আদায় ক'রবই।···আর বিশেষ ক'রে···মানে··· প্রজারাও আপনাকে দেখেনি কোনদিন—তারাও আপনাকে দেখে খুবই আনন্দ পাবে। সবাই আপনাকে দেখবার জন্যেও খুবই উদ্গ্রীব।

হাসিতে হাসিতে বজরার ছোট্ট জানালার ভিতর দিয়া সিগারেটটা ফেলিয়া দিয়া শোভেন্দ্র হঠাৎ সোজা হইয়া বসিল, বলিল—কি রকম ? আমি কি সং না অন্য কিছু ?···তারপরই চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া রসিক গড়গড়ির আপাদ মস্তক বেশ করিয়া একবার দেখিয়া লইল।

সে দৃষ্টির সম্মুখে রসিকের অন্তরাত্মা যেন কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, শোভেন্দ্র যেন তাহার অন্তরটি বেশ করিয়া একবার দেখিয়া লইল।

গড়গড়ি মাথা নীচু করিল। তাহার ভয় হইল, কি কথা বলিতে হয়ত কি বলিয়া ফেলিয়াছে, হয়ত কিসে কোন্ দোষ দাঁড়াইয়াছে!

কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করিয়া শোভেন্দ্র বলিল—দেখ গড়গড়ি, জান আমি কে ?

গলার স্বর শুনিয়াই গড়গড়ি একটু ভড়কাইয়া গেল। তাহার মনে হইল, শোভেন্দ্র যেন তাহাকে লইয়া এতক্ষণ শুধু খেলিতেছিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—কেন জানব না হুজুর? দু'দশ জিলার কে আপনাকে না জানে?...আপনার নামে যে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে—

উত্তেজিত হইয়া বাধা দিয়া শোভেন্দ্র বলিল—ওসব বাজে কথা রাখো গড়গড়ি। তোমার মত নায়েবদের মুখে দু'চারটে মিষ্টি ধামাধরা কথা আর চাটুবচন—এ সব শুনতে আমার এতটুকুও ইচ্ছে নেই, বরং শুনলেই আমার গা জ্বালা ক'রে ওঠে। ও সব আমার কাছে চ'লবে না।

অপরাধীর মত গলার স্বরে গড়গড়ি বলিল—এজ্ঞে—

শোভেন্দ্র অস্থিরভাবে বলিয়া উঠিল—কোন রকম বাজে কথা আমার কাছে নয়, বুঝতে পেরেছ?

ঘাড় নীচু করিয়াই গড়গড়ি জানাইল—হ্যাঁ।

কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক অবস্থায় আনিয়া শোভেন্দ্র বলিল—বহুদিন আমাদের কাছে র'য়েছ, অবিচার অন্ততঃ আমার কাছে হবে না। এ মাস থেকে তোমার মাইনে হ'ল ত্রিশ টাকা।

বিনয়ে কৃতজ্ঞতায় গড়গড়ি একেবারে গলিয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না।

শোভেন্দ্র বলিল—কি—সন্তুষ্ট ত?......হ্যাঁ, শোনো এক কথা, এগিয়ে এসো!

মনিব সন্তুষ্ট হইয়া একেবারে এক সঙ্গে কুড়ি টাকা মাহিয়ানা বাড়াইয়া দিলেন, গড়গড়ির বুকের ছাতি আনন্দে দশহাত ফুলিয়া উঠিল। আজ প্রভাতে সে কাহার মুখ দেখিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়াছিল?...

গড়গড়ি দুই পা আগাইয়া ধনুকের মত সম্মুখের দিকে বাঁকিয়া দাঁড়াইল। শোভেন্দ্র অন্যদিকে তাকাইয়া অন্যমনস্কের মতই বলিল—একটা কাজ তোমায় ক'রতে হবে গড়গড়ি।

মুখের কথা না ফুরাইতেই গড়গড়ি ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল—কাজ? আপনার কাজ? আপনি শুধু হুকুম করুন, কি ক'রতে হ'বে?…আপনার হুকুমে রসিক গড়গড়ি দিনকে রাত ক'রতে পারে হুজুর।

—বেশ, ভাল কথা—শুনে সুখী হ'লাম; আচ্ছা গড়গড়ি, ঐ মেয়েটাকে তুমি চেন?

—কোন্ মেয়েটি হুজুর?—অস্ফুটে গড়গড়ির মুখ দিয়া বাহির হইল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গড়গড়ির চোখের উপর নিবদ্ধ রাখিয়াই শোভেন্দ্র বলিল—ন্যাকা সেজো না।—ন্যাকামি আমার দু'চোখের বিষ। সেই যে মেয়েটি—ঐ ঘাট থেকে উঠে আমার সাম্‌নে দিয়ে চ'লে গেল—তুমি তখন দাঁড়িয়ে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ চিনেছি—কেন চিন্‌বো না হুজুর—ও ত চন্দ্রশেখর মুকুজ্যের মেয়ে…বড় গরীব ওরা…সংসারে এক বিধবা মা ছাড়া কেউ নেই।

শোভেন্দ্র ঘুরিয়া বসিল এবং একটু ইতস্ততঃ করিয়া চুপি চুপি রসিককে যাহা বলিল তাহা শুনিয়া আকাশ হইতে না পড়িলেও সে রীতিমত ভড়কাইয়া গেল।

সর্ব্বনাশ! বলে কি?…হতবাক গড়গড়ি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল।

তাহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া শোভেন্দ্র উত্তেজিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, আরক্তিম চোখে গড়গড়ির দিকে তাকাইয়া বলিল—কি, তুমি পারবেনা?…

শোভেন্দ্রের মস্তিষ্ক উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। চুলের মধ্যে ঘন ঘন অঙ্গুলি সঞ্চালনা করিতে করিতে সে একেবারে গড়গড়ির এক হাত ব্যবধানে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল স্থিরনেত্রে তাকাইয়া থাকিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল—দেখ গড়গড়ি, মদ খেলেও আমি মাতাল হইনি—আমার যে কথা সেই কাজ। জমিদার শোভেন্দ্র নারায়ণ রায়ের ইচ্ছা বা হুকুম মাতালের প্রলাপ নয় কিন্তু।

গড়গড়ি কাঠের পুতুলের মতই দাঁড়াইয়া রহিল।

শোভেন্দ্র দৃঢ় অথচ সংযত কণ্ঠে বলিল—দু'শ, পাঁচশ'—দু'হাজার পাঁচ হাজার যা টাকা লাগে নাও। বন্দুক নাও—রিভলভার নাও, পাইক বরকন্দাজ, লেঠেল—যা লাগে নাও—আজ রাত্রে তাকে আমার কাছে এনে হাজির করা চাই-ই।···তোমার কোন ভয় নেই, সব দায়িত্ব আমার। —কিন্তু খুব হুঁসিয়ার, চুপি চুপি কাজ হাসিল ক'রবে।···বিপদ দেখলেই লাঠি চালাবে—দরকার হ'লে গুলিও চালাবে······এ অজ পাড়াগাঁয়ে আমার কাছে এ অতি তুচ্ছ কাজ জেনো গড়গড়ি।······এর ভেতর আর চিন্তা ভাবনার কিছু নেই।

উত্তেজনায় আবেগে নেশার সমস্ত জড়তা এড়াইয়া শোভেন্দ্র যেন গড়গড়ির কঠিন পরীক্ষা লইতেছিল। গড়গড়ি অন্তরের মধ্যে একবার ঈশ্বরকে স্মরণ করিল, মনে মনে বলিল—ভগবান্, এ কি তোমার কঠিন বিচার?······আশার আলো দেখিয়ে এ কি ভীষণ পরীক্ষায় আমায় ফেল্লে?

শোভেন্দ্রের পিছনে দাঁড়াইয়া মধু একখানা প্রকাণ্ড তালপাতার পাখায় তাহাকে বাতাস করিতেছিল। মনিবকে সে বিশেষভাবেই চেনে। পিছন

হইতেই গড়গড়িকে সে চোখের ইশারায় কার্য্যভার গ্রহণ করিতে বলিল এবং ইহাতে যে একটা মোটামুটি পাওনার ব্যবস্থা থাকিবে, তাহাও হাতের ইঙ্গিতে সে জানাইতে কসুর করিল না।

শ্রীনগরের জমিদার এই রায়বংশের কালীদহের কাছারীর নায়েবী করিয়া গড়গড়ি মাথার চুল প্রায় পাকাইয়া আনিয়াছে। অনেকবার ইহাদের অনেক রকম অসঙ্গত আব্দার ও কঠোর হুকুমও তাহাকে তামিল করিতে হইয়াছে। জমিদার উপেন্দ্র নারায়ণের নির্দ্দেশে তাহারই হুকুমে কত বিদ্রোহী প্রজার উন্নতশির—কত শত্রু এই বড়দলের বিলেই কলমী কচুরির দাম ও পাঁকের ভিতর চির-আশ্রয় লইয়াছে, কিন্তু আজ সেই বংশেরই তরুণ জমিদারের এই খেয়ালের হুকুম গড়গড়িকে বড়ই বিচলিত করিয়া তুলিল। শোভেন্দ্রের কথাগুলিতে তাহার বুকের ভিতর হাতুড়ির ঘা পড়িতে লাগিল এবং চোখের সম্মুখে দুনিয়ার আলো বাতাস যেন সরিয়া যাইতে লাগিল।

বজরার দেয়ালে একটা মাঝারি আকারের দেয়াল ঘড়ি। ঘড়িটা একই তালে অবিশ্রাম শব্দ করিয়া চলিয়াছে। শব্দটা যেন ভ্রূকুটি করিয়া ব্যঙ্গ করিতেছে। গড়গড়ির সমস্ত অন্তর ছাপাইয়া ঐ একটা কথাই শুধু জাগিয়া উঠিল—ভৃত্যকে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ ভুলিলে চলিবে কেন ?······ ভৃত্যের জন্মই ত প্রভুর আদেশ পালনের জন্য। মনিবের কাছে ভৃত্য যে বিক্রীত।···ঘরে তিনটি অনূঢ়া কন্যা—দুইটি নাবালক পুত্র, স্ত্রী — ইহাদের গ্রাসাচ্ছাদন, ভরণপোষণ······সামান্য মাহিয়ানার চাকুরী···সামান্য কিছু উপরি···কপর্দ্দকহীন···সে যে কতখানি নিরুপায় একমাত্র জগদীশ্বর ভিন্ন কে বুঝিবেন ?···গড়গড়ি মাথা নত করিয়া নীরব ছিল, একটা গভীর

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যথিত অন্তরে শোভেন্দ্রের দিকে মুখ উঁচু করিয়া তাকাইল। কোন কথা বলিবার শক্তিটুকুও যেন তাহার রহিল না।

শোভেন্দ্রের মুখ গম্ভীর, চোখের দৃষ্টি আরও গম্ভীর ও অস্বাভাবিক। গড়গড়ির মুখে সেই তীক্ষ্ণ গম্ভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল—আমার যা ব'লবার তা ত আমি ব'লেছি গড়গড়ি। অন্যায় বল, পাপ বল—সবই আমার—বরং তোমার কিছু বলবার থাকলে ব'লতে পার।

গড়গড়ির বুক ফাটিয়া যেন কান্নার জোয়ার বহিয়া গেল!······তাহার বলিবার কিছুই নাই—এই কথাটাই সে কোনমতেই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না।

চার

পূব আকাশ জুড়িয়া মেঘ করিয়াছিল—হাওয়ার মুখে মেঘ আস্তে আস্তে সরিয়া গিয়া আকাশ কতকটা পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার পরই গুমোট ভাব চলিয়া গিয়া আব্‌হাওয়া বেশ স্বাভাবিক ও স্বচ্ছ হইয়াছে। শূকরদন্তের মত একফালি চাঁদ আকাশের কোণে বসিয়া পৃথিবীর দিকে ঘোলাটে চোখ মেলিয়া যেন মিটির মিটির করিয়া চাহিতেছে আর দুষ্টামীর হাসি হাসিতেছে।

জ্যোৎস্নার ময়লা আলোয় কানায় কানায় ভরা বিলটির দিকে তাকাইলে সত্যই গা ছম্‌ ছম্‌ করিয়া উঠে। ধানের উপর দিয়া ভাসিয়া-আসা ঢেউ-খেলান বাতাসের বেসুরো গান মনটাকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করিয়া তোলে ; গভীর রাত্রে কেমন যেন একটা ভয়ার্ত্ত সুরের রেশ ওতে জড়ান থাকে !

শোভেন্দ্র বজরার ছাদে অধীরভাবে পায়চারী করিতে করিতে সোফায় গা এলাইয়া দিল। অন্যমনস্কভাবে ময়লা জ্যোৎস্নার আলোয় জলের দিকে চাহিয়া দেখিল, একটা ফুটন্ত নালফুল বাতাসের ভরে দোল খাইতেছে আর তারই গা ঘেঁসিয়া অবিকল গোখ্‌রা সাপের মত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ফণা দোলাইতেছে কচুরিপাণার ডগার মাথায় একটি পাতা ; মনে হয় এখুনি ছোবল মারিয়া চিরদিনের মত ঘুচাইয়া দিবে ওর মুখের হাসি—ওর আনন্দের দোলা……

শোভেন্দ্র আবার উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অধীরভাবে পায়চারী করিতে লাগিল…। রাত এত হইয়াছে……এখনও উহারা আসে না কেন?… কোন বিপদ আপদ কিছু…

বজরার দেয়াল-ঘড়িটা নীচের কামরার মধ্যে মহাকালের সঙ্কেতধ্বনির মতই ক্রমাগত 'ঠিক্' 'ঠিক্' করিতে করিতে হঠাৎ 'ঠং ঠং' করিয়া বারোবার বাজিল; আবার পূর্ব্ববৎ 'ঠিক ঠিক্' করিয়া চলিতে লাগিল।

রাত বারোটা। তাই ত……এখনও……

দূরে কেমন একটা অস্ফুটধ্বনি শুনিয়া শোভেন্দ্র সচকিত হইয়া উঠিল এবং তাকাইয়া দেখিল, কি একটা কাঁধে লইয়া কাহারা যেন দ্রুতপদক্ষেপে এদিকেই আসিতেছে। বুঝিতে মুহূর্ত্তমাত্র তাহার বিলম্ব হইল না যে, কার্য্য-সিদ্ধি হইয়াছে এবং অভিযান সফল।

শোভেন্দ্রের বুকের রক্ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। উল্লাশে শীষ্‌ দিতে দিতে সে ছাদ হইতে নামিয়া সিঁড়ির ধারে গিয়া উদগ্রীব নেত্রে দাঁড়াইল। মুহূর্ত্ত পরেই চারজন বরকন্দাজ দ্রুতপায়ে একটি মেয়েকে কাঁধে করিয়া আনিল এবং সিঁড়ির ধারে দাঁড়াইয়া মনিবের মুখের দিকে হুকুমের প্রতীক্ষায় তাকাইল।—মুখে তাহাদের বিজয়-উল্লাশের চিহ্ন।

পিছনে আর একটি লোক—তাহার মাথায় পাগড়ি ও মুখের উপর চাদর জড়ান—চিনিবার উপায় নাই। শোভেন্দ্র একটু লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিল—গড়গড়ি। গড়গড়ির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এক অসুর আকৃতি পুরুষ, হাতে লাঠি। শোভেন্দ্র তাহাকেও চিনিল। সন্ধ্যার পর মনিবকে সেলাম বাজাইতে আসিয়াছিল—কাছারীর লেঠেল-সর্দ্দার এ সেই মহাদেব ঢালি।

মেয়েটির হাত ও মুখ বাঁধা, মাথার একরাশ চুল এলোমেলোভাবে ছড়ান—বাতাসে উড়িতেছে। পরণের কাপড়খানি পর্য্যন্ত দুই এক জায়গায় ছিঁড়িয়াছে।

শোভেন্দ্র হুকুম দিল—আমার কামরায় নিয়ে আয়, আর গড়গড়ি!···

গড়গড়ি ব্যস্তসমস্তে শোভেন্দ্রের কাছে ছুটিয়া আসিয়াই চুপি চুপি বলিল—দোহাই হুজুর, আমার নাম ধরে ডাকবেন না, আমায় চেনে··· বলিয়াই সে মেয়েটিকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিল।

বরকন্দাজরা মেয়েটিকে বজরায় তুলিল এবং কামরার মধ্যে লইয়া গেল। সেদিকে একবার তাকাইয়াই শোভেন্দ্র বলিল—মধু, কড়া পাহারা লাগাতে বল্, রাইফল্ নিয়ে যেন 'রেডী' থাকে, আর গড়গড়ি!···

—দোহাই হুজুর—

—আরে রাখো তোমার ভণ্ডামি নন্সেন্স—হ্যাঁ কি ভাবে এনেছ, বল শীগ্গির?······

গড়গড়ি চুপি চুপি বলিল—সে হুজুর—আপনার কৃপায়···

—ইডিয়ট্···আমার দাঁড়াবার সময় নেই—কেউ জেনেছে?···

—এজ্ঞে না হুজুর—একেবারে বেমালুম······ঘরে প্রকাণ্ড এক সিঁধ কেটে একেবারে বেমালুম চুরি ক'রেই এনেছি। একেবারে চিৎকারটি পর্য্যন্ত ক'রতে পারেনি।

শোভেন্দ্র আশ্বস্ত হইল, মৃদুহাস্যে বলিল—বটে।···

—হ্যাঁ হুজুর, মা ছিল পাশে শুয়ে, তাকেও একরকম জান্তে দিইনি।

শোভেন্দ্র ব্যস্তভাবে বলিল—বেশ বেশ—তোমায় পুরস্কার হবে'খন।··· তোমার ত মাথা আছে দেখছি হে।···

গড়গড়ি সুযোগ বুঝিয়া বলিল—আপনাদেরই অন্নে এ মাথা ত পরিপক্ক হুজুর···ঘরে ওর এক বিধবা মা ছাড়া ত আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই হুজুর··· টের পেয়েই বা কি ক'রত?······বাঘ সাথে ছিল যে—বলিয়াই পাইক মহাদেব ঢালিকে দেখাইয়া দিল।···কিন্তু সেই সঙ্গে নিজে কত বড় যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া ফেলিল, তাহা বোধহয় একমাত্র অন্তর্য্যামীই লক্ষ্য করিলেন।

—অল্ রাইট্, কড়া পাহারা লাগাও···বন্দুক রেডী থাকে যেন··· দরকার হ'লে বজরা ভাসিয়ে বিলের ভেতর নিও, তুমি যেওনা এখন!···

বরকন্দাজরা বাহিরে আসিয়া হুকুমের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের ছাদের উপর যাইতে হুকুম দিয়া শোভেন্দ্র ঝড়ের মত কামরায় গিয়া ঢুকিল এবং কামরার ছোট দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর দু'পাশের ছোট জানালা দুইটি বন্ধ করিয়া দিয়া আলোটা একটু বাড়াইয়া দিল। অতঃপর ড্রয়ারের ভিতর হইতে রিভলভারটি টানিয়া বাহির করিয়া 'টিপয়'এর উপরে রাখিল।

এইবার শোভেন্দ্র মুগ্ধদৃষ্টিতে ভাল করিয়া মেয়েটির দিকে একবার তাকাইল।···হ্যাঁ রূপ···রূপ লইয়া গর্ব্ব করিবার মতই রূপসী বটে। যৌবন এখনও সারা দেহে পূর্ণমাত্রায় আত্ম-প্রকাশ করে নাই···কিন্তু সারাদেহে একরাশ লাবণ্য।···গেঁয়ো ফুলই বটে!

শোভেন্দ্র দেখিল, মেয়েটির চোখে জল—আলো পড়িয়া চোখের কোণ চক্ চক্ করিতেছে, কিন্তু চোখ দুইটিতে যেন আগুনের শিখা।···শ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছে···চোখের দৃষ্টি ভয়ার্ত্ত—কিন্তু

অশ্রুভরা...তাহার মধ্যেও কেমন একটা শ্রী...সুমধুর, যেন মৃগ-নয়না...এই চোখ দুইটির সহিত বৈকালে তাহার একদফা পরিচয় হইয়া গিয়াছে।

শোভেন্দ্র মনে মনে বলিল—খাস্ পাড়াগেঁয়ে...desparate......বশ করতে একটু অসুবিধা হবে......

তারপর চক্ষু গরম করিয়া বলিল—খবরদার ব'লছি চেঁচিও না...আমার হাত থেকে কেউই তোমায় এখন বাঁচাতে পারবে না...চিৎকার ক'রলে কিচ্ছু ফল হবে না—আমার মাথায় এখন খুন চেপেছে—দরকার হ'লে গুলি করতেও কিন্তু দ্বিধাবোধ ক'রব না।...বলিয়াই সে ইঙ্গিতে রিভলভারটি দেখাইয়া দিল।

তারপর সরল এবং সহজকণ্ঠে বলিল—কেন শুধু শুধু গণ্ডগোল ক'রছ লক্ষ্মীটি?......তুমি যাবে আমার সঙ্গে? কি বিশাল জমিদারী—কত টাকা-কড়ি, ধন-দৌলত আমার, সবই তোমার হবে...আমি তোমায় রাজরাণী ক'রে ক'লকাতার সহরে রাখব!...

বাতাসে বাতাসে সারা হীরাদীঘি ছাইয়া কেমন একটা করুণ ভৈরবী সুর বাজিতেছে......দীঘির কোলে বন হইতে ডাকিয়া উঠিল একটি শৃগাল...তারপর একটি—তারপরই ওদিক হইতে আর একটি।... শিবাধ্বনি দিক্ হইতে দিগন্তরে ধ্বনিত হইতে হইতে মিলাইয়া গেল।

শোভেন্দ্র প্রথমে মেয়েটির হাতের বাঁধন এবং পরে মুখের বাঁধন খুলিয়া দিয়া ক্ষণকাল স্থিরভাবে তাকাইয়া রহিল—তারপর হুইস্কির বোতলটা তুলিয়া লইয়া দাঁত দিয়াই কর্ক খুলিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া খানিকটা খাইল।

মেয়েটি ফোঁপাইতেছিল।......উঃ মাগো—বলিয়াই বজরার দেয়ালে

মাথা রাখিয়া দুই হাতে মুখ চাপিয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শোভেন্দ্র হুইস্কির বোতলটা হাতে লইয়াই কাছে আসিল এবং কোমল-কণ্ঠে কি বলিয়া তাহার হাত ধরিতেই দলিতা ভুজঙ্গিনীর মতই ঘাড় ফুলাইয়া মেয়েটি সজোরে হাত ছিনাইয়া লইল, বলিল—খবরদার শয়তান, ছোট লোক ছুঁচো কোথাকার, আমায় ছুঁস্‌নে!···

শোভেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। তারপর ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া করুণ নয়নে তাকাইয়া বলিল—কেন শুধু শুধু রাগ ক'রছ আমার ওপর লক্ষ্মীটি? ···ছিঃ, সময় ব'য়ে যাচ্ছে; ছেলেমানুষী ক'রো না; তোমায় আমি মাথার মণি ক'রে রাখব···আমায় বিশ্বাস কর!

আত্মহারা হইয়া ব্যাকুল দুই বাহু বাড়াইয়া শোভেন্দ্র মেয়েটিকে আলিঙ্গন করিতে গেল। আত্মরক্ষার কোনও উপায়ই নাই দেখিয়া মেয়েটি নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য যেন মরিয়া হইয়াই জ্ঞান হারাইয়া শোভেন্দ্রকে এক লাথি মারিল, গর্জ্জন করিয়া বলিল—নচ্ছার, আমার গায়ে হাত দিস্ না। ·· সঙ্গে সঙ্গে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল···

অসতর্ক শোভেন্দ্র টাল সামলাইতে না পারিয়া বজরার ওদিক্‌কার দেয়ালে এক ধাক্কা খাইল···সঙ্গে সঙ্গে হুইস্কির বোতলটা হাত হইতে পড়িয়া একেবারে চৌচির হইয়া গেল।

মুহূর্ত্তে তাহার যেন নেশা ছুটিয়া গেল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আলুলায়িতকুন্তলা রণচণ্ডীর মতই মেয়েটির ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির দিকে ক্ষণকাল স্থির নেত্রে তাকাইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে টিপয়ের উপর হইতে

রিভলভারটি তুলিয়া লইয়া পকেটে ফেলিল এবং কামরার দরজা খুলিয়া ডাকিল—মধু !...

মধু পার্শ্বেই দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল, সম্ভবতঃ কর্ণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ব্যাপারটা কিছু উপভোগ করিতেছিল, হাত জোড় করিয়া বলিল—হুজুর।...

গম্ভীর কণ্ঠে শোভেন্দ্র আদেশ করিল—বজরা ভাসিয়ে বিলের মাঝখানে নিতে বল্, আর গড়গড়িকে ডাক্ !...

গড়গড়ি ছাদের এক কোণে বসিয়া বোধ হয় দুর্গানাম জপ করিতেছিল, এক প্রকার কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়াই দাঁড়াইল।

শোভেন্দ্র গড়গড়িকে কি বলিতে যাইতেছিল—তাহার পূর্ব্বেই মেয়েটি শোভেন্দ্রকে ঠেলিয়া কামরা হইতে বিদ্যুৎবেগে বাহির হইয়া আসিয়া একেবারে গড়গড়ির পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল; তাহার পা দুইখানি সজোরে চাপিয়া ধরিয়া আকুল ক্রন্দনে চিৎকার করিয়া উঠিল। বলিল—নায়েব কাকা—নায়েব কাকা—দোহাই আপনার আমায় বাঁচান !...

দীঘির জলে দাড় ও লগি নামিয়া আসিয়াছে এবং বজরা দীঘি ছাড়াইয়া ভরা বিলের দিকে ছল্ ছল্ করিতে করিতে আগাইয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যা জ্যোৎস্নার আলো অন্ধকারে প্রায় মিশিয়া গিয়াছে। পূব আকাশে হঠাৎ মেঘ করিয়া ইহারই মধ্যে আবার কালো হইয়া উঠিতেছে। কালো আকাশের বুক ফুঁড়িয়া মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক্ সাপের জিহ্বার মতই লক্‌লক্ করিতেছে। সারা দুনিয়া যেন নির্ম্মমতার দাবদাহে দারুণ তপ্ত !

গড়গড়ি একবার মেয়েটির মুখের দিকে আর একবার বন্দিবের মুখের দিকে তাকাইয়া নিশ্চল পাষাণের মতই দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনের অবস্থা তখন কি, জগদীশ্বরই তাহা জানেন—তবুও তাহা দেখিয়া তরুণ জমিদার বেশ একটু উপভোগ করিল।

শোভেন্দ্র কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া কহিল—কি গড়গড়ি—একটু বিপদেই প'ড়লে, না ?···

তখনও মেয়েটি গড়গড়ির পা দু'খানি আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিদানের পশুর মতই কাঁপিতেছিল।—সেদিকে একবার তাকাইয়া শোভেন্দ্র যেন আপন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। তারপর স্থির নেত্রে গড়গড়ির দিকে তাকাইয়া বলিল—কি গড়গড়ি সহজে হবে—না, পাইক দিয়ে জোর ক'রে কাজ হাসিল ক'রতে হবে ?···

গড়গড়ি একেবারে পাষাণে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

শোভেন্দ্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গম্ভীর স্বরেই বলিল—এ-সব আমার কাছে নতুন নয় গড়গড়ি, তবে পল্লীগ্রাম এই যা। কি ভাবে বশ করতে হয় তা আমার জানা আছে।

তারপরই পুনরায় কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিল—জঙ্গল থেকে ধ'রে এনে মানুষ বাঘও পোষে। দু'দিন গেলে সেই বাঘই হ'য়ে যায় কুকুর···পা চাট্‌তে পারলেই নিজেদের ধন্য মনে করে।

গড়গড়ি বহু কষ্টে সমস্ত সঙ্কোচ এড়াইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হাত জোড় করিয়া বলিল—বাবু, দোহাই আপনার—বজরা থেকে আমায় নামিয়ে দিন···আসি এ সব···

হা হা করিয়া শোভেন্দ্র যেন অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল, বলিল—তা কি

ক'রে হয় গড়গড়ি ?…নায়েবী ক'রে চুল পাকিয়েছ…আরও কিছু দেখ অদ্ভুত !

শোভেন্দ্র অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাঁকিল—আজম সর্দ্দার, পাঁড়ে !…

সঙ্গে সঙ্গে বজরার ছাদ হইতে দুই কণ্ঠে উত্তর আসিল—হুজুর… মুহূর্ত্তে দুই মূর্ত্তি আসিয়া সম্মুখে হাজির হইল এবং অদ্ভুত কায়দায় মনিবকে সেলাম বাজাইয়া দিল। তাহাদের একজনের হাতে রাইফল্‌, অপরের হাতে একগাছি লম্বা তেল-পাকান বাঁশের লাঠি।

সেদিকে একবার তাকাইয়াই ভীত-চকিতা হরিণীর মত মেয়েটি ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া গেল। গড়গড়ির পা দুইখানি আরও জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল—নায়েব কাকা, নায়েব কাকা, আমায় বাঁচান—আমি বাঁচতে চাই না, ঐ দীঘির জলে আমায় ফেলে দিন—আপনার পায়ে পড়ি…

বজরা তখন দীঘি ছাড়াইয়া বিলের ধান ক্ষেতের ভিতর পড়িয়াছে। সমস্ত বিলের অসাড় নিশীথ নিস্পন্দতাকে মুখরিত করিতেছে ধান গাছের একটানা শোঁ শোঁ শব্দ। ওদিকে পাগ্‌লা খালের মুখে জলের তোড়ের গুরুগম্ভীর শব্দ সমস্ত মাঠটাকে যেন শাশাইতেছে।

শোভেন্দ্র মাথা দোলাইয়া চোখ টানিয়া বলিল—এমন স্বাভাবিক অভিনয় বহুদিন দেখি না বটে ! পাবলিক্ থিয়েটার হ'লে কেমন চমৎকার মানাত…

তারপর মেয়েটির দিকে তাকাইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—বলি, সহজে হবে, না এদের দ্বারা রাজী করাতে হবে ?

বলিয়াই অঙ্গুলি সঙ্কেতে পাইক দুইটাকে দেখাইয়া দিল।

অদৃষ্টের পাঁচালী

মেয়েদের জীবনে এমন অশুভ মুহূর্ত্তও দেখা দেয়, যখন একেবারে নিরুপায় হইয়া তাহারা মরিয়াই নিজেদের বাঁচাইতে চায়, অথচ সুযোগ বুঝিয়া সেই আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু কিছুতেই ধরা দিতে চাহে না। এ ক্ষেত্রেও হইল তাহাই।

শোভেন্দ্রের প্রতি ভয়ার্ত্ত অথচ তীব্র দৃষ্টির অগ্নিবর্ষণ করিয়া আকুলভাবে মেয়েটি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—ঘরে তোমার কি মা-বোন নেই? তাদের কথা ভেবে আমায়দয়া কর—আমায় মেরে ফেল।

শোভেন্দ্রকে নেশায় ধরিয়াছে। কণ্ঠে ঈষৎ জড়তা আসিয়াছে। বলিল—বাঃ, কথা গুলিও ত দেখ্‌ছি বেশ মধুর। কিন্তু আর আমি দেরী ক'রতে পারছি না—বলিয়াই সে বরকন্দাজ দুইটার দিকে চোখ ফিরাইল।

গড়গড়ি হঠাৎ যেন চাবুক খাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল, বলিল—বাবু, যা ক'রবার তা ত ক'রেছি। আগে আমায় গুলি ক'রে এই ধানক্ষেতে ফেলে দিন, এ দৃশ্য আমি দেখ্‌তে পারব না। বামুনের ছেলে—তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আপনাদের হুকুমে অনেকবার অনেক রকম কঠিন পাপ ক'রেছি···আর আজ মরতে ব'সে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে নিজের মেয়ের মত এই মেয়েটাকে···ওঃ আমি মহাপাপী···ঘরে আমারও মেয়ে আছে বাবু···এখন মরা ছাড়া আমার আর প্রায়শ্চিত্ত নেই···আগে আমাকে···

গড়গড়ির মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না একটা মর্ম্মভেদ গ্লানিতে তাহার সমস্ত অন্তর ভরিয়া গেল। শোভেন্দ্র বজরার দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া চোখ টানিয়া বলিল—বাঃ বাঃ, চমৎকার, এ'ও দেখি আ।

ক গ্র্যাণ্ড্ থিয়েটার। তোমাদের বোধ হয় থিয়েটার করা অভ্যাস আছে ব, কি বল?...

—পাঁড়ে!...শোভেন্দ্র ইসারা করিল।

মনিবের হুকুম পাইয়া পাঁড়ে অগ্রসর হইয়া মেয়েটির হাত ধরিতে গেল —অমনি নায়েব রসিক গড়গড়ি হঠাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইল, লিল—গায়ে হাত দিস্ না পাঁড়ে—আমার জীবন থাকতে হবে !—

মুহূর্তে যেন আকাশ হইতে বজ্র নামিয়া আসিল—সৃষ্টি বোধ হয় হাপ্রলয়ে ডুবিয়া গেল। রায় বংশের আজীবন আজ্ঞাবহ দাস— কান্ত অনুগত ভৃত্যের মুখে এ কি কথা!...শোভেন্দ্র একটু অবাক ইল।

স্বয়ং খোদকর্ত্তার হুকুম—পাঁড়ে ভড়কাইবার লোক নয়।—তবুও একটু তমত খাইয়া গেল। বলিল—কি নায়েব মশাই—এখন যে ভারী ভাল সুয সেজে দাঁড়ালে দেখ্‌ছি!—বলি, আমাদের হুকুম দিয়ে ঘর থেকে য়েমানুষটাকে বার ক'রে আনালে কে শুনি?...কি বল সর্দ্দার?

বলিয়াই আজম সর্দ্দারের মুখের দিকে একবার তাকাইয়া দ্বিতীয় াদেশের প্রতীক্ষায় মনিবের মুখের দিকে তাকাইল।

শোভেন্দ্র চোখ রাঙ্গাইয়া হুকুম করিল—বুড়োটাকে ওখানে পিঠমোড়া 'রে বেঁধে রাখ্, তারপর যা ক'রবার আমি ক'রবখন। আর ওকে রে আর আমার কামরার ভেতর, ঢের ন্যাকামি হ'য়েছে, আর নয়......

আজম সর্দ্দার গড়গড়িকে ও পাঁড়ে মেয়েটাকে ধরিতে যাইতেছিল, ই মুহূর্তে গড়গড়ি আতঙ্ক বিস্ময় উত্তেজনা ও উদ্বেগের যুক্ত তাড়নায়,

ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং মেয়েটিও ভয়ে এতটুকু হইয়া গড়গড়ির পা ছাড়িয়া তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

শোভেন্দ্রের কাছে ব্যাপারটা একটা ভোজবাজীর মত মনে হইতেছিল। নেশায় উত্তেজনায় সে ক্রমেই মশগুল হইয়া উঠিতেছিল। সে বুঝিতেই পারিল না, যে-গড়গড়ি আজ বৈকালে তাহার সুমুখে সোজা হইয়াই দাঁড়াইতে পারে নাই, সে আবার একি ভেল্কী দেখাইতেছে ?···তাজ্জব বটে !

পাঁড়ে আজম সর্দ্দারকে বলিল—দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছ সর্দ্দার ? মনিবের হুকুমও যা, খোদার হুকুমও তাই—বাঁধ ব্যাটাকে—

বিনামেঘে বজ্রপাত হইল···

পিছন হইতে গুরুগম্ভীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল—এই ব্যাটা ছাতুখোর, মনে ভেবেছিস কি ?···এক পা এগিয়েছিস্‌ কি দেবো তোকে এ-জন্মের মত ছাতু খাইয়ে শালা !···

বলিতে বলিতেই লোকটি সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। গলার স্বর শুনিয়া সকলে চিনিতে পারিলেও সকলেরই দৃষ্টি একসঙ্গে তাহার উপর পড়িল। একমাত্র শোভেন্দ্র ছাড়া উপস্থিত সকলেরই সে বিশেষ পরিচিত এবং তাহার মুখের কথা যে শুধু পাগলের প্রলাপ নয়, একমাত্র শোভেন্দ্র ব্যতীত তাহা সকলেই জানিত।

লোকটি লম্বায় ছয় ফুটের বেশী—পরিপুষ্ট সবলদেহ জোয়ান। হাত দুইখানা যেন বাঘের থাবা—বিশাল বক্ষঃস্থল যেন যে কোন কঠিন আঘাত সহ্য করিতে সক্ষম—মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাব্‌রী চুল। শরীরের স্থানে স্থানে কাটা দাগ—পেশীগুলি মোটা দড়ির মতই পাকান লৌহ কঠিন—গায়ের রংও লোহার মতই। হাতে তাহার একগাছি লম্বা তেল পাকান গিরে-বাঁধান বাঁশের লাঠি।

লোকটি কালীদহ কাছারীরই লেঠেল-সর্দার—মহাদেব ঢালি।
প্রকৃতবিক এত বড় লাঠিয়াল এবং এত বড় জোয়ান বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা—যেদিন প্রথম শ্রীনগরের রথের মেলায় সড়কী ও লাঠি খেলার প্রতিযোগিতায় এই লোকটি জমিদার উপেন্দ্র নারায়ণের দৃষ্টিপথে পড়ে। লাঠি ঘুরাইবার ও সড়কী চালাইবার অতি অদ্ভুত কৌশল উহার করায়ত্ত দেখিয়া উপেন্দ্র নারায়ণ নিজে মহাদেবকে ডাকিয়া পুরস্কৃত করেন এবং এই কালীদহ কাছারীর লেঠেল-সর্দারের কাজে নিযুক্ত করেন। এখনও দেশবিদেশের বড় বড় লাঠিয়াল মাটিতে লাঠি রাখিয়া মহাদেবকে গুরুজী বলিয়া নমস্কার করে।

—এ কে?—বলিতে বলিতে শোভেন্দ্র পকেটে হাত ঢুকাইল এবং তাহার উদ্দেশ্য বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াই মহাদেব মেঘের মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সে হুঙ্কার শুনিয়া শোভেন্দ্র একটু কাঁপিয়াই উঠিল।

মহাদেব বজ্রকঠোর কণ্ঠে আদেশের সুরেই বলিয়া উঠিল—খবরদার বাবু, হুঁসিয়ার—ও সব গুলি-গালাজ ভয় ক'রে চলে না মহাদেব ঢালি। বুঝে সুঝে কাজ কোরো কিন্তু।…দুই একটা গুলির দাগ এখনও এ গায়ে আছে…সেও তোমাদেরই জন্যে—দাঙ্গা দখল পেরজা শাশন ক'রতে গিয়ে।…তোমার বাপকেই কোনদিন চুকে কথা কই নি তুমি ত, সেদিনের ছোঁড়া!…নতুন জমিদার হ'য়ে মহালে এসেই এই সব কাণ্ড আরম্ভ ক'রেছ বাবু—মনে ভেবেছ কি তুমি?…বাপকেও ছাড়িয়ে গেলে?…

—বটে—বলিয়া শোভেন্দ্র একটু মাথা নাড়িল।

মহাদেব দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, যা ব'লছি শুনে রাখো বাবু,

যা ভেবেছ তা হবে না। আর্ নিতে বা দিতে আমার একটুকুও বাধে না।… এই বিশ বছরে তোমার বাপের হুকুমে কত ব্যাটাকে এই বিলে পাটপচা পাঁকে ঢুকিয়ে দিয়েছি—সে খবর তুমি জানবে কোথেকে?…

মেয়েটা গড়গড়ির পিছনে দাঁড়াইয়া নতনেত্রে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল—বোধ হয় একমাত্র সর্ব্বংসহা ধরিত্রীকেই স্মরণ করিতে লাগিল।

সেদিকে একবার তাকাইয়াই মহাদেব বুক ফুলাইয়া চোখ রাঙাইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। বলিল—দীঘির ঘাটে বজরা এই বেলা নিতে বলো কিন্তু!…

—বটে!…সোনার চাঁদ—বেড়ে লেক্‌চার শিখেছ ত হে—ব'সে ব'সে আমাদের অন্ন ধ্বংস ক'রে শরীরটিও ত বেশ বাগিয়েছ দেখ্‌ছি…কিন্তু চাঁদবদন, রোগে তোমায় বহুদিনই ধ'রেছে—দাওয়াই ত পাওনি—তাই আজ আমিই—

মুহূর্ত্তে শোভেন্দ্র পকেট হইতে রিভলভারটা টানিয়া বাহির করিল এবং ট্রিগার টানিবার পূর্ব্বেই কেমন করিয়া যে মহাদেবের হাতের লাঠি বিদ্যুৎবেগে ঘুরিয়া আসিয়া তাহার হাতের উপরে পড়িল—সে তাহা বুঝিতেই পারিল না।

রিভলভারটা হাত হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া আওয়াজ হইয়া গেল। সৌভাগ্যবশতঃ কাহারও গায়ে লাগিল না; সঙ্গে সঙ্গে শোভেন্দ্র—ওঃ বলিয়া বাঁ হাতে ডান হাতের কব্জী চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

মুহূর্ত্তে যেন সৃষ্টি ওলট পালট হইয়া গেল। মহাদেব চোখের নিমিষে বাঘের মত আজম সর্দ্দারের উপর লাফাইয়া পড়িয়া এক মোচড়ে তাহার

হাত হইতে রাইফ্‌লটি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে এক প্রচণ্ড লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল। চোখের পলকে মেঝের উপর হইতে রিভলভারটিও কুড়াইয়া লইল এবং দীঘির জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, শব্দ হইল 'ঝুপ'...ব্যাপার দেখিয়া এবং ভাবগতিক বুঝিয়া পাঁড়ে দুই পা পিছাইয়া গিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল এবং তৎক্ষণে ছাদ হইতে আর দুই জন বরকন্দাজ ও মাল্লারা পাঁড়ের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল।

যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া মহাদেবই প্রথমে লাঠি চালাইল এবং প্রথম ঘা'য়েই পাঁড়ে ও একজন বরকন্দাজ বাবার নাম স্মরণ করিতে করিতে লাঠি ছাড়িয়া বসিয়া পড়িল।

মহাদেব গর্জ্জন করিয়া উঠিল—খবরদার, ব্যাটারা এক পা এগিয়েছিস্ কি—এই বিলের ভেতরই তোদের এক একটা ক'রে রসাতলে দিয়ে দেব।...তোদের মত দু'চারটে ইদুঁর মারতে মহাদেবের এক এক থাবাই যথেষ্ট ; পাঁচশ লোকের মহড়া এখনও জায়গায় দাঁড়িয়ে নিতে পারি—রক্তে চাস্ ত এগিয়ে আয়!...

তারপর গড়গড়ির মুখের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—মায়ের দোহাই—এইবার হুকুম দাও দিদি—দিই সব ক'টাকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে, দিই ঐ পাটপচা গাদিতে ঢুকিয়ে...নয় খাড়া ক'রে রাখো—তার বেশী ত আর সাজা নেই। দাও হুকুম, তোমার হুকুম না পেলে যে বুকে বল আসে না।...

কাহারও মুখে একটি কথা নাই...বজরার মধ্যে একটি পাতা পড়িবার শব্দও শুনিতে পাওয়া যায়। মহাদেব সাবিত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—কোন ভয় নেই মা—আমি তোর ছেলে—

তারপরই মাঝিদের দিকে রোষকশায়িত লোচনে তাকাইয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিল—এই ব্যাটারা, বজরার মুখ দীঘির দিকে কেরাস্ নি এখনও? দেখবি তবে মামার বাড়ী?...দেখাব?

দেখাইতে হইল না—বজরা ঘুরিয়া দীঘির দিকে ছুলিতে ছুলিতে আবার ফিরিয়া চলিল।

আকাশ হইতে অবিশ্রান্ত ধারে ইহারই মধ্যে জল পড়িতে সুরু করিয়াছে। বৃষ্টির ফোঁটা পড়িয়া বিলের জলে বুদ্বুদ উঠিতেছে—যেন ফোস্কা। দয়া মায়া স্নেহ মমতা—ইহার কোন চিহ্নই যেন কোথায়ও নাই।

গড়গড়ি এতক্ষণ যেন বিছানায় শুইয়া শুইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল—মহাদেবের কথা কাণে গিয়া তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, সে কি স্বপ্নে এ-সব দেখিতেছে? না জাগিয়া চোখ চাহিয়া রহিয়াছে?...

যাহাদের অন্নে সে চিরকাল প্রতিপালিত, তাহাদেরই একমাত্র বংশধর—শ্রীনগরের ধনকুবের রায়বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী—প্রতাপশালী জমিদার ৺উপেন্দ্র নারায়ণের একমাত্র পুত্র তরুণ জমিদার শোভেন্দ্র নারায়ণের এই দুর্গতি তাহারই কাছারীর অতি অল্প মাহিয়ানার বেতনভুক পাইক মহাদেবের হস্তে।...আর তাহারই পিছনে তাহার পিঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া যে অনূঢ়া মেয়েটি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে আর নিঃশব্দে কাঁদিতেছে, তাহার সতীত্বের কি কোনই মূল্য নেই?...

...আচ্ছা নিজে কেন সে আগে বিবেচনা করিয়া দেখিল না?... অর্থের লোভ? ভবিষ্যৎ?...মনিবের হুকুম?...কোনটি?...

...আচ্ছা শোভেন্দ্রের কথা যদি সে না-ইগুনিত—যদি মেয়েটির এই সর্ব্বনাশ সে না ঘটাইত—তাহা হইলে কি তাহার ফাঁসি হইত ?...

...মেয়েটার এখন উপায় ?...কেউ কি আর এখনও টের পায় নাই ?...সমাজ দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে...বংশে চিরদিনের মত কলঙ্ক থাকিবে...বিধবা মা কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাথা কুটিয়া মরিবে আর বুক ভাঙ্গিয়া অভিসম্পাত করিবে।...কাকে ?...

গড়গড়ি নিজের মনে মনেই বলিয়া উঠিল—আমাকে'! তাহার সমস্ত অন্তর তীব্র অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল ইহকালে ত নয়ই, পরকালেও কৈফিয়ৎ দিবার মত অবশিষ্ট আর কিছুই রহিল না।

...পরকালের কথা পরে আর বর্ত্তমান ? এর ফল কি হইবে ?... চাকুরী ত যাইবেই, অদৃষ্টে আরও কত কি যে বিড়ম্বনা আছে, কে জানে...? প্রকাণ্ড সংসার ঘাড়ের উপর...দুইটি মেয়েকে সত্ত পার না করিলেই নয়... কি ভাবে কি করিবে ?...গড়গড়ির বুক ভাঙ্গিয়া কান্না ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে চাহিল। তাহার চোখ ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মহাদেবের কথায় তাহার চমক ভাঙ্গিল।

—কি নায়েব মশাই, অত ভাব্ছ কিসের লেগে ?...দেব্তা মাথার ওপর থাক্লে এক নায়েবী যাবে ত আর এক নায়েবী পাবে। না হয় ভিক্ষে ক'রেই খাবে, কিন্তু, তাই ব'লে মায়ের ইজ্জত ?...নেমে এস শীগ্গির্ বজরা ঘাটে,·· আয় মা !...এই শালারা সিঁড়ি ফেল্ শীগ্গির !...

গড়গড়ি ও মেয়েটি আগে নামিয়া পড়িল। একে বাঘের মত পুরুষ তার হাতে বন্দুক আর লাঠি—বরকন্দাজরা কাঠের পুতুলের মতই

শুধু তাকাইয়া দেখিল। নামিবার সময় পোলুইএর কাছে দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া মহাদেব শোভেন্দ্রের দিকে তাকাইল। শোভেন্দ্র তখনও মেঝের উপর হাত চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া। মহাদেব বলিল—জমিদার বাবু, বিশ বছর তোমাদের নিমক খেয়েছি কিন্তু নিমকহারামী কোনদিনই করিনি, আজও না। লাঠির কসরং দেখিয়েই তোমাদের গোলামী ঘাড় পেতে নিয়েছিলাম—আর আজ সেই লাঠির মহিমে দেখিয়েই তোমাদের গোলামী তোমাদেরই ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম। মনিব তুমি, যাবার বেলায় এই শেষ সেলাম তোমায় দিয়ে গেলাম।

শোভেন্দ্র দাঁতে দাঁত চাপিয়া দুই হাটুর মধ্যে মুখ গুঁজিল।

পাঁচ

কাঁচা মেঠো রাস্তা—জল কাদায় প্যাচ্ প্যাচ্ করিতেছে। অঝোর ধারে বাদল নামিয়াছে, তার উপর ঝুপ্‌সি অন্ধকার—কোলের মানুষও চেনা দুষ্কর। ঝোপের মাথায় গাছের পাতায় বৃষ্টির জল আছাড় খাইয়া যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে।

তিনটি প্রাণ নিঃশব্দে পথ চলিয়াছে। অগ্রে মহাদেব ঢালি—তাহার হাতে লাঠি ও রাইফ্‌ল্‌টি, মধ্যে মেয়েটি এবং পিছনে নায়েব রসিক গড়গড়ি। তাহাদের অন্তরে যে কি ভীষণ ঝড়, কি ভয়ঙ্কর দুর্যোগ—একমাত্র অন্তর্যামী ভিন্ন কে বুঝিবেন!

কয়েক হাত অন্তর অন্তর রাস্তার পার্শ্বেই ছোট বড় ডোবা। জায়গায় জায়গায় ডোবা ছাপাইয়া জল উঠিয়াছে রাস্তা পর্যন্ত। পথের উপর দিয়া সামান্য সামান্য স্রোতও চলিয়াছে। চলিবার সময় পায়ে জল বাধিয়া শব্দ হয় 'ছপ্ ছপ্'। নিশীথ রাত্রেও ব্যাঙ্‌গুলি কিন্তু পরমানন্দে চারিদিকে বসিয়া রকমারি সুরে ডাকিতেছে। কালো আকাশের গায়ে সর্পাকৃতি বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেন বিষম রোষে ছোবল মারিতেছে।

সম্মুখেই রাস্তার বাঁ দিকে দাঁড়াইয়া একটা প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছ। তারই গা ঘেঁসিয়া একটা বড় ডোবা। এ-পাড়ার মেয়েরা অনেকে আসিয়া

এই ডোবার ঘাটেই বসিয়া সকালে দুপুরে বাসন মাজে, সুখ-দুঃখের গল্প করে, হাসে গান গায়, অন্তরের কথা একে অপরকে বলে।

ডোবা ছাড়াইয়া ডানদিকে মোড় ফিরিলেই প্রথমেই নজরে পড়ে একখানি ছোট খড়ের ঘর। এই-ই ৺চন্দ্রকান্ত মুখুয্যে মহাশয়ের বাড়ী। তাঁহারই একমাত্র কন্যা এই মেয়েটি—নাম সাবিত্রী। বাড়ীটির দুইদিকে আম কাঁঠাল ও সুপারির ছোট বাগান—একদিকে সামান্য ঝোপের মত; পাড়া আরম্ভ হইয়াছে ও দিকে।

তেঁতুল গাছের গোড়ায় দাঁড়াইয়া পড়িয়া পিছন হইতে গড়গড়ি ডাকিল—মহাদেব!—

মহাদেব থমকিয়া দাঁড়াইল এবং পিছন ফিরিয়া তাকাইল।

—শোন্ মহাদেব!—গড়গড়ি আগাইয়া আসিল, চুপি চুপি বলিল—ঐ ত সাবিত্রীদের ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে—ওর মা নিশ্চয়ই জেগেছেন—হয়ত পাড়ার লোকজনও এসে জুটেছে···আর এগিয়ে কাজ নেই···ফের্···সাবিত্রী নিজেই এ পথটুকু যেতে পারবে'খন···আমরা না হয় এখানেই দাঁড়াই!···

সাবিত্রী ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে ছিল—কি বলিতে গেল—কিন্তু তাহাকে বাধা দিয়া মহাদেব বলিল—সে হবে না নায়েব মশাই—এত রাত্তিরে মা'কে একা একা ছেড়ে দেওয়া যায় না।···লোকজন যদি বাড়ীর ওপর এসে জুটেই থাকে—আমরা এক কথা তবু ব'লতে পারব···কিন্তু উনি একা একা এই দুপুর রেতে এই ভাবে বাড়ীর ওপর গিয়ে উঠ্‌লে তোমাদের ভদ্দর লোকের সমাজ কি কিছু শুনবে, না মানবে?···ঝ্যাঁটা নিয়ে তেড়ে মারবে···দাওয়ায় ও ত উঠ্‌তে দেবে না।···

মহাদেবের গলার স্বর কাঁপিয়া উঠিল। সাবিত্রী দুই হাতে মুখ চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

গড়গড়ির গলার স্বর একেবারেই বসিয়া গিয়াছে। বলিল—কিন্তু আমরা গিয়েই বা কি ক'রব তাই বল্!···যা হবার তা ত হ'য়েছে, তোর আমার কথায় কি হবে তাই বল্? তুইই বা কে আর আমিই বা কে?···উল্টে কিন্তু মহাবিপদে প'ড়তে হবে তা ব'লে দিচ্ছি। সব দোষ এসে তোর আর আমার ঘাড়ে চাপবে কিন্তু···বুঝে দেখ্···শেষটায় কিন্তু জেল···গোঁয়ার্তুমি সব জায়গায় খাটে না মহাদেব···

মহাদেব বলিল—কিন্তু নায়েব মশাই, মা'র কোন দোষ নাই বা মা'র কোনো পাপ নেই—এ কথাটা ত দরকার হ'লে আমরা ব'লতে পারব। কিন্তু মা একলা গেলে'ষে কোনো কথাই কেউ শুনতে চাইবে না।···

গড়গড়ি বলিল—মূর্খ কোথাকার, কর্ বাপু তোর যা ইচ্ছে···বেশী বেশী বুঝিস্ তুই···তুই-ই তা হ'লে যা···আমি চ'ল্লাম।···আমার নাম টাম খবরদার বলিস্ নে কিন্তু!

গড়গড়ি ফিরিল। মহাদেব বিদ্যুৎ বেগে তাহার বাঁ হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—কোথা যাও নায়েব মশাই?···কাছারীর চাক্রীতে আমার ইস্তফা হ'য়ে গেছে তখনই, এখন আর আমি তোমার হুকুমের চাকর নই তা মনে রেখো!···আমরা ছোটলোক, আমাদের চেয়ে তোমরা নিজের পথটাই বেশী ক'রে বোঝ, না?···কিন্তু আমার হাত থেকে তোমারও নিস্তার নেই যদি বেয়াড়াপানা কর!···এস আমার সঙ্গে···এক এক ক'রে সব ব'লতে হবে তোমায়!···আয় মা!···

দুই পা গিয়াই মহাদেব বলিল—নায়েব মশাই, বড় চালাক তুমি, না?

জমিদার ব্যাটার কাছ থেকে মোটা টাকা খেয়ে এ সর্ব্বনাশটা ত তুমিই ক'রেছ, তোমাকে যা ইচ্ছে ক'রছে···আগে জানলে কি আর এ ব্যাপার হ'তে দিতাম ? আমাকে রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে কোন কথা আমারে না ব'লে বরকন্দাজ নিয়ে···ছিঃ ছিঃ, তোমার গলায় দড়ি জোটে না ? ঘরে তোমারও ত ডাগর ডাগর মেয়ে আছে, তাদের কথা একবার কি ভেবেছিলে ?

গড়গড়ির মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না।

সাবিত্রী থমকিয়া দাঁড়াইল। মহাদেব অপরাধীর মত বলিল— কি মা, দাঁড়িয়ে পড়লি কেন ? দেব্তার নাম নিতে নিতে চল্—তারপর যা তোর অদেষ্টে আছে, তা ত হবেই।

ক্রন্দনের আবেগে সাবিত্রীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কোন ক্রমে সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—মহাদেব, মা ব'লেই যখন ডাকলে আর এই হতভাগিনীর জন্যে যখন প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে গিয়েছিলে—তখন তোমার ঋণ শুধু স্বীকার ক'রে আর পাপের মাত্রা বাড়াব না। তুমি দেবতা···

জিভ্ কাটিয়া তাড়াতাড়ি নীচু হইয়া মহাদেব সাবিত্রীর পায়ের ধূলা মাথায় ঠেকাইয়া জিহ্বায় স্পর্শ করাইল। তাহার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল—মা'রে, কথাটা যখন তোর ঐ মুখ দিয়ে বেরিয়েই প'ড়েছে মা—তখন আজ আমায় শুধু এই আশীর্ব্বাদ কর্ মা, আর জন্মে যেন তোরই পেটে মানুষ হ'য়ে জন্মাই। তোকে মা ব'লে ডেকে মনের সাধ যেন পূরোতে পারি···কিন্তু মা, আজ কি ক'রে তোকে বাঁচাই বল্ দিকি ?

—সেই কথাই বলছি মহাদেব—মায়ের ইজ্জত বজায় রেখে উপযুক্ত সন্তানের কাজ ক'রেছ···এবার তোমার মা'কে বাঁচাও। তুমি ঠিক পারবে মহাদেব।

গড়গড়ি প্রস্তর মূর্ত্তির মত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিল।

উচ্ছ্বসিত হইয়া মহাদেব বলিল—পারব মা? তুই বল্‌ছিস্ পারব? আচ্ছা বল তা হ'লে, আমায় কি ক'রতে হবে? তোকে বাঁচাতে—তোর মুখ রাখতে যদি আর দশটার মাথা নিতে হয়, কি নিজের প্রাণটা এখুনি বার ক'রে দিতে হয়, তাও রাজী আছি—বল্ শীগ্‌গির···

ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি এবার আরও জোরে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। থম্‌থমে অন্ধকারে গাছের পাতায় পাতায় অস্বাভাবিক শব্দ বাজিয়া উঠিতেছে। গাছের ডালে একটা নিশাচর পাখী পাখা ঝট্‌পট্ করিয়া জল ঝাড়িয়া কর্কশ স্বরে চিৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল। যেন মহাকালের সঙ্কেতে নিশাপ্রহর ঘোষণা করিল।

সাবিত্রী বলিল—মহাদেব, আমি বামুনের মেয়ে—বয়েস হ'য়েছে। ঘর থেকে পরপুরুষে আমার গায়ে হাত দিয়ে বাইরে ধ'রে এনেছে—আর আমার কি আছে বলো? যতই তোমরা আমায় বোঝাতে চেষ্টা কর, লোকে বুঝবে কেন?···মেয়েলোকের কলঙ্ক রটার চেয়ে মরা ঢের ভাল। বেঁচে থাকলেও ঘরে আমার জায়গা হবে না।···দশজনে দশকথা কইবে···এ সব কান পেতে শোনার চেয়ে মরা ঢের ভাল, তাতে শান্তি আছে। তার ওপর আমার মা···তাঁর সুমুখে ফের গিয়ে দাঁড়িয়ে এত বড় আঘাত তাঁকে কেমন ক'রে আমি

দেব ?···মা যে আমাকে ছাড়া কিছুই জানেন না—আমি ছাড়া তাঁর যে কেউই নেই—বলিতে বলিতে সাবিত্রী ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

গড়গড়ি ও মহাদেব কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

চোখ মুছিতে মুছিতে সাবিত্রী বলিল—মহাদেব, তুমি আমায় বাঁচাও।

অধীর ভাবে মহাদেব বলিল—তুই শুধু আমায় হুকুম কর দিকি মা, কি ক'রতে হবে আমায় ?···কি ক'রলে তুই বাঁচিস্ বল দিকি শীগ্‌গির !··· ঘরে আলো জ্বল্‌ছে জ্বলুক্···চল্ আগে দেখে আসি !···তারপর, যদি ঘরে তোর ঠাঁই নাই-ই হয়, তবে আমি এখুনি গিয়ে সে শালা জমিদারের বজরা ভেঙ্গে চুরে সব ক'ব্যাটাকে একেবারে পদ্মবনে পুঁতে রেখে আসব· আর এই গাঁ'টাকে একধার থেকে আর এক ধার পর্য্যন্ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে, হয় এ পোড়া জীবন বার ক'রে দেব, না হয় মায়ে পুতে হাত ধ'রে একদিকে বেরিয়ে পড়ব। সারাদিন না হয় মজুর খেটেই যা পাব, তোর হাতে এনে দেব—তারপর মায়ের পেসাদ পাব। চল্ দিকি আগে।···

সাবিত্রী এক পা'ও নড়িল না, বলিল—শোনো মহাদেব, আমায় যদি সত্যিই বাঁচাতে চাও, তা হ'লে আমার মুখ বেশী করা পোড়াতে আর বাড়ী পর্য্যন্ত টেনে নিও না। এ পোড়ামুখ মা'কে আর আমি দেখাব না—দেখাতে পারব না···ডোবার ঐ কচুরির দামের তলায় আমায় শুইয়ে দাও ! দোহাই তোমার—মা ব'লে যখন ডেকেছ, তখন সন্তানের কাজ কর—কেউই জানতে পারবে না—।

অধীর ভাবে মহাদেব বলিল—তুই ছেলেমানুষ মা, তোর যদি কোন বুদ্ধি শুদ্ধি থাকে ! ম'রেই কি তোর এ কালি তুই ঢাকতে পারবি ? রাত না

পোহাতেই লোকে ব'লতে সুরু করবে—অমুক ঠাকুরের মেয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে রে ; তারপর, রোদ উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই এক গাঁ থেকে আর এক গাঁ র'টে যাবে। বল্, সেইটেই কি ভাল হবে ?···কি নায়েব মশাই, কথা ব'লছ না যে ?···

গড়গড়ি 'হ্যাঁ' 'না' কোন কথাই বলিল না। নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

মহাদেব বলিল—তুই মা এগিয়ে আয় ত আমার সঙ্গে—মরতে হয় ত মরবি, তার জন্তে আর ভাবনা কি ? তুই ত ইচ্ছে ক'রে ঘর থেকে বেরুস্ নি—তোর দোষটা যে কোন শাস্তরের মতে, তা ত আমার মাথায় ঢুকলো না। আয়, দেরী করিস্ নি মা···।

হাতের বন্দুকটা মহাদেব ডোবার মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, শব্দ হইল—'ঝুপ'।

পল্লীবনের মাথায় মাথায় বর্ষার অবিশ্রান্ত ঝোরার ভয়ার্ত সুর পাথরের মত ভারী হইয়া উঠিয়াছে। নিশীথ বাদল-রাতের অন্তর হইতে শুধু ক্রন্দনেরই একটানা সুর ভাসিয়া আসিয়া যেন চতুর্দ্দিকে মাথা কুটিয়া মরিতেছে।

ডোবা ছাড়াইয়া ডাহিনের সড়ক বাহিয়া তিনটি মূর্ত্তি আবার পা টিপিয়া টিপিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। সম্মুখেই সাবিত্রীদের কাঁচা বাড়ী—কাঁচার বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে অল্প অল্প আলো দেখা যাইতেছে।

বাড়ীর সীমানায় ঢুকিবার আগেই গড়গড়ি বলিল—মহাদেব, কি ব'লবি এখন বল্ দিকি ? দোহাই তোর, আমার নাম যেন···

—আরে রাখো নায়েব মশাই, তোমার যত আজে বাজে কথা।

তুমি আছ তোমার নিজের তালে। যা ব'লতে হয়, তুমি না পার আমি বলব'খন।···কিন্তু লোকজনের সাড়াশব্দ ত কিছু দেখছি না···জয় মা কালী—মা, মুখ রাখিস্ মা!···মা'য়ের নাম স্মরণ করিতে করিতেই মহাদেব আগে আগে চলিল।

খিড়কী পার হইয়া উঠান। সাবিত্রীর বুকে হাতুড়ির ঘা পড়িতে লাগিল। পা টিপিয়া টিপিয়া উঠানের উপরে আসিয়া সভয়ে সে বারান্দার দিকে তাকাইল। ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ, কিন্তু পাকাটির কাঁচা বেড়ার ফাঁক দিয়া যে আলোর রশ্মি বারান্দার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে তাহাতেই সে দেখিল, বারান্দার উপরে কেউই নাই।

···কেউই কি তবে আসে নাই? কেউই কি তবে টের পায় নাই?··· সাবিত্রী মনে মনে বলিল—ভগবান!

···তখন ঘর ছিল অন্ধকারময়, এখন ঘরে আলো জ্বলিতেছে। ঘুমের ঘোরে কি যে হইয়াছিল কিছুই ত সে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু যখন সত্যই সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহার কপাল পুড়িয়াছে—তখন চিৎকার করিবার বা মা'কে ডাকিয়া এই ছোট্ট কথাটি বলিবার সুযোগটুকুও ত দুর্বৃত্তেরা তাহাকে দেয় নাই—তখন যে তাহার মুখ বাঁধা···।

···মা নিশ্চয়ই টের পাইয়াছেন—মা নিশ্চয়ই জাগিয়াছেন, হয়ত চিৎকারও করিয়াছেন! বর্ষার রাতে হয়ত কেউই শুনিতে পায় নাই—হয়ত আলো জ্বালিয়া বসিয়া হতভাগিনী কন্যার জন্য অভাগিনী জননী শিরে করাঘাত করিয়া নীরবে চোখের জল ফেলিতেছেন···।

আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে সাবিত্রী শঙ্কিত পদে দাওয়ার কোলে আসিয়া দাঁড়াইল।

গড়গড়ি ও মহাদেব উঠানের উপরেই দাঁড়াইয়া রহিল, বোধ হয় দুর্গা নাম জপ করিতে লাগিল।

সাবিত্রী ধীরে ধীরে দাওয়ার উপরে উঠিল এবং টিপিয়া টিপিয়া পা ফেলিয়া দরজার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল—হয়ত এ দ্বার তাহার পক্ষে চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মা'কে ডাকিতে গেল, কিন্তু পারিল না, কণ্ঠ হইতে স্বরই বাহির হইল না।···কে যেন তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে!···তাহার সর্ব্বশরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কান্নাবিজড়িত স্বরে বহু কষ্টে সাবিত্রী ডাকিল—মা!···

ঘর হইতে কোনই সাড়া আসিল না। সাবিত্রীর বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া থাকিতেও তাহার কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। আবার ডাকিল—মা!···

সাড়া না পাইয়া আর একবার ডাকিল, এবার আরও একটু জোরে··· মা কি তবে ঘুমাইয়াছেন? না—দুঃখে লজ্জায় অভিমানে কলঙ্কিনী কন্যার ডাকে সাড়া দিতেছেন না?···

মনে মনে সে বলিল—জগদীশ্বর, আমার দোষ কতটুকু, তাত তুমি জান!

দরজাটা ভেজান ছিল। মৃদু আঘাত করিতেই খুলিয়া গেল।

প্রথমেই চোখে পড়িল লক্ষ্মীর আসনের মাটির প্রদীপটি দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে আর তাহারই ওপাশে প্রকাণ্ড সিঁধএর গর্ত্তটি 'হা' করিয়া রহিয়াছে। এ পাশে তাহাদের বিছানাটা এলোমেলোভাবে ছড়ান, কিন্তু মা?···মা কোথায়?

সাবিত্রীর পায়ের তলা হইতে যেন মাটি সরিয়া গেল। তাহার বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল—চোখের সম্মুখে দুনিয়া যেন অন্ধকারে একাকার হইয়া গেল।

পাগলিনীর মত সে ছুটিয়া ঘরে ঢুকিল এবং বাঁ দিকে তাকাইয়াই চমকিয়া শিহরিয়া উঠিয়া—উঃ মাগো—বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে মেঝের উপরে পড়িয়া গেল।

ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া মহাদেব একলাফে গিয়া দাওয়ার উপর উঠিল এবং দরজার উপর ঝুঁকিয়া ঘরের ভিতর মুখ বাড়াইয়াই চমকিয়া উঠিল···অকস্মাৎ অতি সন্নিকটে বজ্রপাত হইলে পথ-চলতি-পথিক যেমন করিয়া চমকিয়া উঠে।···

সে দেখিল, বিধবার প্রাণহীন দেহ ঘরের আড়ার সহিত ঝুলিতেছে।···বোধ হয় মেয়ের কলঙ্ক-কথা দশের মুখে শুনিতে হইবে, এই ভয়েই নিরুপায় নিঃসহায় নিঃসম্বল জননী উদ্বন্ধনে জীবনটাকে বাহির করিয়া দিয়াছেন।···সে দৃশ্য দেখিয়া নির্ভীক তেজস্বী মহাদেবেরও প্রাণ কাঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল; মুহূর্ত্তে তাহার যত রাগ যত দুঃখ গিয়া পড়িল শোভেন্দ্র আর গড়গড়ির উপর। কম্পিত স্বরে সে ঘাড় ফিরাইয়া ডাকিল—নায়েব মশাই!···

সাড়া না পাইয়া আবার ডাকিল, তারপরই উঠানে লাফাইয়া পড়িয়া চারিদিকে বিপন্নের মত তাকাইতে তাকাইতে অস্ফুটস্বরে ডাকিল—নায়েব মশাই?

আর নায়েব মশাই······

ছয়

তৈলাভাবে প্রদীপটি নিভিয়া আসিতেছে। বাহিরে বৃষ্টি এতক্ষণে টিপ্ টিপ্ করিয়া পড়িতেছে। বর্ষণ-মুখর রাত্রিও বোধ হয় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বাড়ীর উত্তর কোণে কদমগাছটার উপর হইতে একটা পাখী বীভৎস চিৎকার করিয়া উঠিল কোঁ-কর্‌র্‌-র্‌,···বোধ হয় নিশার শেষ প্রহর ঘোষণা করিল।

অনেকক্ষণ বাদে সাবিত্রীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। উপুড় হইয়া সে চোখ বুজিয়াই প্রথমে ভাবিবার চেষ্টা করিল···সে এখন কোথায়? কি হইয়াছে তাহার?···আবার যেন তাহার মাথা ঘুরিয়া আসিল। চোখ বুজিয়াই সে মাথা উঁচু করিল এবং জোর করিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল।

ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া প্রথমে প্রদীপটির দিকে তাকাইল, দেখিল প্রদীপটি একেবারেই নিভিয়া আসিতেছে। তারপর সভয়ে তাকাইল মা'র দিকে—দেখিল মায়ের মৃতদেহ তেমনিই স্থিরভাবে ঝুলিয়া রহিয়াছে। তারপর দরজার দিকে চাহিয়াই সে সত্রাসে চিৎকার করিয়া উঠিল। পুনরায় তাহার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল।

স্তিমিত আলোকে সে মহাদেবকে ঠিক চিনিতে না পারিয়া

এক বিষম ভুল করিয়া বসিল। মালকোচা-মারা এক ভীষণ দর্শন পুরুষকে প্রকাণ্ড এক গাছি লাঠি হাতে দরজার সম্মুখে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে মনে করিল, সাক্ষাৎ মহাকালের দূত হয়ত তাহার মা'য়ের প্রাণ লইতে আসিয়াছে।

মহাদেব ব্যাপারটা কতক অনুমান করিয়া এবং সাবিত্রী উঠিয়া বসিয়াছে দেখিয়া ব্যস্তভাবে বলিল—ভয় নেই মা, এই যে আমি, আমি মহাদেব, তোমার ছেলে।···

সাবিত্রীর দেহে প্রাণ আসিল। কম্পিত কণ্ঠে বলিল—ও, মহাদেব? তুমি?···মহাদেব, তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ?···নায়েব কাকা?··· সাবিত্রীর চোখ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

—আর নায়েব কাকা!···মহাদেব গর্জ্জন করিয়া উঠিল—রাখো মা তোমার নায়েব কাকা, ব্যাটা পালিয়েছে। শালাকে কালই আমি যমের বাড়ী পাঠাবো, তবে আমার নাম মহাদেব ঢালি।···

সাবিত্রী কাপড়ের আঁচলে মুখ ঢাকিল। মহাদেব কোমল স্বরে বলিল—কিন্তু মা—আর ত তোর শুয়ে থাকলে চলে না। কাঁদবার ঢের সময় পাবিরে মা—এখন কি ক'রবি বল্ দিকি?···তোর এই বিপদ্—আমায় 'ছেলে ব'লে ডেকেছিস্—ইচ্ছে ক'রছে দিই প্রাণটা বার ক'রে তোর পায়ের তলায় ফেলে। কিন্তু মা—আমার যে নরকের গোড়েও জায়গা হ'বে না। এই এতক্ষণ তুই জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে আছিস্, আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছি আর ভাবছি এখন কি করা!······আজ পর্য্যন্ত এই মহাদেবের চোখে এক ফোঁটা

জল কোনদিন কেউ দেখেনি—বলিতে বলিতে মহাদেব কাঁদিয়া ফেলিল।

সাবিত্রী চোখের জল মুছিয়া বলিল—তুমি কাঁদছ কেন মহাদেব ?…

বালকের মত আকুল ক্রন্দনে বুক ভাসাইয়া মহাদেব বলিল—কাঁদছি কেন মা ? হায় হায়, আমার হয়েছে কি ?…আমার কান্না দেখে যে বনের পাখীগুলোও কেঁদে সারা হবে মা। নায়েব মশাই আমাকে ঐ রাস্তার মোড়ে তেঁতুল তলায় দাঁড় করিয়ে রেখে পাইক চারটেকে নিয়ে এদিকে যখন এল তখনও আমি বুঝতে পারিনি। তারপর যখন তোকে বার ক'রে নিয়ে রাস্তা বেয়ে চ'লল—আমি টের পেলাম তখন…তখনও যদি আমি লাঠি বাগিয়ে দাঁড়াতাম—তা হ'লে কি আর সাধ্যি ছিল ঐ ব্যাটাদের আমার হাত থেকে তোকে নিয়ে যাবার ? শালা নায়েবটা আমায় কিছু বুঝতেই দিল না আগে থেকে।…

সাবিত্রী সংযতকণ্ঠে বলিল—তুমি চুপ কর মহাদেব—আমার মাথার ভেতর আবার কেমন ক'রছে—আমি এখুনি আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলবো।

হাতের চেটোয় জলে ভর্ত্তি করমচার মত রাঙ্গা চোখ দুইটি মুছিয়া ফেলিয়া মহাদেব ধরা গলায় বলিল—রাত ত আর বেশী নেই মা—পাড়ার এখনও কেউ জানতে পারেনি দেখ্ছি। যা হবার তা ত হ'য়েইছে। এখন কি উপায় করা যায় বল্ ?……আর খানিক বাদে ভোর হ'লেই যে তোর বাড়ী মস্ত মেলা ব'সে যাবে।

সাবিত্রী অধীরভাবে বলিল—আমি যে কিছুই ভাবতে পারছি না

মহাদেব—আমার মাথার ভেতর ঝিম্ ঝিম্ ক'রছে। মা নেই—আমিও বেঁচে থাকতে চাই না আর···সাবিত্রী উচ্ছ্বসিত হইয়া পুনরায় কাঁদিয়া উঠিল।

মহাদেব বলিল—শোন্ মা—আমি যা বলি!···তুই ওঠত—ওভাবে ব'সে কাঁদলে ত আর চ'লবে না। আগে পিদ্দীমটায় একটু তেল দে—পা পুড়ছে যে ওর, এখুনি নিভে যাবে।···

সাবিত্রী যন্ত্রচালিতের মত কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বোতল হইতে একটু তেল ঢালিয়া দিয়া প্রদীপের সলিতাটা আগাইয়া দিল।

মহাদেব বলিল—এইবার দে ত মা কোদালখানা আমায় বার ক'রে··· আর তার আগে এক কাজ তোকে ক'রতে হবে মা। বামুনের মেয়ে—বিধবা—আমি ছোঁয়া ত দূরের কথা, ঘরে ঢুকতেও পারব না।

—কি ক'রতে হবে মহাদেব?···

—তুই কি পারবি মা?···কিন্তু না পারলে যে কোনো উপায়ই নেই ···তোকে যে পারতেই হবে মা!···কেন পারবি না?···

—পারব, তুমি বল মহাদেব।

—ওঠ্ত মা, উঠে শক্ত ক'রে কাপড়টা কোমরে জড়িয়ে নে আগে। কত দুঃখু কত কষ্ট মনের ভেতর নিয়ে তোর মা জীবনটাকে ঐভাবে বার ক'রে দিয়েছেন—এর পর যদি দশজনে দশকথা বলে—সে দুঃখু রাখবি কোথায় মা বল্ দিকি?···পুলিশের হাঙ্গামা হবে—বামুনের বিধবা বাসিমড়া হবে। ঘরের ভেতর মড়া ঝুলছে দেখলে মড়া ত কেউ ছোবেই না—জাত যাবে যে আগে।···

সাবিত্রীর চোখের জল উবিয়া গিয়াছে। কি করিতে হইবে, না

বুঝিয়াই মন্ত্রমুগ্ধের মত সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মহাদেবের কথামত কাপড়খানি কোমরে শক্ত করিয়া জড়াইয়া পরিল।

মহাদেব বলিল—আগে একটা বিছানা দাওয়ায় এনে পেতে দে, তারপর ব'লছি।

সাবিত্রী তাহাই করিল এবং ঘরে গিয়া ঢুকিল।

—এইবার ঐ কাঠের বাক্সটা একটু টেনে নে ত মা ওখানে, আর জাঁতিখানা নিয়ে ওর উপরে উঠে দাঁড়া। কিচ্ছু ভয় নেই মা, আমি র'য়েছি। মা'র মুখের দিকে তাকাস্ না এখন।···

বাক্সটা পার্শ্বেই ছিল। ইহারই উপরে দাঁড়াইয়া বিধবা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

মহাদেব যাদুকরের মতই দাঁড়াইয়া সাবিত্রীর চোখের উপর চোখ রাখিয়া হুকুম করিল এবং সাবিত্রী যেন তাহার নিজের সমস্ত সত্ত্বা হারাইয়া সুপারি কাটা জাঁতিখানা হাতে লইয়া বাক্সের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মায়ের দিকে তাকাইয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অভয় দিয়া কণ্ঠস্বর দৃঢ় করিয়া মহাদেব বলিল—কোনো ভয় নেই মা, —আমি র'য়েছি। ভয় কি? তোরই ত মা—বুকে বল এনে শক্ত হ'য়ে দাঁড়া!···এবার ডান হাতে মাকে বুকের সঙ্গে জাপ্‌টে ধ'রে গলার দড়িটা আস্তে আস্তে কেটে ফেল্—তারপর নামিয়ে নিয়ে আয়।···কোনো ভয় নেই তোর—

সাবিত্রী অসহায়ের মত মহাদেবের মুখের দিকে তাকাইল।

মহাদেব বলিল—কি করবি মা—তোকে যে পারতেই হবে, আমি আকাশ পাতাল ভেবেছি···এ ছাড়া আর যে কোন উপায়ই নেই।

সাবিত্রী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—রাখতে পারব ত ? যদি না পারি ?···

—নিশ্চয়ই পারবি মা, আমি বল্‌ছি, হ্যাঁ, ঐভাবে ধর্‌···

দড়ি কাটিয়া বহুকষ্টে সাবিত্রী মায়ের মৃতদেহ নামাইয়া মহাদেবের মুখের দিকে তাকাইল। তাহার চোখ দিয়া দর্‌ দর্‌ ধারে জল পড়িতে লাগিল।

মহাদেব বলিল—বড্ড হাঁপিয়ে প'ড়েছিস্‌ মা, কিন্তু কি কর্‌বি বল্‌! আর একটু কষ্ট ক'রে কোল পাঁজা ক'রে ধরে দাওয়ায় নিয়ে আয়—এনে শুইয়ে দে।···বলিয়াই সে দাওয়া হইতে উঠানে নামিয়া দাঁড়াইল।

শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া সাবিত্রী কোনমতে মায়ের মৃতদেহ আনিয়া বারান্দায় শোয়াইয়া দিল এবং মহাদেবের নির্দ্দেশে মায়েরই একখানা কাপড় ঘর হইতে আনিয়া মৃতের সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিল।

মহাদেব কোদালখানা হাতে তুলিয়া লইল, বলিল—এইবার পিদ্দীমটা দোরের কাছে এনে রাখ্‌, রেখে মা'র শিয়রে ব'সে তোর যত খুশী কাঁদ্‌।···পাড়া থেকে কেউ এলে ব'লবি···বুকে ব্যাথা উঠে মা শেষরাত্তে মারা গেছেন···। খবরদার এসব কথা কাউকে বলিস্‌ নি যেন—তা হ'লে এ মড়া কিন্তু কেউই ছোঁবে না।···আর ঐ দড়িটা ফেলে দিয়ে বাক্সটা ঘরের মাঝখান থেকে সরিয়ে রেখে এসে বোস্‌।··· তোর ঐ ভিজে কাপড়খানাও ছেড়ে রেখে অন্য একখানা কাপড় প'রে আয়! ·· সবই তোর বরাত রে মা, কি করবি বল ?···

সাবিত্রী তাহাই করিল। এত দুঃখেও তাহার মন একটু আশ্বস্ত হইল। স্বার্থহীন অনাত্মীয় দেবতুল্য এই লোকটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার দুই

জলে ভরিয়া উঠিল। মায়ের শিয়রে বসিয়া সাবিত্রী বলিল—কিন্তু
াল নিয়ে তুমি কোথায় চললে মহাদেব ?…

—আমি ঘরের ঐ সিঁধটা বুজিয়ে ফেলে এখুনি আসছি মা।
নে মা, ঐ দেখে আবার দশজনে দশরকম কথা কইবে—দশ রকম
ব। দরকার কি তা দিয়ে, কাজটা মিটিয়েই ফেলি।……তুই
মা—কোন ভয় নেই, ওখানে ব'সেই আমায় দেখতে পাবি তুই…
ঘড়া দিতে পারিস্‌রে মা ?…

ঙ্গিতে উঠানের এক কোণে পরিত্যক্ত একটি মাটির কলস সাবিত্রী
ইয়া দিল। উঠানের পশ্চিমে আমতলায় একটি ছোট ডোবা। অন্য
শুকাইয়া যায়, শুধু বর্ষার কয়মাস উহাতে জল থাকে। কলসীটি
ভিতর ডুবাইয়া লইয়া মহাদেব ঘরের পিছনে গিয়া কাজে লাগিয়া
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এখনও পড়িতেছে—জল সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই।
টি ভেজাই ছিল। মহাদেবের বিশেষ বেগ পাইতে হইল না।
সজল চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল, মহাদেব দুই হাতে
শ হাতের কাজ করিতেছে; জল-মাখা বড় বড় মাটির তাল
সিঁধ'এর মুখে মারিতেছে।

ধ ঘণ্টার মধ্যেই কাজ শেষ করিয়া গলদঘর্ম্ম হইয়া মহাদেব সামনে
দাঁড়াইল, বলিল—ঘরে ত আমি যেতে পারব না মা, তুই ঘরের
একটু ঠিক ক'রে রেখে আয়—এসে হাত ধুয়ে বোস্‌।
আছে মা ঘরে?……কুড়ুল যদি থাকে তবে বার
!…

কুড়ুল দিয়ে আবার কি ক'রবে মহাদেব ?…

—কাঠ লাগবে যে মা শব দাহ ক'রতে।···চট্‌পট্‌ নিয়ে আয় মা, রাতও যে পুহিয়ে গেল। তবু ভাল, যে বাদ্‌লার রাত তাই কেউ টের পায়নি—তোর মাও বোধহয় চিৎকার করেন নি।···কিন্তু তোকে ব'লে রাখছি মা, এই মহাদেবের হাতের লাঠি যদি ঐ শালা নায়েব আর জমিদার ব্যাটার মাথা ছাতু না ক'রতে পারে তবে মহাদেব এ জীবনে আর লাঠিই ধ'রবে না।······হায় হায়, এ ব্যাপার জানলে কি আর সে ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়ে আসতাম!···

কলসীটা ফেলিয়া দিয়া কোদালখানা ডোবার জলে ধুইয়া উঠানের পার্শ্বে রাখিয়া হাতের পায়ের কাদা ছাড়াইয়া মহাদেব ব্যস্তভাবে কুড়ুলখানা হাতে তুলিয়া লইল।

•

ভোর হইতেছে। চারিদিকে কাক কুলু ডাকিতে সুরু করিয়াছে। চারিদিকেই জাগরণের সাড়া। নিস্তব্ধ সদ্যস্নাত প্রকৃতি যেন আবার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দূর-দেশান্তর হইতে আসিতেছে।

সে সব কিছুকেই ছাপাইয়া সমস্ত পল্লীকে জাগাইয়া মহাদেবের হাতের কুড়ুলের কর্কশ কঠিন শব্দ বাহির হইতে লাগিল—ঠক্‌ ঠক্‌ ঠক্‌······

সাত

এতক্ষণ এক প্রকারে কাটিয়াছে কিন্তু এবার সাবিত্রীর চোখে বন্যা ছুটিয়া আসিল। তাহার আর্ত্তনাদ সত্যই মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিল।

…ঐ যে গাছ কাটিতেছে আর একটু বাদেই ত মা'কে লইয়া যাইবে, তারপর পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিবে।…এ জীবনে সে আর মাকে দেখিতে পাইবে না—মা বলিয়া ডাকিতে পারিবে না; যে মা তাহাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতে পারেন নাই, সাবিত্রী বলিতে যিনি অজ্ঞান; অথচ তাহারই জন্যে ত মা আত্মহত্যা করিলেন……সাবিত্রী এবার মাথা কুটিয়া কাঁদিতে লাগিল।

…মা নাই—তাহার মা নাই।…আর তিনি চোখ মেলিবেন না—আর তাহাকে সাবিত্রী বলিয়া ডাকিবেন না—আর যত্ন করিয়া তাহার চুলগুলি দুই বেলা বাঁধিয়া দিবেন না। ভালমন্দ খাইবার জন্য কাছে বসিয়া পীড়াপীড়ি করিবেন না—বুকের মধ্যে লইয়া শুইয়া গল্প করিতে করিতে তাহাকে ঘুম পাড়াইবেন না। স্বপ্ন—স্বপ্ন—স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে—এ জন্মের মত সব ফুরাইয়াছে।

মনের মধ্যে ছবিগুলি এক এক করিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল আর সাবিত্রীর বুক যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল।

আজ সে কোথায়—কাহার কাছে দাঁড়াইবে?···মা'ই যদি ঐভাবে তাহাকে ছাড়িয়া গেলেন—তবে আর বাঁচিয়া লাভ?···

কত আশাই ছিল তাঁহার······পাড়ার লোকদের কাছে কতবার কত সময়ে তিনি বলিয়াছেন—আমার ছেলে নেই—মেয়ে দিয়ে আমি ছেলে আনব ঘরে।······মেয়ের রূপ······মেয়ের রূপ লইয়া কতখানি—কতখানি গর্ব্ব ছিল তাঁর মনে···। তেঁতুল তলায় ডোবার ঘাটে বসিয়া বাসন মাজিতে মাজিতে সেদিনও চৌধুরীদের ছোটবৌ লক্ষ্মীর কাছে গল্প করিয়াছেন—সাবিত্রীর লক্ষণ ভাল—গণকে ব'লেছে ও আমার রাজরাণী হবে, তুমি দেখো ছোটবৌ! যদিও আমার পয়সাকড়ি নেই, কিন্তু আমরা নিকষ কুলীন—আমার শ্বশুরের বংশ খুব উঁচু বংশ। এ বংশের মেয়ে লোকে লুফে নেয়। সাবি এই ত পনেরয় পা দিয়েছে কিন্তু এরই ভেতর মা পাঁচ ছ' জায়গা থেকে ওর সম্বন্ধ এসে গে'ছে······আমিই রাজী হইনি। একটাও যেন সেরকম মনে ধরে না। একটা ত মেয়ে আমার—মেয়ে আমার সুন্দরী—লেখাপড়াও বেশ একটু শিখেছে—ওকে আমি যা তা ক'রে বিদেয় ক'রতে পারব না।

সাবিত্রী তখন মায়ের পার্শ্বে বসিয়া তেঁতুল ও বালি দিয়া পোড়া বাসন মাজিতেছিল—মা'য়ের মুখে বিবাহের কথায় তাহার মুখ একেবারে লাল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া ছোটবৌ মাকে বলিয়াছিল—যাই বলুন বামুনমা—সাবিত্রীর মত মেয়ে এ-গাঁয়ে আজ পাঁচ বছর এসে অবধি একটিও দেখিনি আমি। অমন রূপ—অমন গুণ—অমন কথাবার্ত্তা—অমন বুদ্ধি—এতেও যদি ও বড়-লোকের গিন্নী না হ'তে পারে—তখন আমায় ব'লবেন।

যে আম গাছটার গোড়ায় ক্রমাগত কুঠারাঘাত পড়িতেছে তাহার ডালের দিকে চাহিতেই সাবিত্রীর চোখ বুজিয়া আসিল। ওর পাতায় পাতায় যেন মায়ের কথা লেখা রহিয়াছে।······আমগুলি ওর যেমন বড়, তেমনিই মিষ্টি। গাঁয়ের ভিতর এ রকম আম নাকি আর কোনও গাছেই হয় না। ভাগ্যি বাড়ীর উপরেই গাছটা তাই রক্ষা, নইলে অন্যান্য গাছগুলিতে পাড়ার ছেলেরা ত ঢিল মারিয়া মারিয়াই পাকিবার অবসর পর্য্যন্ত দেয় না।······তিন মাস আগেও এ গাছে কত আম ছিল—রাত্রে বাদুড়ে ঠোক্‌রাইয়া কত আম তলায় ফেলিত। পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা, এমন কি মেয়েরা পর্য্যন্ত, ভোর রাত্রে কতদিন চুপি চুপি এই গাছের তলায় আম কুড়াইতে আসিয়াছে। বিছানায় শুইয়াই পাতার শব্দে মা টের পাইয়া বলিয়াছেন—আম কুড়োয় কে গা?······বাড়ীর ওপরের গাছ, তোমাদের ত বাপু গেরস্থর কথাটা একটু ভাবা উচিত। কাক কুলু এখনও ডাকেনি, আম কুড়ুতে বেরিয়ে প'ড়েছ?···তারপর স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন—আমার সাবিত্রী এ গাছের আম বড্ড ভালবাসে। এ তলায় বাপু তোমরা আর এসো টেসো না।···

কতদিন তিনি শেষ রাত্রে নিজে উঠিয়া আম কুড়াইয়া আনিয়া কন্যার শিয়রে সেগুলি রাখিয়া দিয়াছেন। ঘুম হইতে উঠিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে সাবিত্রী প্রথমেই চাহিয়া দেখিয়াছে, শিয়রে আমের রাশি। অভ্যাস মত তাড়াতাড়ি হাতে দুই একটা তুলিয়া লইয়া গন্ধ শুঁকিয়া রাখিয়া দিয়া সে মা'কে বলিয়াছে—এ আম কখন কুড়ুলে মা? এ-ত?······চলচ্চিত্রের মত একটার পর একটা সাবিত্রীর চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

সাবিত্রী এবার মাথা কুটিয়া পাড়া মাতাইয়া বুককাটা কান্না কাঁদিতে লাগিল।—মাগো, আমার ফেলে কোথা গেলে গো—কোথায় আমি দাঁড়াব ?···মহাদেবের হাতের কুড়ুল একইভাবে উঠিতেছে, নামিতেছে—তাহার যেন কোনদিকে আর লক্ষ্যই নাই।

প্রতিবেশী পুরুষ এবং স্ত্রীলোক এইবার এক এক করিয়া বাড়ীর উপরে আসিয়া জুটিতে লাগিল।

প্রথমেই আসিলেন বাঁড়ুয্যে বাড়ীর বড় গিন্নী। আসিয়াই দাওয়ার দিকে তাকাইয়া চক্ষু কপালে তুলিলেন। তারপর মহাদেবের নিকট আগাইয়া গিয়া বলিলেন—হ্যাঁরে মহাদেব, ব্যাপার কি বাবা ?···রাঙাবৌ কি তা হ'লে···?

কুড়ুলখানি কাঁধে তুলিয়া লইয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া মহাদেব বলিল—আর ব্যাপার! এই ত শেষ রেতে দিদি-ঠাকরুণ দেহ রাখলেন···

—তার মানে ?···পিছন হইতে প্রশ্ন করিলেন চৌধুরীদের সেজবাবু।

মহাদেব বলিল—এই ত শেষ রেতে বুকে ব্যথা উঠে হার্টফেল্ ক'রলেন। আমাদের জমিদার বাবু এসেছেন কিনা, তাই নায়েব মশাই ব'লে দিয়েছিলেন রাত থাকতে যেতে। শেষ রাতে এ পাড়া দিয়েই কাছারী বাড়ী যাচ্ছিলাম—সাবিত্রীমা'র কান্না শুনে দৌড়ে এসেই দেখি, আর দেরী নেই···

—বটে ?···তা ঘর থেকে বার ক'রে দাওয়ায় আনলে কে ?···প্রশ্ন করিলেন হরিশ পণ্ডিত।

—ভয় নেই পণ্ডিত মশাই, আমি উঠোনেই ছিলাম। সাবিত্রীমা'কে

ব'লতেই মা নিজে দিদি ঠাকরুণকে বার ক'রে নিয়ে এসেছিলেন। পণ্ডিত মশাই, পাপ পুণ্যির ভয়টা আমাদেরও আছে।

—তা হ'লে ঘরের ভেতরে থাকৃতেই প্রাণটা বেরিয়েছে বল্?···জিজ্ঞাসা করিলেন চাটুয্যে মশাই।

মহাদেব কাহাকেও চুকিয়া কথা বলে না। বিরক্তি সহকারেই বলিল —জিজ্ঞেস করুন গিয়ে সাবিত্রীমাকে। আমি ত জানি দাওয়ায় নিয়ে আসবার পর···

—নাম টামও বোধ হয় একটা দেওয়া হয়নি—তা আমাদের কাউকে একটা ডাক দিয়ে আনতে পারলি নে? এই বুদ্ধিটুকু তোর হ'ল না রে বাপু? কি আশ্চর্য্য! ঐ একরত্তি মেয়েটা মড়া আগলে সেই শেষ রাত্তির থেকে ব'সে আছে?···প্রশ্ন করিলেন চক্রবর্ত্তী মশাই।

একটু উষ্ণস্বরেই মহাদেব বলিল—না ব'সে থেকে আর কি ক'রবেন চক্রবর্ত্তী মশাই?···তুমি যে ব'লছ একরত্তি মেয়ে—তা যখন যাওয়ার পথে এসেই প'ড়লাম আর চোখের ওপর এই ব্যাপার দেখলাম—তা মড়ার কাছে ঐ একরত্তি মেয়েটাকে এই বনজঙ্গলে বাড়ীতে বাদ্লার রেতে ফেলে আমিই বা কেমন ক'রে যাই বল দিকি?···

—তা বাপু,এখান থেকে একটা হাঁকও ত দিতে পারতিস্?—টিপ্পনী কাটিল রসিক নাপিত।

মহাদেব এবার রাগিয়া উঠিল, বলিল—লাও লাও ঢের হ'য়েছে, আর উপদেশ দিতে হবে না; যে কাজে যাচ্ছ যাও—সব মশাইদেরই চেনা আছে। ঐ মেয়েটা শেষ রাত থেকে কেঁদে বুক ফাটাচ্ছে, কেউ বুঝি

আর ঘরে শুয়ে তা কানে শোনেন নি, না? সবাইকেই আমি চিনি। এই কালীদ'রই মানুষ আমি—চুল পাক্‌লো সব দেখে দেখে।

মহাদেবের হাতের কুড়ুল আবার সবেগে গাছটার দিকে ধাবিত হইল। দেখিতে দেখিতে বাড়ীর উপর মেলা জমিয়া গেল। সবারই মুখে আহা! কৈফিয়ত দিতে দিতে মহাদেব হাঁফাইয়া উঠিল। গাছের গোড়ায় কুঠারের আঘাত অবশ্য সমানভাবেই চলিয়াছে।...অর্দ্ধেকের উপর কাটা হইয়া গিয়াছে। কোপের সঙ্গে সঙ্গে গাছটা থর্ থর্ করিয়া যেন ভয়ে কাঁপিতেছে।

বাঁড়ুয্যে বাড়ীর বড় গিন্নী রাস্তার উপর দিয়া বলিতে বলিতে চলিলেন—একেই বলে অদৃষ্ট, একেই বলে কপাল!...ভাল মানুষ—কাল সন্ধ্যেয় দেখা হ'ল—কথাবার্ত্তা হ'ল—ওমা, রাতটাও পোহাল না? একেবারে শেষ?......বুঝেছ ন'ঠাকুর, একেই বলে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ। বড় ভাল মানুষ ছিল গা! মুখে রাটিও কখনও কেউ শোনে নি। মায়ে ঝিয়ে দিব্যি শান্তিতে ছিল।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কয়েক পা আগাইয়া গিয়া আবার বলিলেন—হাস্‌তে হাস্‌তে মেয়েটার কোলের ওপর মাথা রেখে নারায়ণ মধুসূদনের নাম ক'রতে ক'রতে স্বর্গে চলে গেল। আমাদের পোড়াকপালে এমনটি কি আর হবে গা? আহা, মেয়েটার একটা পথ ক'রে যদি দেখে শুনে যেতে পারত?...মেয়েটার জন্যে ম'রেও বৌটা শান্তি পায়নি—মা হারিয়ে মেয়েটা যেন একেবারে পাগল হ'য়ে উঠেছে...

সমস্ত বাড়ী কাঁপাইয়া আমগাছটা ডোবার কূল ঘেঁসিয়া রাস্তা আট-কাইয়া মড়্ মড়্ শব্দে আছাড় খাইয়া শুইয়া পড়িল। মহাদেব সেদিকে

একবার তাকাইয়া কুড়ুলখানা কাছেই মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়া কপালের ঘাম বাঁহাতের চেটোয় মুছিয়া একটু বিশ্রাম লইতে বসিল। গত রাত্রের সমস্ত বর্ষার জল তাহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার মোটেই হুঁস্ নাই। কালীদহ কাছারীর লেঠেল সর্দ্দার সে—লোকের বিপদে আপদে বুক দিয়া দাঁড়াইবার সৎসাহস তাহার আছে, ইচ্ছায়ই হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক, ইতরভদ্র কেউই এই লোকটিকে ঘাঁটাইতে বড় সাহসী হয় না; বরং হাতে রাখিতেই চেষ্টা করে। তাই তামাক খাইতে খাইতে লম্বা এক সুখটান দিয়া চক্রবর্ত্তী মশাই নিজেই তাহার হুঁকা হইতে কলিকাটা খুলিয়া মাটিতে রাখিয়া বলিলেন—তামাক খেয়ে নে রে ঢালি, বড্ড হাঁফিয়ে গেছিস্ বাবা।···

যে লোকের তামাক না হইলে এক মুহূর্ত্ত চলে না, তাহার বরাতে গতকাল সন্ধ্যা হইতেই তামাক জোটে নাই। যদিও তাহার মন মোটেই ভাল ছিল না, তবু বিনাবাক্যব্যায়ে মহাবুভুক্ষিতের মতই মহাদেব কলিকাটি তুলিয়া লইল এবং দুই করতলের যোগাযোগেই নিঃশব্দে ধূমসেবা করিতে লাগিল।

পর পর কয়েকটি টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া অবশেষে একটি জোর টান দিয়া কলিকাটি সরাইয়া রাখিয়া মহাদেব বলিল,—নাও ঠাকুর, এতে আর কিছু নেই।

সাবিত্রী দাওয়ার উপর মা'য়ের মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিয়া আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতেছিল, তাহার দিকে একবার তাকাইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পরে গাছটার দিকে তাকাইয়া মহাদেব আবার কুড়ুল কাঁধে তুলিয়া লইল এবং উঠিয়া দাঁড়াইল।

গাঁয়ের মাতব্বররা সবাই পূর্ব্বেই আসিয়া জুটিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে দুইজন প্রায়শ্চিত্তের ব্যাবস্থাও দিয়াছেন। হরিশ চাটুয্যেই পুরোবর্ত্তী হইয়া সকল ব্যাবস্থায় তৎপর হইয়াছেন।

কাছে আসিয়া বলিলেন—ওরে মহাদেব, বলি বাবা, উঠোনের জাম গাছটাই কেটে ফেল্‌লি? বাগানে কি গাছের অভাব ছিল রে? আমাদের কাছে একবারটি জিজ্ঞেস ক'রে কুড়ুল ধরতে ত পারতিস্?······যাক্, যা হবার হয়ে গেছে—তার ত আর চারা নেই, এখন একটু হাত চালিয়ে কাঠগুলো ক'রে ফেল।

মহাদেবের মুখে কঠিন জবাবই আসিয়াছিল, কিন্তু নিজকে সে জোর করিয়াই চাপিয়া রাখিল।

চাটুয্যে আপন মনেই বলিতে লাগিলেন—চন্দ্রকান্তর শ্বশুরবাড়ী একবারটি পাঠাতে হবে তার শালাকে ডেকে আন্‌তে—কাকে বা পাঠাই তাই ভাবছি!

কথাটা মহাদেবের এতক্ষণ খেয়াল হয় নাই। সে ভাবিল এই দুঃসময়ে নিজের বলিতে সাবিত্রীর যখন কেউই নাই, তখন তাহার মামাকে খবর দিয়া লইয়া আসা একান্ত প্রয়োজন।

সাবিত্রীর মামার বাড়ী বড়দলের বিলের ওপারে—যাতায়াতে ক্রোশ দুই পথ। অন্য সময়ে হাটাপথ থাকিলেও বর্ষার সময়ে এখন নৌকা বা ডোঙ্গা ভিন্ন যাতায়াতের উপায় নাই।

চাটুয্যের দিকে তাকাইয়া মহাদেব বলিল—সাবিত্রী-মার মামাকে আন্‌তে পাঠান। যা ভাল বুঝ্‌বেন, তাইই করুন, সে বিষয়ে আমি আর কি বলব!···আপনারা দশজনই ত এখন ওর আপনার জন।

চাটুয্যে বিস্ফারিত চোখে জনতার দিকে তাকাইয়া আদেশটি কাহার উপর ঝাড়িবেন চিন্তা করিতেছিলেন। মহাদেব বলিল—যাক্ আপনাকে আর লোক খুঁজতে হবে না, আমার ছেলে এসেছে। এই গণ্শা, এই গণেশ!···

পনের ষোল বছরের একটি হৃষ্টপুষ্ট যুবক কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মহাদেবের বাড়ী এখান হইতে বেশী দূরে নয়, ওপাড়ায়। বোধ হয় চিৎকার কান্নাকাটি শুনিয়া কৌতূহলী হইয়া গণেশ ব্যাপার কি দেখিতে আসিয়াছে।

চাটুয্যে বলিলেন—এ'টি তোরই ছেলে বুঝি? তা বেশ···

মহাদেব সংক্ষেপে 'হাঁ' বলিয়া তাঁহার কথার উত্তর দিয়া ছেলেকে বলিল—কুড়ুল ধর বাবা শীগ্‌গির—মালকোচা মেরে ঝাঁ ঝাঁ ক'রে কাঠগুলো আস্ত আস্ত রেখে কেটে ফেল্।···

তারপর চাটুয্যের দিকে তাকাইয়া বলিল—কলমীডাঙ্গায় পাঠাবার মত লোক যদি নাই পান কর্ত্তা, তা হ'লে না হয় আমিই খবরটা দিয়ে আসি!

চাটুয্যে বলিলেন—তা হ'লে ত ভালই হবে মহাদেব, যাবি আর আসবি কিন্তু—দেখে গেলি ত সব; ডোঙ্গা বা নৌকো না পাস্, লগি মেরে চ'লে যা বাবা—দাঁড়াস্ নি।—তুই এলে কিন্তু···

মহাদেব ছুটিল। গণেশের হাতের কুড়ুলের ঘা আবার সমস্ত বাড়ী কাঁপাইতে লাগিল। চাটুয্যে নিশ্চিন্ত হইয়া মাতব্বরদের মধ্যে গিয়া আবার জুটিলেন।

আট

নদীর কিনারায় শ্মশান।

রোল উঠিল—বল হরি, হরি-বো-ল্…

চিতাবহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। আগুনের লেলিহান শিখা বিধবার সকল কষ্ট সকল দুঃখ দূর করিয়া দিয়া সত্যই যেন এক মহাশান্তি দান করিতেছে।…চিতার উপর নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া আগুনের কাছে এমনি ভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই বোধ হয় হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রনা দূর হইয়া যায়—যে জ্বালার হাত হইতে মানুষ মরিয়াও নিষ্কৃতি পায় না।

শ্মশানযাত্রীর দল একদিকে বসিয়া বিড়ী টানিতেছে ও গল্প চালাইতেছে।…মৃত্যু—এ যেন জীবের অপরিহার্য্য নিয়তি—কাহারও এড়াইবার সাধ্য নাই, শ্মশান-বন্ধুদের নির্ব্বিকার শান্ত ও সরস বাক্যালাপ শুনিলে হঠাৎ তাই বলিয়াই মনে হয়। মরজগতের সারবস্তুটি যেন তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে।

মায়ের মুখাগ্নি সাবিত্রীকেই করিতে হইল। তাহার পদ্মদলের মত আয়ত চোখ দুইটি ফুলিয়া করমচার মত রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। মাথার একরাশ চুল সারাপিঠে নাকে মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। পাগলের মত একা একা খানিকটা দূরে বসিয়া সে মায়ের চিতার দিকে তাকাইয়া

চোখের জল ফেলিতে লাগিল। সমস্ত অন্তর ছাপাইয়া কেবল এই কথাটাই ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হইতে লাগিল—নেই, মা নেই কেউ নেই। চারিদিক হইতে এই কথাটাই তাহার কানে আসিয়া প্রতিধ্বনির মত বাজিতে লাগিল—নেই নেই—ওরে অভাগিনী, তোর মা নেই…।

পূবদিক হইতে নদীর কিনারার গুণটানা সরুপথ বাহিয়া একটি লোক হন্তদন্ত হইয়া ছুটিতে ছুটিতে শ্মশানযাত্রীদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকটির সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া দরদর ধারে ঘাম পড়িতেছে, চোখে জল।

সকলেরই মুখের উপর একবার সজল করুণ-দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া আগন্তুক চিতার দিকে স্থিরনেত্রে তাকাইয়া রহিল । চিতা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে এবং চিতাধূম কুণ্ডলী পাকাইয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে।…চোখ দু'টি তাহার জলে ভরিয়া দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া উঠিল।

প্রথমে কথা বলিলেন চাটুয্যে মশাই। বলিলেন—এতক্ষণে এলে মণিলাল? তোমার যে অনেক আগেই আসা উচিত ছিল বাবা, অবস্থা ত সবই জানছ! দেরী ক'রে ক'রে শেষটায় দিলাম আমরা রওনা। তা, তুমি একা যে? মহাদেব ব্যাটা দীঘির ঘাট থেকেই বাড়ী চলে গেল বুঝি?…আর সে এসেই বা কি ক'রবে?…যা ক'রেছে, তার মত মানুষের পক্ষে যথেষ্ট। যাক্, সময়মত খবরটা দিয়েছিল ত?…

চক্রবর্ত্তী মশাই বলিলেন—ব্যাটা গেঁজেল, দেখ আবার কোন্ গাঁজার আড্ডায় আড্ডায় ব'সে গিয়েছিল কি না, সময় মত খবরটাই হয়ত দেয় নি, সেই কোন্ ভোরে গিয়েছে, আর এখন যে বেলা দুপুর বাবা।

আগন্তুকের নাম মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রীর মামা । মণিলাল

চোখ মুছিয়া বলিল—খবরটা পেতে আমারই দেরী হয়ে গেছ্‌লো চক্রবর্ত্তী কাকা, তার কোনও দোষ নেই। সকালেই একটু কাজে বেরিয়ে পড়েছিলাম, ফিরে এসে সংবাদটা পেলাম বাড়ীতে। যাকে পাঠিয়েছিলেন, সে সবই গিয়ে ব'লে এসেছে আমার স্ত্রীর কাছে। বাড়ী এসেই নৌকো নিয়ে অমনি ছুটেছি।

মণিলাল ধীরে ধীরে সাবিত্রীর নিকট গিয়া দাঁড়াইল। মামার দিকে একবার মুখ উঁচু করিয়া চাহিতেই তাহার ক্রন্দন দ্বিগুণ উচ্ছ্বসিত হইয়া সত্যাই মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিল। মণিলাল পাষাণমূর্ত্তির মত নদীর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল। বলিবার মত কিছুই নাই বলিয়াই বোধ হয় কিছু বলিতে পারিল না।

চিতার আগুন হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাহারই লেলিহান শিখার দিকে তাকাইয়া চাটুয্যে বলিলেন—দেখ চক্রবর্ত্তী, চিতাটা কেমন জ্বলছে! রাঙাবৌর সুকৃতি ছিল ব'লতে হবে। এরকম না জ্বললে কি আর চিতা! কাল সারারাত জল হ'য়েছে, অথচ ভোর থেকে আকাশটা কেমন পরিষ্কার! কিন্তু ভাই রোদটা প'ড়েছে কড়া।

মণিলাল ধীরে ধীরে আসিয়া চাটুয্যের পার্শ্বেই বসিল।

একটা বিড়ী ধরাইয়া চাটুয্যে বলিলেন—কেঁদে আর কি ক'রবি বাবা? নিয়তি—এর হাত এড়াবার সাধ্য কারুরই নেই। ইহসংসারের কাজ ফুরুলেই আসবে তাঁর ডাক, ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই ধড়াচূড়ো সব ফেলে অমনি গিয়ে হাজির হ'তে হবে। এ নিয়মের আর কোনও ব্যাতিক্রম কি হবার জো আছে বাবা? কি বল হে চক্রবর্ত্তী?...বলি আমরা মানুষ—বুঝি না, তাই অবুঝের মত কেঁদে সারা হই, কিন্তু একটু চিন্তা ক'রে দেখ দেখি—

চক্রবর্ত্তী সায় দিয়া বলিলেন—নিশ্চয়ই, সে কথা আর ব'লতে!…

বিড়ীতে শেষটানটা দিয়া চাটুয্যে ফেলিয়া দিলেন এবং দুই হাতে হাটু চাপিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বোধ এই হয় অসার সংসারের অনিত্যতার বিষয়েই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এক মুহূর্ত্ত মাত্র, তারপরই চিন্তাধারায় ছেদ পড়িল।

চাটুয্যের শ্মশান-বৈরাগ্য দূরীভূত হইল।…তাহার নজর গিয়া পড়িল নদীর মাঝখানে। একাগ্রদৃষ্টিতে তিনি চাহিয়া দেখিলেন, শ্মশানের ঠিক সোজাসুজি নদীর মাঝখানে বিশে জেলে বড় একটা ইলিশ মাছ জালে তুলিয়া ফেলিল।

নদীতে বহু জেলে-ডিঙ্গি স্রোতের মুখে ভাসিতে ভাসিতে ছোট ছোট ঢেউয়ের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে মোচার খোলার মত বাঁকের ঐ মোড় পর্য্যন্ত যাইয়া আবার ফিরিয়া কিনারা বাহিয়া আসিতেছে।

চক্রবর্ত্তী কহিলেন—দেখেছ দাদা, বিশের বরাতটা ভাল। কম ক'রে ছ'গণ্ডা পয়সা এখুনি ট্যাঁকে গুঁজবে। বেড়ে ইলিসখানা ফেলেছে দেখ্‌ছি।

একমাত্র মণিলাল ভিন্ন উপস্থিত সকলেই চক্রবর্ত্তীর উক্তি সমর্থন করিল এবং লুব্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, নৌকার খোলের মধ্যে মাছটাকে ফেলিয়া জাল গুটাইয়া লইয়া বিশে ব্যস্তসমস্তে নদীর ওপারে বাজারের ঘাটের দিকে চলিয়াছে।

একটা বিড়ী ধরাইয়া জলন্ত কাঠিটা ফেলিয়া দিয়া একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া চাটুয্যে মণিলালকে বলিলেন—তারপর বাবাজী, যা হবার তা ত হ'য়েই গেল, এখন মেয়েটার একটা পথ ক'রে ফেলে একেবারে নিশ্চিন্ত হও। আমরা, বুঝেছ কিনা, যাই হই না কেন, হাজার হ'লেও তুমি

হ'চ্ছ গিয়ে মাতুল। বলি, মুখে যাই বলি না কেন—মেয়েটার বয়েস ত আর নেহাৎ কম হয়নি। কি বল হে চক্রবর্ত্তী ?···

চক্রবর্ত্তী অন্যমনস্ক ছিল, শেষ কথাটা মাত্র তাহার কানে ঢুকিল। বলিল—তা ত বটেই—তা কি বলছিলে দাদা ?···

—মণিলালকে বলছিলাম, এই, মানে, সাবিত্রীর কথা। বলি, আমরা যত আপনারই হই না কেন, নিজের ব'লতে এখন ওর তুমিই।

—হাঁ, তা ত বটেই।

—তাই ব'লছিলাম—বলিয়া চাটুয্যে স্বর নামাইয়া বলিলেন—বলি, বয়েসটা ত আর কম হয় নি—মুখে যাই বলি না কেন, তবে আমাদের কুলীনের ঘরের মেয়ে, এই যা।—তা বুঝেছ মণিলাল, এই তোমার দিদির, অবিশ্যি ব'লতে নাই এখন, একটু খুঁতখুঁতে অভ্যাস ছিল। অবিশ্যি সেটা যে খুব দোষের তা নয়—তবে কি জান, সম্বন্ধ যে দু'দশটা না এসেছিল তাও নয়, কিন্তু তাঁর পছন্দই হয় না।···ঐ গিয়ে আর কি পুরুষ মানুষ ওপরে থেকে দেখাশোনা না ক'রতে পারলে যা হয় আর কি—তাই। বলি, আমাদের মত গেরস্থ, হাঁড়ি যাদের শিঁকেয়, তাদের কি আর অত বাছাবাছি ক'রলে চলে রে বাবা ?···

চক্রবর্ত্তী কহিলেন—তা যা ব'লেছ দাদা! রাঙ্গাবৌর ধারণা ছিল, মেয়ে সুন্দরী—অনেকে টাকার লোভ ছেড়ে সুন্দরী মেয়েও ত খোঁজে, তাই; তবে যা দিনকাল প'ড়েছে, সেরকমটি মেলে কই বল দেখি ?··

চাটুয্যে একটু উষ্ণ হইয়াই বলিলেন—সে সব দিনকাল কি আর আছে রে বাবা ?···এই দেখ বাপু, কালের পরিবর্ত্তনটা আমার ওপর দিয়েই দেখ! প্রথম যখন বিয়ে ক'রলাম ঐ স্ত্রীকোলে তখন ত আমার

অদৃষ্টের পাঁচালী

বয়েস আঠার, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের মতই চেহারা আমার। তবুও মেয়েপক্ষকে নগদ ৩০১৲ গুণে দেওয়ার পর তবে সাতপাক হ'ল।... দ্বিতীয়বার যখন বিয়ে ক'রলাম, তখন ত চল্লিশের কোঠায়, কিন্তু ভাগ্যি ভাল, একটি পয়সাও নগদা দিতে হ'ল না। দু'টিকে পার ক'রে যখন পঞ্চাশের মাথায় আবার মাথায় টোপর পরলাম তখন খরচ ব'লে পঞ্চাশটি টাকা গুণে দিতে এরা দিশে পেলো না। রাম গঙ্গা, সেদিন কি আর আছে রে বাবা? কলি কলি, ঘোর-কলি।

অতীতের প্রভাব মানুষের মনে বর্ত্তমানের তুলনায় ঢের বেশী। অতীত মানুষের কাছে বর্ত্তমানের চেয়ে ঢের বেশী মূল্যবান। তাই অতীতের মাধুর্য্য বর্ণনা করিতে, অতীতের কথা বলিতে মানুষ এতদূর উৎসাহিত হইয়া উঠে।

চক্রবর্ত্তী মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন—বুঝেছ দাদা, মেয়ে হওয়া মানেই পরের ঘরে হ্যাণ্ড্‌নোট দেওয়া।

বাঁশের আগা দিয়া ভস্মপ্রায় চিতা নাড়িয়া দিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে সেজকর্ত্তা বলিলেন—এবার চতুর্থপক্ষে চাটুয্যে দাদা আমাদের রাজকন্যে আর অর্দ্ধেক রাজত্ব সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবেন, বুঝেছেন চক্রবর্ত্তী মশাই?

হাসির হর্‌রা ছুটিয়া গেল। সাবিত্রী নদীর দিকে মুখ করিয়া বসিয়া ছিল। হাসির শব্দে সচকিতা হইয়া মুখ ফিরাইয়া ইহাদের একবার দেখিয়া লইয়া আবার মুখ ফিরাইয়া লইল।

হাসিতে যোগ দেয় নাই শুধু মণিলাল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে একটি কথাও বলে নাই। এইবার কাঁদ কাঁদ স্বরে চাটুয্যেকে বলিল—বুড়ো

মশাই, অবস্থা ত সবই বুঝতে পারছেন! দিদি ত চ'লে গেলেন।···আপনারা দয়া ক'রে মেয়েটার একটা পথ ক'রে দিন···এখানে আপনাদের নামকরা ব্রাহ্মণ সমাজ, আপনারা একটু চেষ্টা ক'রলেই পারবেন একটা পাত্র জুটিয়ে দিতে।

চাটুয্যে কি বলিতে যাইতেছিল, ঠিক এই সময়ে ওদিকে হইতে গণেশ আসিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া পড়িল।

গণেশ মহাদেব ঢালির ছেলে। পিতার হুকুমে সে একাই সেই আমগাছটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়াছে এবং চাটুয্যের অনুরোধে কয়েক ঘণ্টা আগে সেগুলিকে মাথায় করিয়া আনিয়া কয়েকবারে এই শ্মশান ঘাটে ফেলিয়া গিয়াছে।

সকলেরই বিস্মিত দৃষ্টি তাহার উপরে পড়িল। গণেশ কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল—ঠাকুরদা, আপনি আমার বাবাকে বাঁচান।···

সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল—হ'ল কি তোর বাপের?···ব্যাপারটা কি?···কোনো অসুখ বিসুখ?···

কাঁদিতে কাঁদিতে গণেশ বলিল—সেই সকালে আমার হাতে কুড়ুল দিয়ে ভিন্ গাঁয়ে যাবে ব'লে মাঠাকরুণদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল, তারপর রাস্তা থেকে থানার সেপাইরা তাকে বেঁধে নিয়ে গেছে।

—কেন রে? তাকে থানা থেকে ধ'রলে কেন?···

—এইখেনে কাঠ ফেলে একটু জিরিয়ে বাড়ী গিয়েই দেখি, ঘরে বাইরে একপাল সেপাই। বাবা বাড়ী নেই। ঘরের জিনিষ পত্তর ফেলে ভেঙে সেপাইরা তচ্‌নচ্‌ ক'রছে/মা দাওয়ায় ব'সে কাঁদছে।

—বটে ?—কেন রে ? ব্যাপার কি বল্ দিকি ?—তোর বাপ ক'রেছিল কি ?—চাটুয্যে বলিলেন।

কেহই লক্ষ্য করিল না—সাবিত্রীর চোখের জল মুহূর্তে উবিয়া গিয়া তাহার মুখখানা একেবারেই ফ্যাকাশে হইয়া উঠিয়াছে। ভীতচকিতা হরিণীর মতই সে গণেশের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

—আমায় দেখেই ত ছোটদারোগাবাবু এগিয়ে এলেন, ব'ললেন—এই যে ব্যাটা বাড়ী এসেছে! তোর নাম ত গণ্শা ? আমি বললাম, হ্যাঁ হুজুর। তিনি ব'ললেন, কোত্থেকে এলি এখন বল্ ব্যাটা ? টাকা পয়সা কোথায় সরিয়ে রেখে এলি ?···কিসের টাকা পয়সা হুজুর ? আমি ত কিছু জানি না—আমি ত শ্মশানে কাঠ ব'য়ে দিয়ে আস্‌ছি, আমি ত টাকার কথা কিচ্ছু জানি না, ব'লে কেঁদে ফেললাম। দারোগাবাবু আমায় ধমকে বললেন, ন্যাকা সাজবি ত চাবকে পিঠের চামড়া এখুনি তুলে নেব—তোর বাপ মানুষ খুন ক'রেছে তা জানিস্ ?···আমি ব'ললাম, এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি হুজুর, আমি কিছুই জানি নে। দারোগাবাবু রেগে ব'ললেন, তোর বাবা কাল রাত্রে ঐ দীঘির ঘাটে জমিদারের বজরায় ডাকাতি করে বন্দুক আর টাকা নিয়ে এসেছে, সে সব কোথায় রেখেছে, বল্ হারামজাদা !···আর আজ সকালে কাছারীর নায়েবের মাথায় লাঠি মেরে তাকে খুন ক'রেছে। এটা কি মগের মুলুক পেয়েছিস ?··· —আমি কাঁদতে কাঁদতে পড়ে গেলাম। দারোগাবাবুর পা জড়িয়ে ধ'রে বললাম, হুজুর, আমার বাবাকে বাঁচান, আমি কিছু জানি না। আপনার পায়ে পড়ি, আমি কিচ্ছু জানি নে।······দারোগাবাবু আমায় খুব করে ধমকালেন, লাথি মেরে ফেলে দিলেন,

ব'ললেন, চল্ ব্যাটা থানায়, জানিস্ কি না জানিস্ তখন দেখবি!...তোর মা জানে না, তুই জানিস্ না—তোর বাপ ত মহাসাধু। চল্ শালা থানায়।...সেপাইরা, ঠাকুরদা, আমাকেও মারতে মারতে গাল দিতে দিতে থানায় নিয়ে গেছল।...

চাটুয্যে বলিলেন—তারপর ?...

গণেশ কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল, বলিল—থানায় নিয়ে ঠাকুরদা, আমাকে ত খুব করে এক চোট মারলে, চড় কিল লাথি...কেবলই বন্দুক আর টাকার কথা। বাবাকে কি মারাই মেরেছে ঠাকুরদা! ঐ পাহাড়ের মত মানুষ, সেপাইরা মিলে মেরে একেবারে শুইয়ে ফেলেছে।... সেখানে নায়েব মশাইকেও দেখ্‌লাম, তেনার মাথায় তুলো ন্যাকড়া জড়ান, রক্ত পড়ছে মাথা বেয়ে, শুয়ে আছেন। বাবা তাঁকেও নাকি আজ সকালে কলমীডাঙ্গা থেকে ঘুরে এসে লাঠি মেরেছেন।...

গণেশ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সাবিত্রী সমস্ত শুনিয়া মুখে আঁচল দিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার অন্তরের ব্যথা একমাত্র অন্তর্য্যামী ভিন্ন কেহই বুঝিল না। মুখ ঢাকিয়া সে বোধ হয় সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর বুকে কি ভাবে মুখ লুকান যায়—তাহাই ভাবিতে লাগিল।...হায়, মহাদেব ঢালি ডাকাত...এত বড় অপবাদের বিপক্ষে সাক্ষী উপরে ভগবান এবং নীচেয় সে ভিন্ন আর কে আছে?......রাগের বশবর্ত্তী হইয়া শেষটায় মহাদেব হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া নায়েবকে খুন করিয়াই বসিল?...এ কি করিল সে?...এখন উপায়?...সমস্ত কথা জানাজানি হইয়া শেষটায় কি তাহাকেও থানায় গিয়া দাঁড়াইতে হইবে?...

সাবিত্রী মুখ তুলিয়া মা'য়ের চিতার দিকে তাকাইল, ভাবিল, মায়ের

চিতার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মায়ের কোলের মধ্যেই মাথা গুঁজিয়া তাহার সকল দুঃখ-যন্ত্রণার অবসান করিবে।······একমাত্র তাহারই জন্য স্বার্থলেশহীন উন্নত-হৃদয় মহাদেব কাল রাত্রে দীঘির ঘাটে কত বড় বিপদের মধ্যেই নিজেকে নিক্ষেপ করিয়াছিল,—আর আজ······সাবিত্রীর চোখের সম্মুখ হইতে দুনিয়া যেন সরিয়া যাইতে লাগিল। তাহার মুখ দিয়া আকুলভাবে শুধু উচ্চারিত হইল—ঠাকুর!···

চক্রবর্ত্তী ব্যাপারটা যেন বেশ উপভোগ করিলেন। বলিলেন—বলি ও চাটুয্যে দাদা, বলি শুনছ কি রকম?······এ যে ভানুমতীর ভেল্কী লেগে গেল দেখছি···। মহাদেবটা আর যাই হোক্—লোক ভাল বলে ত জানতাম, তার আবার এ সব—

চাটুয্যে বলিলেন—শোন তোমরাই বাপু—তোমরাই শোন! ও সব আমোদের বহু আগেই শোনা হ'য়ে আছে। বলি, ডাকাতি করবি কর, শেষকালে কিনা হানা দিলি গিয়ে মনিবের বজরাতেই? কলি—কলি—ঘোর কলি!······ব্যাটা চিরদিন যাদের নিমক খেলি, তাদের সর্ব্বনাশ করতে হয় এমনি ক'রে? নাও, ঠ্যালা সামলাও এইবার!···

সেজকর্ত্তা বলিলেন—তা ডাকাতি ক'রেছে কাল রাত্রে, বেশ ক'রেছে, তা আজ আবার এ বাড়ীর আমগাছ ফেলে গিয়ে নায়েবের মাথায় লাঠি হাঁক্‌ড়েছে কেন?···গাঁজার মাত্রা কি খুব বেশী চড়িয়েছিল বুঝি?

গণেশ বলিল—বাবা ডাকাতি করে নি দাদাঠাকুর, ঐ নায়েব মশাই ষড় ক'রে জমিদার-বাবুকে বুঝিয়ে সেপাই লেলিয়ে দিয়েছিল বাবাকে ধরতে—তাই বাবা রাগ সামলাতে না পেরে রাস্তায় পেয়েই লাঠির এক ঘা কষিয়ে দিয়েছে শুনলাম। বাবা ডাকাতি করেনি···

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—করেনি ভাল কথা—থানায় গিয়ে আর একবার ব'লে আয় গে যা—আর আদালতে গিয়ে বলিস্। আমাদের কাছে ব'লে কি ফল হবে? কি বল হে চৌধুরী?···

চৌধুরী বলিলেন—তা ডাকাতিটা হ'ল কোথায়? তোর বাপ কি বলল, তাই বল্!······নতুন জমিদার এই মহালে এসে প্রথমেই খেল ডাকাতের খোঁচা—? রাম গঙ্গা!······তোর বাপ কি ব'ললে আগে তাই বল্! সে ত শেষরাত্তিরে তোমার দিদির বাড়ী কান্না শুনে এসে জুটেছিল, বুঝেছ মণিলাল?······আর ও জমিদারটাই বা নদী ছেড়ে বিলে মরতে গিয়েছিল কি ক'রতে?···

গণেশ বলিল—কাল সাঁঝের আগে জমিদার বাবুর বজরা বিল দিয়ে এসে দীঘির ঘাটে বেঁধে ছিল। রাত দুপুরে নাকি সেখানে ডাকাত পড়ে। বাবা ডাকাতির কথা কিছুই জানে না ঠাকুরদা। সেপাইরা বাবার সঙ্গে একটা কথাও আমায় বলতে দিলে না ঠাকুরদা।

চাটুয্যে বলিলেন—নে বাপু, এখন বাড়ী যা—পরে যা হয় শুনব'খন। শ্মশানে দাঁড়িয়ে এভাবে আর মড়াকান্না না কেঁদে দেখ্ গিয়ে তোর বাপ কি এনে টেনে তোর মার কাছে রেখে গেছে। খোঁজ খবর নিয়ে টিয়ে সামাল কর গিয়ে যা!······বোধ হয় ভালমতই ঘা দিয়েছে!···কি বল হে চৌধুরী?···

সাবিত্রীর বুকের ভিতর জলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতে লাগিল। দেবতা বোধ হয় অন্ধ, নির্ব্বাক, অবিবেচক—নইলে অন্যায় করিয়াও মানুষ কেমন করিয়া জয়ের টিকা ললাটে পরে, আর নিঃস্বার্থ যে লোকটি পরের জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত—তাহার অদৃষ্টে ভাগ্যের এত বড়

বিড়ম্বনা—এত বড় দুর্ভোগ কেন হইবে······এই কথাটা কোনমতেই সে বুঝিতে পারিল না। আকুল ক্রন্দনে তাহার সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া শুধু এই কথাটাই ব্যাকুল হইয়া জাগিয়া উঠিল···মহাদেব, লোকে না জানুক, ঈশ্বর না জানুন, আমি জানি—তুমি স্বর্গের দেবতা। এই হতভাগিনীকে বাঁচাতে গিয়ে আজ কত বড় দুঃখের বোঝা, কত বড় অপবাদের পসরা তুমি মাথা পেতে নিলে!···

নিরুপায় গণেশ চোখ মুছিতে মুছিতে প্রস্থান করিল। চিতার আগুনও প্রায় নিভিয়া আসিয়াছে। সেদিকে একবার তাকাইয়া চাটুয্যে বলিলেন—বুঝেছ চক্করবর্ত্তী—এই মহাদেব ব্যাটা যাকে বলে পয়লা নম্বরের গেঁজেল—গুণ্ডা—ডাকাত—বদমাস্।······কাছারীর লেঠেল-সর্দ্দার হ'য়ে ব্যাটা ধরাকে শরা জ্ঞান ক'রত। মর্ ব্যাটা এখন!······পাপ্ ক'রে ক'রে আর কতদিন চালাবি সোনার চাঁদ?······বাবা, এর নাম ধর্ম্মের রাজত্ব। ধর্ম্মের ঢাক—ও ঠিক সময়মত বাজ্‌বেই।···এ ডাকাতির টাকাটা আর ভোগ ক'রে যেতে হ'ল না বাছাধনের—একেবারে শ্রী—ঘ—র ···

চাটুয্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সকলেই এক এক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—সুখবরটাও শুনলে ত দাদা? নায়েব রসিক গড়গড়িও কুপোকাত!···সে ব্যাটারও নাকি মাথা কাটিয়েছে মহাদেব ব্যাটা!···বাপধনের আর শীগ্‌গির যেন শয্যে ছেড়ে উঠতে না হয়—এই শ্মশানকালীর তলায় দাঁড়িয়ে বলছি।

চৌধুরী হাসিতে হাসিতে কহিলেন—যা ব'লেছেন চক্রবর্ত্তী মশাই—এ যেন সেই ঘটোৎকচের কুরুকুল চেপে চিৎপাত হ'য়ে পড়ার মত।

ব্যাটা ডাকাতিও ক'রল, আবার মানুষ খুনও করল? বাপ!......কিন্তু সাবিত্রীদের বাড়ী এসে দিব্যি ভাল মানুষটির মত আমগাছ কাটছিল, আবার কলমীডাঙ্গায় যখন গেল মনিলালদের বাড়ী, তখনও কিন্তু দিব্যি ভাল মানুষটির মত।...

চক্রবর্ত্তী কহিলেন—দেয় এখন বাছাধনকে দশটি বচ্ছর ঠেলে, তবে না শরীর ঠাণ্ডা হয়! ব্যাটারা এ গাঁ'টাকে যেন একেবারে মগের মুলুক ক'রে তুলেছিল!......যেমন গড়গড়ি, তেমনি ঢালি! যেমন নায়েব তেমনি পেয়াদা—আর তেমনিই শালার জমিদার! ব্যাটারা অভাব বুঝবে না, —অজন্মা বুঝবে না, সময় বুঝবে না, অসময় বুঝবে না, খালি টাকা—লেআও রূপেয়া। জমিদারীর খাজনা না ব্যাটাদের গুষ্টির শ্রাদ্ধ!—মরুক শালারা!...

চাটুয্যে কহিলেন—তা ত গেল। বলি, নতুন জমিদার, ওর নাম কি ছাই মনেও থাকে না, তাই ব'লছিলাম যে, এখন থেকে ওর সঙ্গে একটু ভাবসাব রাখলে হয় না? চাকরী বাকরী ত করিনা—সম্বল ঐ ক্ষেত কামারটুকু। আর বছর ত ধেনোমাঠ কলা দেখিয়েছে জল না পেয়ে, আর এবার ত জলে হাবুডুবু খেয়ে কলা উঁচিয়ে আছে এখন দেখালেই হয়। এ যে একেবারে শুকিয়ে মারবার ব্যবস্থা ক'রে আনছে বাবা।

সেজকর্ত্তা বলিলেন—এ জমিদারের বুঝি কাছারীর বাঁধান ঘাট ভাল লাগল না? তাই মরতে গিয়েছিল বিলের ভেতর?...টাকা গেছে, বন্দুক গেছে, বেশ হয়েছে—উৎপাতের ধন চিৎপাতে গেছে।

চাটুয্যে বিরক্তভাবে কহিলেন—নাও বাপু, ঢের হ'য়েছে এখন শেষ

কাজটুকু শেষ ক'রে বাড়ীমুখো চল—চিতে যে একেবারেই নিভ্‌লো। লাখ লাখ আছে, কিছু না হয় গেছে—ওতে ওসব জমিদারের কি হ'য়ে থাকে! '……নাও, চক্রবর্ত্তী একটু হাত চালিয়ে নাও···বাবা মণিলাল, কলসীটা তুমিই আগে ডুবিয়ে আনো।

মহাদেবের শোচনীয় পরিণামের কথা শুনিয়া অবধি সাবিত্রীর সমস্ত চেতনা লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। অতি কষ্টে নিজেকে সে সংযত রাখিয়া মায়ের চিতার উপর কলসী উপুড় করিয়া জল ঢালিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখ হইতেও কয়েক ফোঁটা জল চিতার উপরে পড়িল।

সব শেষ হইয়া গেল।

ধ্বনিত হইল—বল হরি—হরি—বো—ল্‌·········

নদীর ভিতর দিয়া একটা মাঝি তখন ভাটির টানে নৌকা ভাসাইয়া আপন মনে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—

"মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে ভাই—
আমি আর বাইতে পারলাম না।"

নয়

নদীর পার্শ্বেই শ্রীনগরের জমিদার রায়বাবুদের কালীদহ কাছারী। কাছারী বাড়ীটা ছোট, দ্বিতল পাকাবাড়ী। একতলায় পাশাপাশি দুইখানা ঘরে কছারী বসে, আমীন ও আমলারা দপ্তর লইয়া কাজকর্ম্ম করে। পশ্চিমদিকে একখানি লম্বা টিনের ঘর, সেখানে পাইক বরকন্দাজরা থাকে। দ্বিতলের ঘর দুইখানি বছরের অধিকাংশ সময়ই তালা বন্ধ থাকে। স্বয়ং জমিদার বাবু বা তাঁহাদের কোন আত্মীয় স্বজন কখনো কেহ বেড়াইতে আসিলে তাঁহারা অধিকার করেন।

কাছারীর বাঁধান ঘাটে অনেকদিন বাদে গতকাল আবার বজরা আসিয়া ভিড়িয়াছে এবং পরশু রাত্রে হীরাদীঘির ঘাটের সেই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা অর্থাৎ ডাকাতির ব্যাপারের জন্য কাছারী বাড়ীটি পাইক বরকন্দাজদের হাঁকডাকে গম্ গম্ করিতেছে। থানা হইতে দুইজন সেপাইও মোতায়েন হইয়াছে। অনেকদিন বাদে কাছারী বাড়ীর দ্বিতলে কাল হইতে আবার আলো দেখা দিয়াছে।

রাত্রি প্রায় এগারটা। আকাশে মেঘের ফাঁকে ময়লা এক ফালি চাঁদও দেখা দিয়াছে। নদীর স্রোতের একটানা ভয়াল কল্লোল ভাসিয়া আসিতেছে।

দ্বিতলের ঘর দুইখানির সংলগ্ন ঝুল-বারান্দা। ঝুল বারান্দার উপর বেতের সোফায় অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় জমিদার শোভেন্দ্র নারায়ণ রায়।

তাহার হাতের কাছেই একটি টিপয়—তাহার উপরে একটি হুইস্কির বোতল ও পাশাপাশি দুইটি ছোট বিলাতী গ্লাস্। শোভেন্দ্রের সম্মুখে আর একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক।

লোকটির বয়স অনুমান পঁয়ত্রিশ, একহারা চেহারা। গায়ের রং গৌর, ঈষৎ বেঁটে। মুখে অসংখ্য ব্রণের দাগ, ভাল করিয়া একটু লক্ষ্য করিলেই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির বলিয়া মনে হয়।

অদূরে হুকুমের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান খাসকামরার ভৃত্য মধুসূদন। মধু একদৃষ্টে নদীর দিকে তাকাইয়া আছে, যেন কি দেখিতেছে বা অন্যমনস্ক-ভাবে কি চিন্তা করিতেছে; কিন্তু তাহার মন রহিয়াছে এ দিকে—কর্ণেন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণ সজাগ এবং এদিকেই নিবদ্ধ রাখিয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

অনেকক্ষণ বাদে কথা বলিল শোভেন্দ্র।

—কি শশী, এত কি ভাবছ? এ ত অতি তুচ্ছ কাজ তোমার কাছে, অন্ততঃ আমার ত তাই-ই ধারণা ছিল।···বড় বড় সাগর পেরিয়ে এসে এখন নদী দেখেই ঘাবড়ে গেলে?···আশ্চর্য্য বটে!···

আগন্তুকের নাম শশী। বলিল—আমি কিন্তু ততটা সোজা ব'লে ভাবতে পারছি না। আপনি যতটা সোজা মনে ক'রছেন, মানে···

পাতলা অন্ধকারে শশী লক্ষ্য করিল না, শোভেন্দ্রের মুখখানা হঠাৎ অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু সে ভাব মুখে না প্রকাশ করিয়া শোভেন্দ্র সোজা হইয়া বসিল, ডাকিল—মধু!···

চির-অভ্যাসমত মধু ছুটিয়া আসিয়া সম্মুখের দিকে ঝাঁকিয়া দাঁড়াইল। ইঙ্গিতে শোভেন্দ্র তাহাকে হুইস্কির বোতল দেখাইয়া দিল।

কর্ক খুলিয়া মধু দুইটি গ্লাসেই মদ ঢালিল এবং একটি গ্লাস প্রভুর সম্মুখে ধরিল। মধুর হাত হইতে গ্লাসটি লইয়া শোভেন্দ্র হাত বাড়াইয়া শশীর হাতে দিল এবং অপর গ্লাসটি তুলিয়া লইয়া চুমুক দিল।

গ্লাস দুইটি নিঃশেষ করিয়া সরাইয়া রাখিয়া মুখ মুছিয়া দুইজনেই যেন নূতন জীবন লাভ করিল। মধু সিগারকেস্ খুলিয়া সম্মুখে ধরিল এবং দুইজনেই একটি করিয়া তুলিয়া লইল। তারপর দিয়াশলাই'এর কাঠি জ্বালিয়া সিগারেট দু'টী ধরাইয়া দিয়া মধু তাহার উপস্থিত কর্ত্তব্য শেষ করিয়া আবার সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

এক গাল ধোঁয়া ছাড়িয়া একটু কাশিয়া শোভেন্দ্র বলিল—শোন শশী, আর একটু এগিয়ে নিয়ে এস চেয়ারটা এদিকে। তোমাকে ত সবই খুলে ব'ললাম। তোমার ঘাবড়াবার মত কিছুই নেই এর ভেতর। জান ত, আমি সোজাসুর্জি কথাই পছন্দ করি—দু'কথার মানুষ আমি নই। শুধু আমি নয় —আমার জমিদারীও রইল তোমার পেছনে।

শশী বলিল—তা ত আমি অস্বীকার করছি না—কিন্তু বড্ড risky, এই যা,—বিয়ে ব'লে কথা······

—কথার ত কিছুই নেই এর ভেতর—তুমি কি নতুন হ'চ্ছ, না—সাধলে মান বাড়ে? তোমার দরকারটাই দরকার আর আমার দরকার দরকার নয়—কেমন?······জাল, জুয়া, জোচ্চুরি—স্ত্রীলোক ফুস্‌লিয়ে বার করা—এর কোনটাতে তুমি যে নতুন—তা ত আমি জানিনা। আর ন্যাকা সাজ্‌ছ কি না এই বেলায়?—আর বিপদে প'ড়লেই বাঁচাও ভাই, অভাব প'ড়লেই খাওয়াও ভাই—এই ত তোমার মতলব?···সময়ে অসময়ে একটু কাজ পাই বটে তোমার দ্বারা—কিন্তু কি পরিমাণে

টাকাটা তোমার পাল্লায় প'ড়ে ঢেলেছি, বা এখনও ঢালছি—সে অঙ্ক কোনদিন একটু ভেবে দেখেছ ?···

—আমি কি তা অস্বীকার ক'রছি ?—সে কথা ব'লে আর কেন লজ্জা দিচ্ছেন ?···যথেষ্ট উপকার আপনি···

—দেখ শশী, সত্যিই ব'লছি—ঐ চাটু বচনগুলো শুনলে আমার গা একেবারে জ্বালা ক'রে ওঠে। মদের ঝোঁকে দু'চারটে মিষ্টি বুলি শুনবার লোভে তোমাকে এখানে আর্জেন্ট্ টেলিগ্রাম ক'রে আনি নি। মদ আমি খাই বটে—কিন্তু মাতলামী করার জন্যে নয়; দেখ্‌ছ ত—আমার মাপা গ্লাস্। যাই হোক, তোমার ওপর সত্যিকার জোর আছে কিনা জানিনা, তবে মনে ক'রে দেখো—বাবা বেঁচে থাকতেই দমদমায় যখন চেক্ জালিয়াতীর কেসে ধরা পড়, তখন বাবাকে গোপন ক'রে এক কাড়ি টাকা ঢেলে তোমায় তখন বাঁচিয়েছিল এই শোভেন রায়। আর তখন আমার কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলে—যখন যা ব'লব, জীবন দিয়েও তা ক'রতে দ্বিধা ক'রবে না, মনে আছে বোধ হয় ? তারপরও লম্বা লোভ দেখিয়ে বেলঘ'রের বাগানে সেই মেয়েটার ব্যাপারে আমায় কি ভাবেই না জড়ালে ?···তাতেও পুলিশ হাঙ্গামায় বহু টাকা আমায় ব্যয় করিয়ে ছাড়লে। তারপর যখন যা দরকার—মুখ কাঁচুমাচু ক'রে হাত পাতছ—না বলিনি। আর আজ আমার একটা বড় দরকার—এতে যে তুমি আমায় সাহায্য ক'রবে না—এত আমার জানাই ছিল।

শশী জোর করিয়া সমস্ত দ্বিধা এড়াইয়া অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া বলিল—আচ্ছা আচ্ছা বলুন, ভাল ক'রে শুনি আর একবার।

অব্যর্থ লক্ষ্যে বাণ ছোঁড়া হইয়াছে, আর যায় কোথায় ?—ইহা

বুঝিয়াই শোভেন্দ্র সহজকণ্ঠে বলিল—সহরের ওপরে কত কি ক'রে এলাম —আর এ ত পাড়াগাঁ, বিশেষ আমারই জমিদারী—লোকে এখানে আমার নামেই চম্‌কে ওঠে, জান বোধ হয় ?

শশী উৎসাহিত হইয়া বলিল—বিলক্ষণ জানি।

শোভেন্দ্র বলিল—দেখ শশী, যে শিকার আমার হাতছাড়া হ'য়েছে —সে শিকার আমার আবার চাই, তাতে বরাতে যাই থাকুক না কেন। কিন্তু প্রোগ্রাম্ বদ্‌লাতে হ'ল। সেইটেই তোমায় ব'লছি।

—বলুন!

—মহাদেব ব্যাটার কথা ত তোমায় সবই ব'লেছি। ব্যাটা আমার খেয়ে আমারই বুকের ওপর চেপে দাড়ি উপড়াতে চায়—কি সাহস! ব্যাটা কালই সদরে চালান হ'য়ে গেছে, অন্তরায় ছিল একমাত্র সেটি। পাঁচ বচ্ছর ত বটেই—দশ বচ্ছরও জেল হ'তে পারে কারণ নায়েবটাকে মেরেছে আবার লাঠি। দুটো চার্জ্জে ব্যাটাকে ফেলা গেছে। নায়েবটা হাতে পায়ে ধ'রে কেঁদে পড়ায় তাকে আমি ক্ষমা ক'রেছিলাম, কিন্তু অদৃষ্ট দেখ, মহাদেবের হাত থেকে সে রেহাই পেল না? সে ব্যাটা যখনই বুঝল যে, নায়েব আমার পক্ষ নিয়েছে আর আমারই হুকুমে থানা থেকে পুলিশ নিয়ে ডাকাতির চার্জ্জে তাকে ধরতে গেছে, তখনই চালিয়েছে লাঠি। পুলিশ কাছাকাছি না থাকলে বোধ হয় মেরেই ফেলে দিত নায়েবটাকে। কাছারীর উপযুক্ত পাইকই বটে—বাবা বেছে গুছে আচ্ছা লোককেই এ-কাছারীর সর্দ্দার-লেঠেলের কাজে রেখে গিয়েছিলেন।···শোভেন্দ্র একটু হাসিল।

শশী বলিল—নায়েবের খবর কি এখন?

—কি আর খবর? তাকেও সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলাম।

অবশ্য পুলিশ থেকেই ব্যবস্থা ক'রে পাঠিয়েছে। যাই হোক্, এখন ঘটনা-চক্রটা দেখ। নায়েবের মুখে কেবল সকালে যেই শুনলাম যে, মেয়েটার মা দিয়েছে গলায় দড়ি, অমনি তোমায় বলব কি ভাই, আমার বড্ড ভয় হ'ল। কি করি তখন? গড়গড়ির সঙ্গে পরামর্শ ক'রে চটু করে চ'লে গেলাম থানায়—গিয়েই ডাকাতী কেস্ লিখিয়ে দিলাম র‍্যাটার নামে। পাছে ও-পক্ষ থেকে কোনও হাঙ্গামা হয় এইটেই ছিল ভয়, কিন্তু 'টু' শব্দটিও হ'ল না। এমন কি, আশ্চর্য্য! গলায় দড়ি দেওয়ার খবরটা পর্য্যন্ত আসেনি থানায়" বা কেউই জানেনা। কি যে হ'ল, কিচ্ছু বুঝতেই পারলাম না। মেয়েটাকে ঘর থেকে যে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে আসা হয়েছিল, তা পর্য্যন্ত একেবারে চাপা পড়ে গেছে। পুলিশের মার খেয়ে মহাদেবটার মুখে রক্ত উঠেছে, কিন্তু মেয়েটার নামও মুখে আনেনি; যার জন্যে আজ ওর এই দুর্দ্দশা, মেয়েটাও ধন্য বটে। আশ্চর্য্য!

শশী বিজ্ঞের মত বলিল—বুঝ্ছেন না? এসব কথা কি প্রাণ থাকতে মানুষ মানুষকে জানাতে চায়?……থুতু ওপর দিকে ছুঁড়লে নিজের গায়েই যে এসে পড়ে!…সমাজ আছে না? আরও বামুনের মেয়ে বিশেষ এই পাড়াগাঁয়ের।

শোভেন্দ্র বলিল—মেয়েটার মা যে এভাবে 'সুইসাইড্' ক'রবে স্বপ্নেও ভাবিনি। মোধোর মারফৎ এই দু'দিনে তন্ন তন্ন ক'রে সব খবর নিয়েছি। মেয়েটার এক মামা এসেছে, আর বলতে গেলে, তিন কুলে এখন মেয়েটার নাকি কেউই নেই। এখন মামাটার মতলব কোনমতে সাতপাক ঘুরিয়ে বিদেয় করা!…এখানে দাঁড়িয়ে ওপারে ঐ শ্মশানটা দেখা যায়, কাল দুপুরে অনেকক্ষন পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, শবদাহ হ'চ্ছে। মনটা একটু

খারাপই হ'ল। বাস্তবিক আমারই খেয়ালের জন্যে ত এ accident-টা হ'ল। কিন্তু ভাই, হাতের ভেতর পেয়ে ঐ শূয়ার-কা-বাচ্চার জন্যে মেয়েটাকে হাতছাড়া ক'রতে হল, এ আক্রোশ আমার মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। তাকে আমার চাই-ই।···

শশী মনে মনে একটু হাসিল।

শোভেন্দ্র বলিল—তোমায় বলব কি শশী, গোবরে পদ্ম ফুট্‌তে কেউ কোনদিন দেখেছে কিনা জানিনা, কিন্তু একেই বোধ হয় বলে গোবরে পদ্ম।···আমার চোখের ওপর ঠিক যেন নেশার মত লেগে আছে।

শোভেন্দ্র হঠাৎ স্বর নামাইয়া বলিল—তুমি ত ভাই জান আমার কথা।······আর কেউ না জানুক, তুমি ত জান, আমার স্ত্রীও 'সুইসাইড্' ক'রেছিল আফিম খেয়েই, শুধু আমারই জন্যে, দুঃখে-অভিমানে। ব'লতে গেলে আমার এই উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রই দায়ী তার মৃত্যুর জন্যে।······দিনের পর দিন পায়ে ধরে কেঁদেছে, কতভাবে আমায় শোধরাতে, আমাকে ফেরাতে চেষ্টা ক'রেছে কিন্তু তার দিকে কোনদিন ফিরেও তাকাই নি। বাবা থাক্‌তেন শ্রীনগরে আর এই কল্‌কাতাতে আমি রাতের পর রাত কিই না ক'রেছি, কি ক'রেই না কাটিয়েছি? সে আমায় ছেড়েগেছে; তাও আজ প্রায় তিন বছর হল। সবই যেন স্বপ্নের মত মনে হয়।—ওঃ!

—মধু! শোভেন্দ্র ডাকিল।

—ঢাল্ আর একটু ক'রে। মধু যথাকর্ত্তব্য সমাপন করিয়া আবার গিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

শোভেন্দ্র শশীকে একটি গ্লাস্ নিতে ইসারা করিয়া নিজে এক চুমুকে খানিকটা খাইয়া মুখে একটি শব্দ করিয়া গ্লাস্‌টা সরাইয়া রাখিয়া বলিল···

মা ত বহুকাল স্বর্গে, স্ত্রী গেছে, বাবাও চলে গেলেন। ভগবানের কি ইচ্ছে জানিনা শশী, বোধ হয় এমনি ক'রেই তিনি মানুষকে পথ পরিষ্কার করে দিয়ে একেবারে চরম সুযোগ জুটিয়ে দেন। কি বল শশী ?

শোভেন্দ্র একটু হাসিল। শশীও যোগ না দিয়া পারিল না।

শোভেন্দ্র বলিল—বেশ ভ্রমরের মত জীবন কাটান যায়, প্রত্যেকটা রাত হয় ফুলশয্যার রাত বা মধুযামিনী-তা হলে খুব ভাল হয়, না শশী ?······

শশী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শোভেন্দ্র হাসিয়া বলিল—মদের ক্রিয়া আরম্ভ হ'য়েছে, চোখে গোলাপী রং দেখ্‌ছি, কিন্তু আসল কথাই তোমায় এখনো সব ভেঙ্গে বলি নি শশী। আজ দু'দিন আকাশ-পাতাল ভেবে এই মতলবই স্থির ক'রেছি। এ ছাড়া নিরাপদ উপায়ও আর মাথায় কিছু এল না।···

শশী বলিল—কিন্তু বিয়ের কথা যে ব'লছেন, সেইটাই কি খুব নিরাপদ হবে ?······

—নিশ্চয়ই—সে কথা আর ব'লতে! স্রেফ্‌ থিয়েটারী অভিনয়, এইটুকু পারবে না ?

—না পারার আর কি আছে ? তবে কি না···শশী একটু হাসিল।

সোজা হইয়া বসিয়া মাথার চুলের ভিতর আঙুল দিয়া গম্ভীরস্বরে শোভেন্দ্র বলিল—না না, হাসি নয়, Be serious শশী, মন দিয়ে শোন, আর বেশ করে বোঝ।

ভাব বুঝিয়া শশী সোজা হইয়া বসিল, বলিল—বলুন।

শোভেন্দ্র দৃঢ় অথচ চাপা গলায় বলিল—তোমায় অভিনয় ক'রতে হবে।

তোমার নাম যে শশী—এ কথা তোমায় একদম ভুলে যেতে হবে। ধর, তোমার নাম হ'ল প্রকাশ বাঁড়ুযো আর তোমার ভাই-এর নাম, ধর, বিকাশ বাঁড়ুয্যে।

শশী বলিল—বিলক্ষণ, তা বিকাশটা আবার কে, তাকে আবার কোথায় পাব ?

—আহা-হা—ব্যস্ত হও কেন ?

—আচ্ছা বলুন।

—আমার কলকাতার বাড়ীতে সেই যে মুকুন্দ বাঁড়ুযো বলে ছেলেটাকে দেখো নি ?······মেডিক্যাল মেসে থাকে, এম্ বি পড়ে। বাবাই তাকে ছেলেবেলা থেকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ ক'রেছেন, এখনও আমার এষ্টেট থেকে তাকে মাসে মাসে ৭৫ টাকা করে দিচ্ছি তার পড়ার খরচ বাবদ। আমার খুব obedient. সেই মুকুন্দই হবে তোমার ভাই বিকাশ বাঁড়ুযো।

—তারপর ? সে কোথায় ?···

—কলকাতাতেই আছে। সময়মত 'তার' করে তাকে আনাবো'খন। সেই মুকুন্দর সঙ্গে ঐ মেয়েটার মানে সাবিত্রীর বিয়ে ঠিক করতে হবে তোমার। এই-ই হচ্ছে তোমার বড় কাজ, মানে, বড় ভাই ছোট ভাই-এর বিয়ের সম্বন্ধ স্থির ক'রছ আর কি !···

শশী চুপ করিয়া রহিল, পরে বলিল—কিন্তু মুকুন্দ রাজী হবে ত ? আর এদিকের কি রকম কি সব······

শোভেন্দ্র বলিল—মুকুন্দকে রাজী করানোর ভার আমার। তোমাদের বাড়ী ব'লবে ২৪ পরগণায়, বেলঘরেয়। কিছু জমিদারী আছে এদিকে,

মা ত বহুকাল স্বর্গে, স্ত্রী গেছে, বাবাও চলে গেলেন। ভগবানের কি ইচ্ছে জানিনা শশী, বোধ হয় এমনি ক'রেই তিনি মানুষকে পথ পরিষ্কা করে দিয়ে একেবারে চরম সুযোগ জুটিয়ে দেন। কি বল শশী ?

শোভেন্দ্র একটু হাসিল। শশীও যোগ না দিয়া পারিল না।

শোভেন্দ্র বলিল—বেশ ভ্রমরের মত জীবন কাটান যায়, প্রত্যেকট রাত হয় ফুলশয্যার রাত বা মধুযামিনী - তা হলে খুব ভাল হয়, না শশী ?......

শশী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শোভেন্দ্র হাসিয়া বলিল—মদের ক্রিয়া আরম্ভ হ'য়েছে, চোখে গোলাপী রং দেখ্ছি, কিন্তু আসল কথাই তোমায় এখনো সব ভেঙ্গে বলি নি শশী। আজ দু'দিন আকাশ-পাতাল ভেবে এই মতলবই স্থির ক'রেছি। এ ছাড়া নিরাপদ উপায়ও আর মাথায় কিছু এল না।...

শশী বলিল—কিন্তু বিয়ের কথা যে ব'লছেন, সেইটাই কি খুব নিরাপদ হবে ?......

—নিশ্চয়ই—সে কথা আর ব'লতে! স্রেফ্ থিয়েটারী অভিনয়, এইটুকু পারবে না ?

—না পারার আর কি আছে ? তবে কি না...শশী একটু হাসিল।

সোজা হইয়া বসিয়া মাথার চুলের ভিতর আঙুল দিয়া গম্ভীরস্বরে শোভেন্দ্র বলিল—না না, হাসি নয়, Be serious শশী, মন দিয়ে শোন, আর বেশ করে বোঝ।

ভাব বুঝিয়া শশী সোজা হইয়া বসিল, বলিল—বলুন।

শোভেন্দ্র দৃঢ় অথচ চাপা গলায় বলিল—তোমায় অভিনয় ক'রতে হবে।

তোমার নাম যে শশী—এ কথা তোমায় একদম ভুলে যেতে হবে। ধর, তোমার নাম হ'ল প্রকাশ বাঁড়ুযো আর তোমার ভাই-এর নাম, ধর, বিকাশ বাঁড়ুয্যে।

শশী বলিল—বিলক্ষণ, তা বিকাশটা আবার কে, তাকে আবার কোথায় পাব?

—আহা-হা—ব্যস্ত হও কেন?

—আচ্ছা বলুন।

—আমার কলকাতার বাড়ীতে সেই যে মুকুন্দ বাঁড়ুযো বলে ছেলেটাকে দেখো নি?......মেডিক্যাল মেসে থাকে, এম্ বি পড়ে। বাবাই তাকে ছেলেবেলা থেকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ ক'রেছেন, এখনও আমার এষ্টেট্ থেকে তাকে মাসে মাসে ৭৫৲ টাকা করে দিচ্ছি তার পড়ার খরচ বাবদ। আমার খুব obedient. সেই মুকুন্দই হবে তোমার ভাই বিকাশ বাঁড়ুযো।

—তারপর? সে কোথায়?...

—কলকাতাতেই আছে। সময়মত 'তার' করে তাকে আনাবো'খন। সেই মুকুন্দর সঙ্গে ঐ মেয়েটার মানে সাবিত্রীর বিয়ে ঠিক করতে হবে তোমার। এই-ই হচ্ছে তোমার বড় কাজ, মানে, বড় ভাই ছোট ভাই-এর বিয়ের সম্বন্ধ স্থির ক'রছ আর কি!...

শশী চুপ করিয়া রহিল, পরে বলিল—কিন্তু মুকুন্দ রাজী হবে ত? আর এদিকের কি রকম কি সব......

শোভেন্দ্র বলিল—মুকুন্দকে রাজী করানোর ভার আমার। তোমাদের বাড়ী ব'লবে ২৪ পরগণায়, বেল'ঘরেয়। কিছু জমিদারী আছে এদিকে,

তাই মাঝে মাঝে দেখাশুনা ক'রতে আস। আর ভাই'এর সম্বন্ধে ব'লে —সে খিদিরপুরের ডকে চাকরী করে, বি, এ পাশ।

শশী বলিল—কিন্তু যদি খোঁজ খবর নেয় ?···

—আরে তুমিও যেমন! গেঁয়ো ভূত এরা, অত শত এদের মাথায়ই আসবে না। সহরের নাম শুনলেই ওঠে আঁৎকে। আরে ভাই, মা বাপ কি ভাই যদি না থাকে তবে অত শত খবর নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। যদি একান্তই দেখাশুনা ক'রতে চায়, সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেবে আমার বেলঘরের বাগান বাড়ী।

শশী হাসিল, বলিল—কিন্তু এদিক্‌কার লোক কি কলকাতার ওদিকে কেউ চাকরী বাকরী করে না ?

শোভেন্দ্র বলিল—ক'রলই বা, খিদিরপুর ডকে হাজার হাজার লোক চাকরী ক'রছে, কে কার খবর রাখে, আর বেলঘরের সন্ধানই বা এখানকার ক'জন রাখে? আর সময়ই বা আমরা দেব কেন ?···Propose কর ! যদি দেখ দূর বলে রাজী হচ্ছে না বা কোন কারণে অমত ক'রছে—মোটা টাকা ঐ মামাটার হাতে গুঁজে দাও—সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে'খন। তুমি ওস্তাদ লোক, তোমাকে আর বেশী ক'রে কি বলব বল ?···

শোভেন্দ্রের কণ্ঠে জড়তা আসিয়াছে। চোখ চাহিয়া সোজা হইয়া বসিয়া থাকিতে তাহার কষ্ট বোধ হইতেছিল—সোফায় গা এলাইয়া দিল। চোখ বুজিয়াই বলিল—রাতও ত অনেক হল শশী—আমার যা ব'লবার আমি ব'লেছি। চিন্তা-ভাবনার ত কিছুই দেখিনা এর ভেতর— তবে হুঁসিয়ার হয়ে কাজ ক'রতে হবে, এই যা।···

শশী উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—তা হলে আজ রাত্রের মত···

শোভেন্দ্র চোখ বুজিয়াই বলিল—হাঁ ভাই, তুমি শুয়ে পড় গিয়ে—হ্যাঁ আমার নাম কিন্তু সেখানে ঘুণাক্ষরেও মুখে এনো না। আর এক কথা, মুকুন্দকে রাজী করাবই, আর যদি কোন কারণে তার দ্বারা না হয়—তবে তোমাকেই কিন্তু বর সাজতে হবে শশী।

—বটে! বলেন কি?—শশী একটু হাসিল। তাহারও দাঁড়াইতে একটু কষ্ট হইতেছিল, চেয়ারের উপর আবার বসিয়া পড়িল।

শোভেন্দ্র বলিল—হাঁ ভাই, তোমার কোন চিন্তা নাই, বে'র পরদিন রওনা হয়ে বেলঘরেয় আমার বাগান বাড়ীতে পৌছান পর্য্যন্ত তোমার স্বামীত্বের দাবী কিন্তু।......

শশী আবার হাসিয়া উঠিল। শোভেন্দ্র বলিল—তুমি হাসছ শশী, আর আমার বুকটার ভেতর আগুন জ্বলছে দাউ দাউ ক'রে—সাবিত্রীকে আমার চাই-ই···

সাবিত্রীর সমস্ত দেহটা যেন শোভেন্দ্র মনশ্চক্ষে দেখিতে লাগিল। জড়িতকণ্ঠে সে বলিল—আর একটা দিনও যে আমার দেরী সইছে না শশী!

—মধু! শোভেন্দ্র ডাকিল।

তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া আসিয়া মধু ধনুকের মত বাঁকিয়া দাঁড়াইল।

শোভেন্দ্র বলিল—ওরা এখুনি বিয়ে দিতে রাজী ত?···

মধু করজোড়েই বলিল—এজ্ঞে হাঁ, একেবারেই রাজী। আজ দু'দিন হ'য়ে গেল—কালই ত্রিরাত্তিরির শ্রাদ্ধ হ'বে। বামুন পণ্ডিতরা নাকি ব'লেছে, যে-কোন দিন এখন বিয়ে দিতে পারে দিনক্ষ্যাণ্ দেখে।···তার মামার ইচ্ছে, দুই চারদিনের ভেতরই বিয়ে দিয়ে স'রে পড়া। আমি সব

খবরই নিয়েছি হুজুর—শুনছিলাম, পড়শীদের ভেতর কে একজন নাকি ওর মামাকে একটু চাপ দিয়েছে কিছু টাকার জন্যে।

শোভেন্দ্র মুহূর্ত্তে সোজা হইয়া বসিল, বলিল—কিসের টাকা ?···

মধু বলিল—ঐ বাড়ীটুকু আর সামান্য দুই এক বিঘে জমি—এ ত যৌতুক আছেই, তার ওপর কিছু নগদ টাকা পেলে নাকি তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারেন।···

শোভেন্দ্র রাগিয়া উঠিল, বলিল—বটে! কে সে ?

—তা ত জানিনা হুজুর—ঐ পাড়ারই কে হবেন শুনছিলাম।

শোভেন্দ্র ব্যস্তভাবে শশীর দিকে তাকাইয়া বলিল—শশী, আর এক মুহূর্ত্ত দেরী নয়, কাল সকালেই ওর মামার সঙ্গে একভাবে দেখা ক'রে কথাটা পেড়ে ফেল।

শশী আড়মোড়া খাইয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আচ্ছা আপনার আর বলতে হবে না,—কিন্তু···

—আবার কিন্তু কিসের ?······

শোভেন্দ্রের দিকে তাকাইয়া শশী একটু হাসিয়া মুখ নীচু করিল।

শোভেন্দ্র বলিল—ও, বুঝেছি—পুরস্কার ?······হেঁ হেঁ—তুমিই হাসালে শশী!······আমায় স্মরণ করিয়ে দেবে, তবে তোমায় দেব—এই কথা ? না, কি ? না, পুরস্কারের অঙ্কটাই শুনে নিতে চাও ?···

শশী নতমুখে নীরব রহিল।

শোভেন্দ্র চোখের পাতা টানিয়া বলিল—'অল্ রাইট', এর পুরস্কার তোমায় আমি দেব পাঁচ হাজার টাকা।

শশী মৃদুহাস্যে ঘাড় নীচু করিয়া বসিয়াই রহিল।

শোভেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—তোমার জবাবটা বোধ হয় পরিষ্কার ক'রে এখনও, পাওনি না?······এ টাকা তোমায় আমি দেব আমার বেলঘরের বাগান-বাড়ীতে—যেদিন সাবিত্রীকে নিয়ে হাজির হবে আমার কাছে কেমন?···

শশী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

শোভেন্দ্র শশীর প্রতি একটা বক্র দৃষ্টি হানিয়া টলিতে টলিতে ঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিল।

দশ

পরদিন সকালে আট ঘটিকার সময় সাবিত্রীদের ঘরে বসিয়া দুই ব্যা পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিতেছিল। সাবিত্রীর মামা মণিলাল বন্দ্যোপাধ্য ও নবাগত ভদ্রলোক প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মণিলাল বলিল—কি ক'রে যে আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকা ক'রব প্রকাশ বাবু, বুঝতেই পারছি না। আর জন্মে আপনি নিশ্চয় আমাদের কোনও বান্ধব ছিলেন। আমি যেন অথৈ সমুদ্রে হাবুডু খাচ্ছিলাম—আপনার কথা শুনে সত্যিই যেন কূল পেয়েছি ব'লে মনে হ'চ্ছে।

প্রকাশ বাবু (ভূতপূর্ব্ব শশী চক্রবর্ত্তী) বলিল—ও কথা ব'লে অপরাধী করবেন না মণিলাল বাবু, সত্যিই আপনার মত লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা করবার মত সৌভাগ্য লাভ ক'রে আমি ধন্য হব। সত্যি কথা ব'লতে কি ঠিক এমনি একটি মেয়েই আমি খুঁজছিলাম।

মণিলাল বলিল—মেয়ের কথা কি আর ব'লব প্রকাশ বাবু, বাস্তবিক এমনি একটি মেয়ে আজকাল সংসারে খুবই কম। অথচ, লোকে কি বিচার ক'রে দেখে? আপনি ত নিজে চোখেই দেখলেন, কথাবার্ত্তাও শুনলেন। কাজে কর্ম্মে কথায় বার্ত্তায় সাবিত্রীর মত মেয়ে, আমি ত দু'চার গাঁয়ে দেখিই না। অবিশ্যি আমার নিজের ভাগ্নী ব'লে আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। তবু আজ ক'টা দিন ধরে কেঁদে কেঁদে

চেহারাটা কি বিশ্রী ক'রেছে। ওর মুখের অমন যে সুন্দর হাসি—সে হাসি আর নেই।

সমবেদনার সুরে প্রকাশ বলিল—আহা-হা, তা আর হবে না? ...অমন মা যা'র গেছে, সে তা দু'দিনেই ভুলবে কেমন ক'রে? কথায় বলে মা, মা কি ভুলবার?...

প্রকাশের মুখে চিন্তা ও সমবেদনা প্রকাশের রেখা পড়িল। তাহার মনে হইল, আজিকার রঙ্গমঞ্চে সে-ই প্রধান অভিনেতা। আত্মপ্রত্যয়বান বিখ্যাত অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে দর্শকের মুগ্ধদৃষ্টি ও করতালির মধ্যে যেমন নিজের সাফল্যে আত্মহারা হইয়া উঠে, তেমনই শশীর মনে হইল, সংসার-রঙ্গমঞ্চের একটি নাটকের এই অঙ্কের এই প্রকাশের ভূমিকাটিতে সে যে কত চমৎকার অভিনয় করিতেছে, তাহার প্রত্যক্ষ দর্শক এই মাত্র একটি লোক হইলেও এ-অভিনয় সাফল্য ঢের বেশী মূল্যবান। হাজার হাজার হাতের প্রাণমাতানো করতালির শব্দ অপেক্ষা একটি নিশ্বাসের শব্দও এখানে অনেক বেশী কাজের।...এই-ই নিখুঁত অভিনয়, ইহারই ভিতর আছে প্রাণ।... একজন যাদুকর অভিনেতা, আর একজন বিমুগ্ধ দর্শক।

মণিলালের চোখ দু'টি অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। সেদিকে একবার তাকাইয়া প্রচণ্ড এক দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া প্রকাশ বলিল—আচ্ছা আপনার দিদির কি হ'য়েছিল?...তিনি কি কোনও অসুখে ভুগছিলেন?...

চোখ মুছিয়া মণিলাল বলিল—কিছু না, দিদির অসুখ বিসুখ কিছু ছিলই না। দিব্যি ভাল মানুষ, হঠাৎ হার্ট্‌ফেল ক'রলেন......। মেয়েটাকে রেখে দিদি যে কত দুঃখে চোখ বুজেছেন, সে আর আপনাকে বুঝিয়ে কি ব'লব প্রকাশবাবু!—মেয়ে ব'লতে তিনি

ছিলেন অজ্ঞান, আর ঐ মেয়েটি ছাড়া সংসারে তাঁর আর কোন বাঁ
ছিল না।

বস্তুতঃ সাবিত্রীর মা'র মৃত্যুর ভয়ঙ্কর রহস্যে মণিলাল কিছুই জা
না। সাবিত্রী কিছুই বলে নাই।

প্রকাশ বাধা দিয়া বলিল—থাক্ মণিবাবু—ও সব কথা আর তুল
না। সংসার, সংসার! কি ব'লব মণিবাবু—সময় সময় ইচ্ছে হয়, লোট
কম্বল সম্বল ক'রে দিই একদিকে রওনা।—চ'লে যাই—যেদিকে নি
যায় দুই চোখ। কিন্তু পারি না—শুধু ছোটভাইটার জন্যে, শুধু বিকাশে
মুখের দিকে তাকিয়ে। নইলে, এক মুহূর্ত্ত ভাব্‌তে গেলেই বুকের ভেতর যে
চিতার আগুন লক্ লক্ ক'রে জ্বলতে থাকে। সাজান সংসার—সব কিছু
ফেলে রেখে কোথায় সে চ'লে গেল!……কি বলব মণিবাবু—ব'লতে গেলে
বুক ফেটে যায়! প্রতিমার মত যেমন ছিল তার রূপ, তেম্‌নিই ছিল
গুণে সে লক্ষ্মী। মাত্র চারটি বছর আমার সংসার সে ক'রে গেছে, আর
এই চারটে বছরে সংসার আমার যেন উথ্‌লে উঠেছিল।…

কল্পিত লোকান্তরবাসিনী পত্নীকে স্মরণ করিয়া বেদনার একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ যেন উদ্যত অশ্রু সম্বরণ করিল। বলিল—বিধাতার আশীর্ব্বাদের মতই তাকে একদিন পেয়েছিলাম মণিবাবু, আবার বিধাতার অভিশাপের মতই একদিন তাকে বিদায় দিতে হল। নিজের হাতেই সোনার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিলাম। যাক্, সে সব কথা, আর ব'লেই বা কি হবে?……সময় সময় মনে হলে মনে হয় যেন স্বপ্ন—স্বপ্নে তাকে পেয়েছিলাম • আবার স্বপ্নের ভেতরই সে ডুবে গেছে।

অদৃষ্টের পাঁচালী

প্রকাশের স্ত্রী-বিয়োগের আখ্যান শুনিয়া ভদ্ররক্ষার্থে সমবেদনায় মণিলাল ঘাড় নীচু করিয়া মাথা দোলাইয়া 'হায় হায়' করিলেন। প্রকাশের চোখ দুইটি ছল ছল করিতে লাগিল। তাহার গলার স্বর হঠাৎ ভারী হইয়া উঠিল।

মণিলাল বলিল—সেজন্যে আর দুঃখ ক'রবেন না প্রকাশ বাবু; তাঁর কাজ শেষ ক'রে তিনি চলে গেছেন। সময় ফুরুলে সবাইকেই যে যেতে হয়.........

—কি বলেন মণিবাবু, সময় কি তার ফুরিয়েছিল? যেতে কি সে চেয়েছিল?...হায়, বুঝেও যে এ অবুঝ মন বুঝতে চায় না মণিবাবু। আমার মনে হয়, কে যেন এই বুকের পাঁজরটা ভেঙ্গে দিয়ে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া প্রকাশ পুনরায় বলিল—কত লোক আমায় উপদেশ দিয়েছে আবার বিয়ে ক'রতে! বুড়ো মা হাত দু'খানা চেপে ধরে কত কেঁদেছেন, কিন্তু সত্যি কথা ব'লতে কি মণিবাবু, আমি পারি না—পারি না আর একজনকে এনে তারই জায়গায় তারই পরিত্যাক্ত আসনে বসাতে; আমি যে তা একেবারে ভাবতেই পারি না।

মণিলাল মাথা চুল্‌কাইয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—তা ত বটেই......

নিজেকে সামলাইয়া লইয়া প্রকাশ বলিল—সেইজন্যেই ত ভাইটার বিয়ের জন্যে এতদূর ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। বুড়ো মা, তাঁর অত্যন্ত কষ্ট হয়, বিশেষতঃ আমার স্ত্রী গত হবার পর থেকে তাঁর সর্ব্বদাই কেমন একটা বিমর্ষভাব। সব সময়েই চোখের জল ফেলছেন, দেখে বড় কষ্ট হয়।

ছোট ভাই বিকাশের হ'য়েছে আরও অসুবিধে। সে বেচারীর যত f
আব্দার সবই ছিল বৌদির কাছে। সেও তার বৌদিকে হারিয়ে আঘ
পেয়েছে সাংঘাতিক। তার অসুবিধে হ'য়েছে আরও বেশী এই জন্যে (
সকাল সকাল আফিসের দুটো ভাত তাকে দেয় কে—সে আবার ঠাকুরে
হাতের রান্না খায় না, তার আবার—

কথা শেষ করিতে না দিয়া মণিলাল বলিল—সে বিষয়ে আপনি
একেবারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সাবিত্রীর হাতের যেমন রান্না—
তেমনি চট্‌পট্ রান্না করতে যাকে বলে একেবারে পটু।……ভাবছিলাম,
মেয়েটাকে কি শেষটায় জলেই ভাসিয়ে দেওয়ার মত দিতে হবে? তা
ভগবানের দয়ায় আপনাদের সঙ্গে……

প্রকাশ বলিল—ভগবানের দয়া বৈ কি মণিলাল বাবু! সবই তাঁর
ইচ্ছা, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই হয় না। আমরা মানুষ—উপলক্ষ
মাত্র।

কথার জের ধরিয়া মণিলাল বলিল—নিশ্চয়ই, উপলক্ষ্য বই কি! যার
হাঁড়িতে যে চা'ল দিয়েছে তাকে যে সেখানে যেতেই হবে। ভগবান
সবই ঠিক করে রেখেছেন যে আগে থেকে।

দুইজনেই একটু হাসিয়া উঠিল।

মণিলাল বলিল—দিন ত আর নেই, সামনের ২৩শে মাত্র একটা দিন
আর আছে ৩০শে। শেষের দিনটা বাদ দেওয়াই ভাল; বিঘ্ন উপস্থিত
হতে পারে—২৩শে-ই প্রশস্ত। তিনটি দিন ত আছে, এর ভেতর উভয়-
পক্ষের পাকা দেখা…শুভকাজের খুঁটিনাটি……

প্রকাশ বলিল—সেজন্যে আপনি ভাবছেন কেন?……সেজন্যে মোটেই

আট্‌কাবে না। বিকাশকে আমি আজই টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি—সে আসুক্‌, একবারটি দেখুক্‌! বুঝছেন না? আজকাল শিক্ষিত লায়েক ছেলেরা নিজেরাই ক'রে দেখে শুনে নিতে চায়।

কথাটা বলিয়াই প্রকাশ মণিলালের মুখের দিকে তাকাইল এবং তাহার মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিল।

মণিলাল স্মিতহাস্যে বলিল—সে ত খুবই ভাল কথা, সাবিত্রীকে দেখে শুনে অপছন্দ হবার কিছুই নাই।

অপ্রস্তুতের মত ভাব দেখাইয়া প্রকাশ বলিল—আহা-হা, আমার কথাটা আপনি বুঝতেই পারেন নি মণিবাবু। পছন্দ অপছন্দর কোন কথাই নয়। আমার পছন্দেই তার পছন্দ, নইলে তাকে আর এতদূরে টেলিগ্রাম ক'রে আনাচ্ছি কেন!……তবুও বুঝছেন না মশাই? দেশের যা হালচাল, সমাজের যা আধুনিক রীতিনীতি……ছেলেরা ভাবে, আমাদের ঘাড়ে কোথা থেকে যেন কি একটা এনেই না গছিয়ে দিচ্ছে! অবশ্য বিকাশ তেমন ছেলেই নয়, তবুও আমি চাই যে, এসে নিজে দেখুক্‌, আর সঙ্গে সঙ্গে পাকা দেখা আর শুভকাজ হয়ে যাক্‌।

মণিলাল বলিল—বেশ ত, এ ত খুবই ভাল কথা।

প্রকাশ বলিল—শুভকাজ শেষ ক'রে পরদিনই মা লক্ষ্মীকে নিয়ে আমরা রওনা হ'তে পারব, সেই বেশ ভাল হবে।

সোল্লাসে মণিলাল বলিল,—বেশ বেশ।

প্রকাশও উৎসাহিত হইয়া বলিল—শুভ কাজ চুকে যাক্‌ ভালয় ভালয়, তারপর একদিন এসে নৌকোয় ক'রে বিলে দুজনে বেরিয়ে

আপনাকে জমিগুলো দেখিয়ে নিয়ে আসব—আর জমির কাগজপত্রগুলোও আপনাকে দিয়ে যাব।

মণিলাল হাসিয়া শুধু মাথা নাড়িয়া তাহার সম্মতি এবং সমর্থন জানাইল। প্রকাশ সুযোগ বুঝিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল। বলিল —আর একটি কথা; বলিয়াই সে মণিলালের মুখের দিকে না তাকাইয়া ঘাড় নীচু করিয়া পকেটে হাত ঢুকাইয়া মনিব্যাগটি বাহির করিল এবং কোন কথা না বলিয়া কোনদিকে না চাহিয়াই ব্যাগের ভিতর হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া মণিলালের ফতুয়ার পকেটে ঢুকাইয়া দিল।

—একি—একি--বলিতে বলিতে মণিলাল বিস্ময়বিমূঢ়ের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া প্রকাশের মুখের দিকে রুদ্ধনিশ্বাসে তাকাইয়া রহিল।

মণিলালের হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া প্রকাশ বলিল—কিছু না, কিছু না মনিবাবু—এ আমার ভাইএর বিয়ের খরচ মাত্র। আপনার হাতে উপস্থিত টাকা নেই, তাই দিচ্ছি। কিছু মনে ক'রবেন না। সাবিত্রীর বাবা বেঁচে থাকলে আমি এ দিতাম না। আপনার এতে কুণ্ঠিত হবার কিছুই নাই—মাত্র চারশ টাকা বই ত নয়। কিন্তু এ-টাকার কথা যেন কেউ না জানতে পারে।

মণিলাল কেমন যেন লজ্জিত হইয়া পড়িল। প্রকাশের মুখের দিকে তাকাইয়া কি বলিতে গিয়াও সে বলিতে পারিল না। প্রকাশের মুখে এমন একটা ভাব ছিল যাহাতে টাকা কয়টি ফেরত দিবার কল্পনাও তাহার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল।

প্রকাশ নিম্নস্বরে বলিল—এ টাকার কথা আপনি আর আমি ছাড়া

যেন তৃতীয় ব্যক্তি কেউ না জানতে পারে—এমন কি আমার ভাই বিকাশের কাছেও কোন সময় ব'লবেন না, তা হ'লে কিন্তু আমাকে খুবই লজ্জার মধ্যে প'ড়তে হ'বে।

মণিলালের সমস্ত অন্তর প্রকাশের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। তাহার মুখ দিয়া অস্ফুটে বাহির হইল—সত্যিই, আপনি দেবতুল্য লোক।

সহাস্যে প্রকাশ বলিল—অতটা বাড়িয়ে দেবেন না মণিবাবু।

তারপরই ব্যস্ততাসহকারে বলিল—তা হ'লে আপনি সব গোছগাছ করুন—আমি এখন উঠ্ছি—কাল বিকেলের দিকেই আসব—বাড়ীতে থাক্‌বেন।

মণিলাল বলিল—তা কখনো হয়?—এ অসময়ে আপনাকে আমি এখন ছাড়তে পারব না—বিশেষ আপনি ব্রাহ্মণ। স্নান ক'রে খাওয়া দাওয়া সেরে একেবারে যাবেন। জন কয়েক ব্রাহ্মণ ত আজ নিমন্ত্রিত হ'য়েছেন। আজ যে দিদির······

কথা শেষ করিতে না দিয়াই প্রকাশ উঠিয়া পড়িল, বলিল—আমার এখনো আহ্নিক করা হয়নি—বিশেষ, বারুইপুরে আমার সেই ব্রাহ্মণ প্রজাটি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তাঁ'দের ব'লে এসেছি—সেখানে গিয়েই খাওয়া দাওয়া সারব। আমি না গেলে তাঁরা সারাদিনই অভুক্ত থাক্‌বেন—আর একটা বিশেষ জরুরী কাজও আছে। আজকের দিনটা আমায় ক্ষমা করুন······আর কখ্‌খনো আপনাকে ব'লব না।

মণিলালও উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—একেত্রে আপনাকে আর জোর

ক'রে কি ব'লব! আবার বারুইপুর কমপক্ষে দু'ক্রোশ পথ! আপনি তা হ'লে কালই বিকেলে আসছেন ত?

প্রকাশ হাসিয়া বলিল—সে কথা আর ব'লতে!—আমি আজই আমার ভাইকে তার ক'রে দিচ্ছি—কাল সকালেই সে এসে প'ড়বে।

মণিলাল বলিল - দিন ত আর নেই—মাঝে তিনটে দিনও ব'লতে গেলে নেই।

প্রকাশ বলিল—দায়িত্ব আমারও কম নয় মণিবাবু—আচ্ছা দাদা—আসি এখন, নমস্কার!

—নমস্কার—

প্রকাশ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। মণিলাল রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া বেশ হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে বাড়ীর মধ্যে গিয়া ঢুকিল এবং আস্তে আস্তে রান্নাঘরের দিকে গেল। ডাকিল—সাবিত্রী!

সাবিত্রীর কোনও উত্তর না পাইয়া মণিলাল ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল, সাবিত্রী মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে।

মণিলাল বলিল—কি মা, অমন মুখ ভার ক'রে ব'সে আছিস্ যে আবার?

সাবিত্রী কোন্ কথা বলিল না, নতমুখে নীরবে বসিয়াই রহিল।

সোৎসাহে মণিলাল বলিল—তোর এই বিয়েই ঠিক ক'রে ফেললাম মা। বেশ কলকাতার সহরের কাছে থাকবি। ছেলেটি কলকাতার সহরে চাকরী ক'রে—খুব ভাল চাকরী। বাড়ীতে দালান পুকুর—দশটা পাঁচটার সংসার নয়—কিছু জমিদারীও আছে—খুব সুখে থাকবি মা।

সাবিত্রী কিছুই বলিল না। হয়ত এসব কথার ভিতর তাহার বলিবার কিছুই নাই, কিন্তু যে কারণেই হোক—তাহার চোখের কোল দুইটি জলে একেবারে ভরিয়া উঠিল এবং উদ্গত অশ্রু গোপন করিবার জন্যই সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

মণিলাল নিজেই একখানি আসন পাতিয়া বসিয়া পড়িল, বলিল—একটু দূরদেশ ব'লে তোর মন একটু খারাপ হ'তে পারে মা, কিন্তু ভেবে দেখ্‌, কি সুন্দর ঘর বর তোর হ'বে—কত সুখে থাকতে পারবি! আর এখানকার ঐ চাটুয্যে বাড়ীর হাড়হাভাতে ছোঁড়ার সঙ্গে ত দিতে আমার মন চায় না। সে ছেলেটি ত আসবে—বোধ হয় কালই—দেখ্‌তে পাবি—একেবারে রাজপুত্রের মত নাকি দেখ্‌তে!

সাবিত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অকারণে জল আনিবার অছিলায় কলসীটা কাঁখে তুলিয়া লইল। মণিলাল বলিল—এরা যে নেহাৎ ভদ্রলোক—সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিছুই চায় না—কোন রকম দাবী-ই নেই – উল্টে এক গা গহনা দেবে তোকে। বড়লোক—উঁচু মন—এরকম না হ'লে কি আর মানুষ বড় হ'তে পারে? এই জন্যেই ত খোঁজ-খবর নেবার আর দরকারই দেখছি না।……

সাবিত্রী কলসী লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। মণিলালও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিল, বলিল—পরে তোকে সবই বলব'খন……বেলা ত হ'য়ে পড়ল মা—তুই চট্‌ ক'রে জলটা এনে ফেলে এদিককার যোগাড়যন্ত্র ক'রে ফেল্‌—আমি ওপাড়ায় একটু দেখাসাক্ষাৎ ক'রে বাজার থেকে দইমিষ্টিটা আনার ব্যবস্থা ক'রে আসি।…

মণিলাল চলিয়া গেল। টাকার কথাটা সাবিত্রীর নিকট সে একেবারেই চাপিয়া গেল।...ঘাটে তখন কেউই ছিলনা। সাবিত্রী চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া খেজুরগুঁড়ির উপর বসিয়া অকারণে অন্যমনস্কের মতই দুর্ব্বা ও মাটীর সহযোগে পিতলের কলসীটা মাজিতে লাগিল।... ...কলসীর উপরই তাহার চোখ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।......আজ এমন দিনে মা নেই যে, তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া আদর করিবেন—তাহাকে সান্ত্বনা দিবেন—আনন্দাশ্রু মোচন করিতে করিতে তাহাকে সাজাইয়া দিবেন!...অথচ—ঠিক এই দিনটির জন্যই তাঁহার কত আশা—কতই না আকাঙ্ক্ষা ছিল! ঠিক এই দিনটির জন্যই কতই না মঙ্গল অমঙ্গলের চিন্তায় কত বিনিদ্র রজনী তিনি অতিবাহিত করিয়াছেন!......কয়টি দিনেরই বা কথা!......কি নিদারুণ দুঃখ—কত বড় অশান্তি বুকে লইয়াই কি নিষ্ঠুরভাবে মা তাঁহার দেহ হইতে স্বেচ্ছায় প্রাণটা বাহির করিয়া দিয়াছেন......ছায়াছবির মতই সাবিত্রীর সজল চক্ষের সম্মুখে একটার পর একটা দৃশ্য অতি করুণভাবে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।......

......মানুষ মরিয়া কোথায় যায়?—সাবিত্রী চোখের জল মুছিয়া ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে তাকাইল। মা কতদূরে—স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। সেখান হইতে একটিবারের জন্য—একবারটি মাত্র কি ফিরিয়া আসা যায় না? সে শুধু বলিবে—মা, তুমি দেখিয়া যাও—আমি তোমারই মেয়ে —সতীর মেয়ে সতী আমি। একবার ঐ স্বর্গ হইতেই আশীর্ব্বাদ কর মা মহাদেবকে—যে রাখিয়াছে আমাদের বংশ—আমার যথাসর্ব্বস্ব। আশীর্ব্বাদ কর মা—যেন তার কোন শাস্তিভোগ না হয়—সে

নিরপরাধ। তুমি ত স্বর্গ হইতে সবই দেখিয়াছ মা—শুধু আমাকে বাঁচাইবার এবং মরণের পরেও তোমাকে বাঁচাইবার অপরাধে সেই নিঃস্বার্থ মহাপ্রাণ লোকটির অদৃষ্টে ভগবান আজ কত বড় দুঃখের পসরাই না চাপাইয়া দিয়াছেন !……

[illegible]

যত আশা যত [illegible] —
পথ চলে এই পান্থ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] স্বর্ণ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

এগার

শ্রীনগর—নদীর উপরেই জমিদার বাড়ী। বাড়ীটি পুরাতন আদর্শের চক্‌মিলান্‌ বাড়ী। নদীর বাঁধান ঘাট হইতে উঠিয়া লালশুরকীর রাস্তা বাড়ীর সদর গেটের মধ্যে সোজা আসিয়া ঢুকিয়াছে! গেটের দুই পার্শ্বে দুই ব্যাঘ্রমূর্ত্তি—যেন ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। গেট ছাড়াইয়া রাস্তার দুইপার্শ্বে ফুলের বাগান—দেশী বিদেশী অজস্র রকমের ফুলগাছ। গাছগুলির উপর শ্রাবণ মেঘের ছোপ লাগিয়াছে—তাহাদের শিরে শিরে ডগায় ডগায় যেন শ্যামলতার ঢেউ উঠিয়াছে!

দো-তলায় তাহার ড্রয়িংরুমে সোফার উপর গা এলাইয়া দিয়া শোভেন্দ্র পাইপ্‌ টানিতেছিল। সম্মুখে চেয়ারে উপবিষ্ট অনুগত সহচর শশী—দ্বারের কাছে দণ্ডায়মান মধু।

অনেকক্ষণ বাদে শোভেন্দ্র বলিল—তারপর, শশী—

—আজ্ঞে, বলুন……

মৃদু হাসিয়া শোভেন্দ্র বলিল—আমার আর এখন ব'লবার কিছুই নেই—ব'লবে সবই তুমি। তোমারই যেন্‌ 'রোল্‌'। প্রকাশ বাঁড়ুয্যের ভূমিকায় তুমি যে রকম acting ক'রে এসেছ বলছ,—তাতে নাটক ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'বে ব'লেই মনে হয়।

সোৎসাহে শশী বলিল—মনে হয় কি—হবেই। আপনি যদি তখন নিজে চোখে দেখতেন, তবেই বুঝ্‌তেন যে, natural acting'এ আমি শিশির বাবুকেও ছাড়িয়ে গিয়েছি কি না!

শোভেন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিটা উপেক্ষার নয়—উল্লাসের।

শশী বলিল—ব্যাপার যা দেখলাম তাতে আর মুকুন্দকে এর ভেতর লাগ্‌তে না। এ নাটকের ভেতর মুকুন্দকে আর বিকাশের পার্টে না জড়ালেই চ'লত—আমিই এ কাজ হাসিল ক'রে দিতে পারতাম।…একে কন্যাদায় উদ্ধার—তার ওপর টাকা—বাপ্‌—এ জিনিষ দুটো আপনি কি একেবারে সোজা মনে করেন?

শোভেন্দ্র বলিল—সোজাসুজির কথা নয় শশী—সোজাসুজির কথা নয়। নিজেই পাণিপ্রার্থী হ'তে গেলে হয়ত তাদের মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হ'তে পারত—হয়ত ভেস্তে যেত—এই ভয়েই ত দিলাম তোমায় একটি ভায়া খাঁড়া ক'রে। লায়েক ভায়া—কি ব'ল?…

শশী এই সমস্ত লোকের সহিত মানাইয়া পোষাইয়া চলিতে জানে—সে বোকা নয়। কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করিয়া সে বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ—তা বৈ কি—এ কাজ আরও মজবুত হ'ল।

শোভেন্দ্র বলিল—বিয়ে ত তা হ'লে ঐ তারিখেই ঠিক?…

—হ্যাঁ—একেবারে পাকা—এর আর কিছু নড়চড় নেই।

শোভেন্দ্রের মুখখানা হঠাৎ যেন পরিপূর্ণ আনন্দে ভরিয়া গেল, বলিল—কি রকম ব্যাপারটা হবে বল ত শশী—?…বিয়ে হবে—বাসর হবে—তারপর মেয়ে যাবে শ্বশুরবাড়ীর ঘর ক'রতে…আর সে ফিরে আসবে না।

…চিঠির পর চিঠি যাবে—তারপর যাবে লোক—গিয়ে দেখবে—যেমন বেলঘ'রে তেমনিই আছে—নেই শুধু প্রকাশ—আর প্রকাশের ভাই বিকাশ —কেমন চমৎকার 'প্ল্যান্' বলত ?—হে হে, কি বল ?…

শশীও হাসিতে যোগ না দিয়া পারিল না—বলিল—আপনার তারিফ্ ক'রতে হয়।…

দেওয়ালে টাঙ্গান ঘড়িটা যথাসময়ে ঢং ঢং করিয়া দশবার বাজিয়া থামিল।

সেদিকে একবার ব্যস্তভাবে তাকাইয়া শোভেন্দ্র বলিল—তাইত শশী —রাত দশটা ত বাজল—মুকুন্দ যে এখনও এল না ? যা'ত মধু একবার ঘাটের দিকে ! সে কি তবে এক্স্‌প্রেস্ ট্রেন্ ধ'রতে পারে নি ? আর্জেন্ট্ টেলিগ্রামই ক'রেছিলে ত ?…

সঙ্গে সঙ্গে শশী বলিল—নিশ্চয়ই—সে কথা আর ব'লতে !—এই দেখুন না রসিদ !…

শোভেন্দ্র বলিল—তবে ত তার এতক্ষণ ঠিক পৌঁছানোর কথা।—এও ত হ'তে পারে যে, মেসে ফিরতে তার হয়ত কোন কারণে দেরী হ'য়েছে— সেইজন্যে 'তার' পেতে দেরী হ'য়েছে।

শশী বলিল—আপনি শুধু শুধু ব্যস্ত হবেন না—আসবার সময় এখনো তার যায় নি। ট্রেন থেকে নেমে এতটা পথ নদীপথে উজান ঠেলে আসতে হবে ত—বিশেষ এই রাত্তির কাল। আর যদি একান্তই এক্স্‌প্রেস্ ধরতে না পেরে থেকে—তবে রাত্রের 'মেলে' রওনা হ'লেও কাল সকাল আটটার ভেতর এখানে এসে পৌঁছে যাবে জানবেন। আমি ত তাদের ব'লে এসেছি, কাল বিকেলে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

শোভেন্দ্র বলিল—আচ্ছা শশী, ধর যদি সে কোন কারণে না-ই আসতে পারে?

শোভেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া শশীর হাসি পাইলেও সে হাসিতে পারিল না। বলিল—আপনি শুধু শুধু সুস্থ শরীরকে কেন ব্যস্ত ক'রে তুলছেন বলুন ত?······মুকুন্দ যদি একান্ত না-ই আসে—বিকাশ আর একজনকে সাজিয়ে নেব'খন। আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন?···সাবিত্রীর মামা মণিলালটা একটা ইডিয়ট্—আমার কথাবার্ত্তায় চালবাজীতে সে একেবারে মাৎ হ'য়ে গেছে। তাকে নিয়ে আমি এখন ছিনিমিনি খেলতে পারি। আমায় বলে কি জানেন?—ব'ললে, আপনি দেবতুল্য লোক···হে হে হে—দেবতুল্যই বটে।

শোভেন্দ্র হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। তারপরই সোজা হইয়া বসিয়া শশীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—হাঁ শশী, সেই হাজার টাকা পুরোপুরিই তাকে দিয়েছ ত?

কথার মধ্যে অকারণে অকস্মাৎ দৃঢ়তা আনিয়া শশী বলিল—নিশ্চয়ই—সে কথা আর ব'লতে!···টাকা পেয়ে তার কি আনন্দ!····· ব্যাটাচ্ছেলে একসঙ্গে হাজার টাকা কোনদিন তার জন্মচৈতন্যে দেখেছে কি না সন্দেহ! গেঁয়ো ভূত!······

মনে মনে বলিল—বাবা, তুমি বেড়াও ডালে ডালে—আর আমি বেড়াই পাতায় পাতায়। সোনার চাঁদ শশী চক্রবর্ত্তী সে রকম বাপের ব্যাটাই নয়—সে রকম কাঁচা ছেলেই নয়। রীতিমত ৬০০্টি টাকা ট্যাঁকে গুঁজে হাত রেখে তবে সে কাজে নেমেছে। হুঁ, ঐ ৭০০্ টাকার গুরমই আগে সে ব্যাটা হজম ক'রে নিক্!···

শোভেন্দ্র গম্ভীরস্বরে বলিল—ভাই শশী, টাকার জন্যে আমি কিছু ভাবি না। যাক্ দু' হাজার—দশ হাজার—আমি চাই তাকে। হাতের মুঠোয় পেয়ে তাকে ছাড়তে হ'য়েছে—এ যে জমিদার শোভেন্দ্র নারায়ণের পক্ষে কত বড় পরাজয়—তা তুমি বুঝতে পারবে না শশী! তোমায় সত্যি কথা ব'লছি ভাই—সেইদিন থেকে তাকে দেখে অবধি আমি যেন কেমন হ'য়ে গেছি!······আমার কিচ্ছু ভাল লাগে না—বুকটার ভেতর কেবল তারই অভাব অনুভব করি। আমার রাত্রে ঘুম নেই, মুখে রুচি নেই—আমার ধ্যানধারণা সবই তাকে ঘিরে। আমার এই জমিদারীর বিনিময়েও তাকে আমার চাই। তোমার কাছে আমি চিরদিনই কেনা হ'য়ে থাকব—আমার এই উপকারটুকু তুমি করো ভাই!···

বলিতে বলিতে শোভেন্দ্র হাত বাড়াইয়া শশীর হাতখানি চাপিয়া ধরিল। শশী সুযোগ বুঝিয়া ব্যস্তভাবে বলিল—কেন আপনি শুধু শুধু ব্যস্ত হ'চ্ছেন?······শশীর কাছে এ অতি তুচ্ছ কাজ। আপনার নিমক খেয়েছি—খাচ্ছি। আমার জীবন দিয়েও এ কাজে আপনাকে আমি সাহায্য ক'রব।

অধীরভাবে শোভেন্দ্র বলিল—শুধু সাহায্য নয়—তাকে—

—হাঁ হাঁ—তাকে আপনার হাতে তুলে দেবই—এই আমার প্রতিজ্ঞা।

আবেগে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শোভেন্দ্র বলিল—তোমার ঋণ এ-জীবনে আমি আর শোধ ক'রতে পারব না শশী—তুমিই আমার অসময়ের বন্ধু।···

বলিয়াই নিজের হাত হইতে মূল্যবান আংটিটি খুলিয়া শশীকে দান করিল।

শশী প্রথমে একটু আপত্তি করিল—কিন্তু সে-আপত্তি যে তাহার মৌখিক মাত্র—শোভেন্দ্রও হয়ত তাহা বুঝিল। যাহা হৌক, শোভেন্দ্রের বিশিষ্ট অনুরোধে শশীর আপত্তি টিকিল না। আংটিটি তাহাকে লইতেই হইল।

শোভেন্দ্র বুঝিল যে, শশীকে সে জয় করিতে পারিয়াছে আর শশীও বুঝিল, কথাগুলি তাহার বেড়ে লাগসই হইয়াছে। মনে মনে শশী বলিল—বেঁচে থাক্ কামধেনুর দল, তোমাদের এ-রকম সুমতি না হ'লে আমাদের মত গরীবদের চ'লবে কিসে?

ঘড়িতে ঢং করিয়া একবার বাজিল। রাত সাড়ে দশটা।

দরজার উপরেই দেয়ালে ঘড়ি। ঘড়ির দিকে তাকাইয়াই চিন্তিত-মুখে শোভেন্দ্র বলিল—বুঝেছ শশী, মুকুন্দ কিছুতেই এক্সপ্রেস্ ধ'রতে পারেনি, হয়ত কালই আসবে। কি করা যায় বলত? বড় ভাবিয়ে তুল্লে দেখছি···কল্‌কাতায় কাউকে কি পাঠালে······

শোভেন্দ্রের মুখের কথা মুখেই রহিল। তাহার মুখের চিন্তার রেখা সরিয়া গিয়া বিমল হাস্যে সমস্ত মুখখানা ভরিয়া গেল। বাইশ তেইশ বছরের একটি সুদর্শন হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর-কান্তি যুবক ঘরে ঢুকিয়াই শোভেন্দ্রকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল, বলিল—কি ব্যাপার বলুন ত? হঠাৎ টেলিগ্রাম—আমি ত ভেবেই অস্থির!······সারাটা রাস্তা শুধু ভাবতে ভাবতেই আসছি—কিন্তু আপনার মুখ দেখে ত কোন খারাপ সংবাদ কিছু আছে ব'লে মনে হ'চ্ছে না।······

যুবকটি একটু হাসিল এবং পার্শ্বস্থ একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। মধু পুনরায় দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—সেদিকে

তাকাইয়া শোভেন্দ্র হুকুম করিল—বাবুকে শীগ্‌গির খাবার দিতে বল ঠাকুরকে !······

তারপর আগন্তুক যুবকটির দিকে তাকাইয়া এক গাল হাসিয়া শোভেন্দ্র বলিল—টেলিগ্রামে শুধু খারাপ খবরই যায় আর ভাল খবর যেতে নেই —এই-ই কি তোমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে আছে না কি ?······যাই হোক —তুমি অনেক দিন বাঁচবে, এইমাত্র তোমার কথাই হচ্ছিল।······যাক্, সে কথাবার্ত্তা পরে হবে'খন—তুমি চট্‌ ক'রে হাত মুখ ধুয়ে আগে খেয়ে নাও ত—রাত যথেষ্ট হ'য়েছে।

আগন্তুক যুবকের নামই মুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।······মুকুন্দ বলিল—সেজন্যে আপনার মোটেই ব্যস্ত হ'তে হবে না। ট্রেণ থেকে নেমে নৌকোয় ওঠার আগেই রেলওয়ে রেস্তরা থেকে দিব্যি এক পেট খেয়ে নিয়েছি। শুধু একটু চায়ের ব্যবস্থা কর মধু !······

শোভেন্দ্র বলিল—আরে তা'ও কি হয় হে ?······তোমার জন্যে খাবার তৈরী ক'রে রেখেছে যে। যা পার কিছু খাও।······আবার লজ্জা-টজ্জা ক'রছে না ত তোমার ?

মুকুন্দ বিস্ময়ের সহিত বলিল—কি যে বলেন তার ঠিক নেই। আপনার বাড়ীতে আমার লজ্জা—এইবারই আমায় হাসিয়েছেন ! আপনার খাচ্ছি না ত খাচ্ছি কার ?···এখন ব্যাপারটা কি বলুন ত ? খবরটা না শোনা পর্য্যন্ত যে স্থির হ'তে পারছি না।··· তারপর শশীবাবু, নমস্কার !···খবর কি আপনার ? কবে এলেন ক'লকাতা থেকে ?···ভাল আছেন ত ?······

শশী বলিল—এই ত দিন দুই হ'ল এসেছি। তারপর, আপনার

খবর ভাল সব? শ্রীনগরে বোধ হয় বহুকাল বাদে এলেন, না?···

মুকুন্দ বলিল—বহুকাল আর কই? এই ত মেডিক্যাল কলেজে ঢুকবার আগেই একবার এসেছিলাম। সঙ্গে ছিলেন কর্ত্তাবাবু—ওঃ, তিনি বেঁচে থাকলে আজ······

মুকুন্দ একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, আপন মনেই বলিল —সত্যি তিনি ছিলেন গরীবের মা-বাপ,—তাঁর ঋণ······

মধু চা ও খাবার আনিয়া হাজির করিল। মুকুন্দ সেদিকে একবার তাকাইয়াই চমকিয়া উঠিল, বলিল—আরে বাপ্‌রে, এত খাবার এখন খাবে কে?······বেশ আক্কেল ত তোমার দেখ্‌ছি মধু!······তুমি বোধ হয় ভেবেছ যে, কল্‌কাতা থেকে যখন আস্‌ছি—নিশ্চয়ই তখন একটা রাক্ষস পেটে ক'রে এনেছি, কি বল?

শোভেন্দ্র সিগার-কেশ্‌ হইতে একটি সিগারেট ধরাইয়া কেশ্‌টি শশীর দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া কি যেন তাহাকে ইসারা করিল, তারপর মুকুন্দের দিকে তাকাইয়া বলিল—ও আর এমন বিশেষ কি!······রাস্তায় এমন বিশেষ কিছু আর খেয়ে আসনি নিশ্চয়ই—আস্তে আস্তে খেয়ে ফেল। তোমরা আর দু'দিন বাদে রোগের রোজাগিরি ক'রবে—রোগের ভয়ে সামান্যতেই এতটা ঘাব্‌ড়ে যাও কেন?···

মৃদু হাসিয়া মুকুন্দ শোভেন্দ্রের দিকে তাকাইয়া বলিল—তাই ব'লে এত? আচ্ছা বেশ, কতদূর পারি, দেখি চেষ্টা ক'রে!···

শোভেন্দ্র বলিল আস্তে আস্তে ব'সে ব'সে খাও—ব্যস্ত হ'বার দরকার নাই, গাড়ী ত আর ফেল হ'চ্ছে না! খেয়ে ছাদের দিকে এসো।

অদৃষ্টের পাঁচালী

— আমি একটু পায়চারী ক'রছি, বুঝেছ ?—বলিয়াই সে শশীকে ইসারা করিয়া উঠিয়া পড়িল। শশীও আড়মোড়া খাইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

মিনিট কয়েক বাদেই রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে মুকুন্দ ছাদে গিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার উপস্থিতির পূর্ব্বেই শোভেন্দ্র ও শশীর চুপি চুপি কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল। আকাশে মেঘ নাই—এক কোণে এক টুকরা চাঁদ—কিন্তু সারা আকাশ ভরিয়া কে যেন তারার মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছে।

শোভেন্দ্র বলিল—ব'স মুকুন্দ।

মধু চেয়ার আগাইয়া দিয়া সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল। মুকুন্দ বসিল।

নদীর দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া যেন অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা করিয়া এবং স্বীয় সঙ্কল্প স্থির করিয়া লইয়াই শোভেন্দ্র সমস্ত জড়তা কাটাইয়া বলিল—শোন মুকুন্দ—যে জন্যে তোমায় খবর দিয়ে আনিয়েছি।

সবিনয়ে মুকুন্দ বলিল—বলুন। শোভেন্দ্রের কণ্ঠস্বরে এমন একটা অস্বাভাবিকতা ছিল যে, মুকুন্দ'র বুকের ভিতরটা যেন কাঁপিয়া উঠিল।... কি খবরই যেন বলিবে······

—তোমায় একটি অভিনয় ক'রতে হ'বে মুকুন্দ !···

মুকুন্দ বিস্মিত হইল, বলিল—অভিনয় ? কিসের অভিনয় ?···কোনও থিয়েটার ক'রছেন বুঝি আপনারা ?···

শোভেন্দ্র কথাগুলি যেন চিবাইতে চিবাইতে বলিল—হ্যাঁ, অনেকটা সেই রকম, মানে·········

সরল-হৃদয় মুকুন্দ হাসিয়া ফেলিল, বলিল—আপনার কথা ত আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আপনি ত জানেন, থিয়েটারে যোগ দেওয়া

দূরে থাক্, কোনও এমেচারদের থিয়েটারও আমি এড়াতে পারলে দেখতে পর্য্যন্ত যাই না।

শোভেন্দ্র কোমল কণ্ঠে বলিল—কোনদিন মানুষ যে-কাজ করেনি—তা কখনও কোনদিনই ক'রতে নেই—এমন বাঁধাধরা আইন কিছু আছে?…

—আজ্ঞে—তা অবশ্য নয়।

—বেশ, তবে শোন, তোমায় খুলেই ব'লছি। সামনের ২৩শে তারিখে আমার জমিদারীর এলাকাতেই কালীদ'র চন্দ্রশেখর মুখুয্যের মেয়ে সাবিত্রীর সঙ্গে বিয়ে হবে বিকাশ বাঁড়ুয্যে নাম ক'রে একটি ছেলের। ২৪ পরগণার বেলঘরের প্রকাশ বাঁড়ুয্যের ভাই হ'চ্ছে বিকাশ। প্রকাশের পার্ট টা নিয়েছে শশী—আর তার ভাই বিকাশের পার্ট টা তোমায় ক'রে দিতে হ'বে।

মুকুন্দ অস্ফুটে বলিল—অভিনয়? তার মানে?…

মৃদু হাসিয়া শোভেন্দ্র বলিল—সবই বুঝিয়ে দিচ্ছি ভাই—ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন? …কিচ্ছু চিন্তার নেই তোমার এর ভেতর—

—বলুন!—

—মেয়েটি পরমাসুন্দরী—সংসারে মা বাপ ভাই বোন কেউ নাই—। আত্মীয়ের মধ্যে এক মামা—সেও বিদেয় ক'রতে পারলেই বাঁচে। তার—

কথা শেষ করিতে না দিয়াই মুকুন্দ বলিল—কিন্তু আমি যে স্থির ক'রেছি ফাইনালটা না দিয়ে কিছু ক'রব না—আপনি কেন হঠাৎ…

শোভেন্দ্র শশীর দিকে আড় চোখে চাহিয়া সোজা হইয়া বসিল। মুকুন্দ

অন্ধকারে ভাল করিয়া শোভেন্দ্রের মুখ দেখিতে পাইল না। পারিলে হয়ত এতক্ষণে এই কথাগুলি অতি সহজেই তাহার বোধগম্য হইত।

শোভেন্দ্র গলার স্বর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া বলিল—শোন মুকুন্দ—Be serious, তুমি কখনও থিয়েটার দেখেছ ?...

—তা দেখেছি বই কি ?...

...আচ্ছা বেশ, থিয়েটারে যারা স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করে, তারা কি সত্যই স্বামীস্ত্রীর বাঁধনে বাঁধা পড়ে ?...

—তা কেন প'ড়বে ?......

—বেশ, তারা যে দু'চার ঘণ্টা 'ষ্টেজের' ওপরে থাকে ততক্ষণই তারা স্বামী-স্ত্রী, ষ্টেজ্ থেকে বেরুলেই কোন সম্পর্ক নেই, কি বল ?...

মুকুন্দ বলিল—আজ্ঞে, তা বৈ কি।...

শোভেন্দ্র একটি সিগারেট ধরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল—আচ্ছা, এমনি ধারা একটি স্বামীর অভিনয় ক'রছ মনে ক'রে যদি......

বাধা দিয়া মুকুন্দ বলিল—আপনি দয়া ক'রে খুলেই বলুন, কি রহস্য এর ভেতর ?......

হাসিয়া শোভেন্দ্র বলিল, তোমার মাথা ত পরিষ্কার ব'লেই জানতাম মুকুন্দ। এই সোজা কথাটা কেন যে তোমার মাথায় ঢুকছে না, বুঝলাম না! ক'লকাতা থেকে তোমায় wire ক'রে এনেছি একটা Roll'এ অভিনয় ক'রতে। আমার অনুরোধ, সেই Roll'টিতে অভিনয় ক'রে তুমি চলে যাও। তোমার কোনও দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা বা কোনও কিছু ঝক্কি—কিছুই নেই।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিয়া মুকুন্দ বলিল—এ ত থিয়েটারে হ'লেও সম্ভব হ'ত। কিন্তু বিকাশের ভূমিকায়ই বা আমায় থিয়েটার ক'রতে হ'বে কেন—আর বিয়ে ক'রেই বা তাকে ছেড়ে যেতে হ'বে কেন?……

দগ্ধপ্রায় সিগারেট্টা ফেলিয়া দিয়া শোভেন্দ্র বলিল—ব'লেছি ত তোমায় স্রেফ্ অভিনয়। বেলঘরের প্রকাশ বিকাশ—চিরদিনের মত দুনিয়া থেকে লুপ্ত হবে…আর সাবিত্রী?—হ্যাঁ সাবিত্রার সঙ্গেও বিকাশের সম্পর্ক চিরদিনের মত মুছে যাবে। বিয়ের ঐ এক রাত্তির আর পরের দিনটার যা সম্পর্ক।……

এতক্ষণে মুকুন্দ ব্যাপারটা কিছু অনুমান করিল, বলিল,—কিন্তু একে কি আপনি অভিনয় বলেন?

—অভিনয় বৈ কি? এ সংসারটাই ত একটা প্রকাণ্ড রঙ্গমঞ্চ মুকুন্দ। এখানে কে না অভিনয় ক'রছে?…

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া নম্রকণ্ঠেই মুকুন্দ বলিল—তাতে লাভ? অবশ্য ক্ষমা ক'রবেন আমায়—কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞেস না ক'রেও পারছি না।

শোভেন্দ্র একটু উত্তেজিত হইয়াই বলিল—লাভ? হ্যাঁ, লাভ তোমার কিছু নেই বটে, খুবই সত্যি কথা মুকুন্দ, আমার আছে। কিন্তু এর বেশী আর তুমি কিছু জানতে চেয়ো না।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিল।

তারপর কথা বলিল মুকুন্দ। নিতান্ত অপরাধীর মত ধরাগলায় বলিল—কিছু যদি না মনে করেন তবে একটি কথা ব'লি।

—বেশ, বল!

—ছেলে বেলায় মা-বাবা হারিয়েছিলাম—না ছিল ঘর দোর, না ছিল আত্মীয়-স্বজন। মা-বাবা কি জিনিস তা ভাল ক'রে বুঝবার আগেই তাঁরা চ'লে গেলেন স্বর্গে, আমায় একা ফেলে। জ্ঞান হ'বার সঙ্গে সঙ্গে টের পেলাম কাকে বলে পিতৃস্নেহ; আপনার বাবা আমায় বুকে তুলে নিয়ে ছেলের মতই মানুষ ক'রেছেন—আর সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত আপনাদেরই অন্নে আমি মানুষ। আপনার টাকায় আজ আমি এম্ বি, পড়বার সুযোগ পেয়েছি। তাই ব'লছিলাম, আপনার বিরুদ্ধাচরণ ক'রবার সাহস আমার নেই।

শোভেন্দ্র সহজ কণ্ঠে বলিল—বেশ, তা যদি মনে কর—আর কোনদিন তোমার কিছু উপকার আমাদের দ্বারা হ'য়েছে—এটা যদি মনে কর—তাহ'লে যা ব'লছি, তাই করো। এতে যে শুধু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হবে তা নয়—আমার উপকারও করা হবে। অবশ্য তোমায় লোভ দিচ্ছি না বটে—তবে পুরস্কার স্বরূপ তোমায় মাসহারা যা পাচ্ছ—তা বাদেও এককালীন দু'হাজার টাকা দেব।

মুকুন্দর কান্না আসিতে লাগিল। বলিল—দেখুন, আপনার কথার উত্তর দেওয়া আমার উচিত নয়—কিন্তু আমার ঔদ্ধত্য ক্ষমা ক'রবেন—আমায় টাকার প্রলোভন দেবেন না। টাকা কবে—কোন্ মাসে আপনার কাছ থেকে না পাচ্ছি?......আমার ভবিষ্যৎ যা কিছু গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা ক'রছি—সবই ত আপনার টাকায়।

শোভেন্দ্র বিরক্তভাবেই বলিল—ও-সব আজে-বাজে কথা রাখ মুকুন্দ। আমি বড় আশা ক'রে তোমায় এনেছি—এ কাজটুকু তোমায় ক'রে যেতেই হবে। শশী সাবিত্রীর মামার সঙ্গে সবই ঠিক ঠাক ক'রে এসেছে

—মাঝে মাত্র আর তিনটে দিন আছে।—তোমার এ-বিয়ে ক'রে যেতেই হবে। তবে এটুকু তোমায় খুলেই ব'লছি তোমার কোনও ঝক্কি নাই—তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

মুকুন্দ স্বীয় সঙ্কল্প স্থির করিয়া দৃঢ় অথচ সহজ কণ্ঠেই বলিল—দেবতা সাক্ষী ক'রে দশের সমক্ষে বিয়ে যদি আমায় ক'রতেই হয়, তবে বিনা অপরাধে একটি মেয়েকে আমি জন্মের মত ত্যাগ ক'রে যেতে পারব না। একটা জীবন চিরদিনের মত নষ্ট ক'রে দেবার অধিকার আমার নেই—আমায় আপনি ক্ষমা করুন। আপনিও ভেবে দেখুন—একটা সারা জীবন ছু'ঘণ্টার অভিনয় নয়।

শোভেন্দ্রের চোখে হঠাৎ যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু পর মুহূর্তেই সে নিজেকে সামলাইয়া লইল। কণ্ঠকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া জোর করিয়া হাসি টানিয়া বলিল—তুমি এইবারই হাসিয়েছ মুকুন্দ! তুমি যা মনে ক'রছ, তা নয়।—তোমায় আর ভেঙ্গে কি ব'লব—সাবিত্রী আমার অপরিচিত নয়। দীঘির ঘাটে বজরার ভেতর আরও ছু'চারবার দেখাশুনা হ'য়েছে। তোমায় আর লুকিয়ে কি হবে—আমার চরিত্র ত তুমি জানই। যাই হোক্—সে আমায় ভালবাসে—সে চায় আমাকে। সে বামুনের মেয়ে, আমি কায়স্থ অন্তরায় এইটুকু। সমাজ শুনবে না—অন্যভাবে কিছু ক'রতে গেলে পুলিশ হাঙ্গামা হ'তে পারে—নানা ভেবে চিন্তে—তোমায় শিখণ্ডী খাড়া ক'রছি।—তুমি অনায়াসেই রাজী হ'তে পার, তোমার কিছুই অন্যায় করা হবে না।

মুকুন্দ বসিয়া বসিয়া ঘামিতে লাগিল। চিন্তা করিবার শক্তিও তাহার লোপ পাইল।···বিচিত্র এই সংসার—বিচিত্র নর-নারী······

সুযোগ বুঝিয়া শোভেন্দ্র বলিল—আর এটাও ঠিক্ যে, আমরা উভয়-পক্ষই যখন রাজী—তখন শিখণ্ডীর অভাব নিশ্চয়ই হবে না। সাবিত্রীকে আমার চাই-ই।

শোভেন্দ্রের মুখোস যেন এতক্ষণে সত্যই খসিয়া পড়িল।

মুকুন্দর চোখ দুইটি জ্বালা করিতে লাগিল। নিষ্ফল আক্রোশে যেন নিজেই সে তাহার সমস্ত সত্ত্বার গলা চাপিয়া ধরিল। রুদ্ধকণ্ঠে অসহায়ের মত সে বলিয়া ফেলিল—এ ছাড়া আপনি আমায় যে কোনও কাজের ভার দিন—তা যত কঠিনই হোক্—আমি মরতেও ভয় পাব না জানবেন। কিন্তু, এ-কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হ'বে না।

এ প্রত্যাখ্যান শোভেন্দ্র মুকুন্দর নিকট আশা করে নাই। মদের ঝোঁকে থাকিলে এতক্ষণ কি হইত বলা যায় না। কিছুক্ষণ গুম্ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শোভেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—আচ্ছা, অগ্রপশ্চাৎ ভেবে চিন্তে দেখ মুকুন্দ—কাল ভোরেই আমি শেষ জবাব চাই। আর এটাও মনে ক'রে রেখ—জমিদার শোভেন্দ্র নারায়ণের ইচ্ছা বা কথা পাগলের প্রলাপ নয়। এ ব্যাপার অতি তুচ্ছ তার কাছে।

বার

একই ঘরে পাশাপাশি দুই বিছানা। ওপাশে শুইয়াছে শশী—এ পাশের বিছানায় মুকুন্দ। মুকুন্দ মনে মনে ভাবিল, শয্যার এ-ব্যবস্থা হয়ত শোভেন্দ্রের পরামর্শ অনুযায়ীই হইয়াছে।

বিছানায় শুইয়া মুকুন্দ কত কি ভাবিতে লাগিল—কিন্তু আকাশ-পাতাল চিন্তা করিয়াও কূল-কিনারা কিছু পাইল না। তাহার মাথার মধ্যে আগুন যেন দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

নবীন জমিদার শোভেন্দ্র রায়ের কীর্তিকথা ইহারই মধ্যে তাহার কানে কিছু কিছু গিয়াছে। লোকটি যে শুধু মাতাল আর অসৎচরিত্র তাহাই নয়, —শয়তানী বুদ্ধিতেও অদ্বিতীয়। ডাকিয়া আনিয়া এ কি মহাফ্যাসাদে ফেলিল তাহাকে! একটি মেয়ের সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন তিনি নিজে —আর তার মূল সহায়ক হইতে হইবে কি না তাহাকে! এও কি সম্ভব?······

মুকুন্দ ভাবিতে লাগিল—সত্যই কি সে মেয়েটা দুশ্চরিত্রা?···অথবা শোভেন্দ্র তাহার দুষ্ট উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্যই তাহাকে হাতে রাখিবার অভিপ্রায়ে এই নূতন অলঙ্কারটি সেই মেয়েটার অঙ্গে পরাইয়া দিল?···

মুকুন্দ ভাবিয়া স্থির করিল - না, কিছুতেই নয়—এ ব্যাপারে কিছুতেই সে নিজেকে জড়াইবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল।…শোভেন্দ্রের 'এষ্টেট্' হইতে মাসহারার টাকা বন্ধ হইলে ডাক্তারী পড়ার আশা মাঝপথেই ছাড়িতে হইবে—আর তাহার কথানুযায়ী এ কাজ করিবার কল্পনা যে সম্পূর্ণ অমানুষিক—ইহাও ত ধ্রুব সত্য।

মনটা তাহার অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল…

পরক্ষণেই নিজেকে মনে মনে যেন রূঢ়ভাবে সে নিজেই বলিয়া উঠিল, কিন্তু তাই বলিয়া ভদ্র-সন্তান হইয়া একটি মেয়ের সর্ব্বনাশ করিতে হইবে? স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহাকে অপরের লালসার সামগ্রী হিসাবে তুলিয়া দিতে হইবে?……

মুকুন্দর সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সমস্ত চিন্তা দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া সে মনে মনে বলিল—না, কিছুতেই এ সর্ব্বনাশা অভিনয় করা হইবে না, তাহাতে অদৃষ্টে যাহা আছে—তাহাই হউক। পাপের পয়সার বড় হওয়ার চেয়ে ছোট থাকাই শতবার কাম্য।……

ওদিকে শশীর বোধ হয় একই দশা।

এপাশ ওপাশ ফিরিয়া একটা হাই তুলিয়া শশী বলিল—ও মুকুন্দ,—মুকুন্দ—ঘুমুলে নাকি ভাই?……

মুকুন্দ মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও চাপিয়া রাখিয়া বলিল—ঘুমের আর দোষ কি দাদা—তাকে না আসতে দিলে জোর ক'রে কেমন ক'রে আসবে সে?……

ঈষৎ হাসিয়া শশী বলিল—আমারও, ঐ একই দশা—তারপর, ভেবে-চিন্তে কিছু স্থির ক'রলে ভাই? কি—রাজী ত?

মুকুন্দ ঝাঁঝাল স্বরে বলিল—দেখুন শশীবাবু, অপ্রিয় কথা বারবার ব'লতে ভালও লাগে ও না—ব'লতেও ইচ্ছে করে না। মনগড়া গল্প নিয়ে অভিনয় করা চলে—কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ—তাকে নিয়ে অভিনয় করা আপনাদের অভ্যাস থাকতে পারে, আমার নেই। এর ভেতর আমাকে জড়াতে আপনারা কেন যে উঠে প'ড়ে লেগেছেন, বুঝতে পারছি না।

মৃদু হাসিয়া শশী বলিল—আরে ভাই, তুমিও যেমন! আমার কি জান ভাই?—আমি গরীব মানুষ—আমার চাই পয়সা। পয়সা রোজগার আমাকে ক'রতে হ'বে—তা সদুপায়েই হোক,—আর অসদুপায়েই হোক? পয়সা নিয়ে মানুষ থিয়েটারে 'এ্যাক্ট' ক'রে আসে—এ'ও না হয় তাই মনে ক'রে নিলাম। কি ব'ল? চারদিকে অত দেখে শুনে, অত বিচার ক'রে কি দুনিয়ায় বাস করা চলেরে ভাই?···

মুকুন্দ'র মাথায় যেন আগুন জলিয়া উঠিল। সে উঠিয়া বসিল, বলিল —তাই ব'লে কি আপনি ব'লতে চান—

শশী বাধা দিয়া মোলায়েম সুরে বলিল—আহা-হা ভুল বোঝ কেন ভাই?···আমি কেন ব'লতে যাব?···আমার কি অধিকার আছে? আমি কে?···তোমাকে যেমন খবর দিয়ে এনেছে—আমাকেও ত তেমনিই।

মুকুন্দ বলিল—কিন্তু আমাকে আবার কেন আপনি এর ভেতর জড়ালেন?

শশী উঠিয়া বসিল, বলিল—আরে রামচন্দ্র—দুর্গা-শ্রীহরি! আমি

কেন তোমায় জড়াতে যাব? শুধু শুধু কেন এ কথাটা তুমি ভাবছ?··· শোভেন্দ্রইত বল্‌লে তোমার কথা। ও-ই ত তোমায় ভার ক'রেছে।

তারপরই স্বর নামাইয়া বলিল—তোমার-আমার দ্বারা কাজটি হাসিল ক'রে নিতে চায়, বুঝেছ না?······বে'র পর দমদম ষ্টেশনে নেমে মোটরে চাপা আর বেলঘ'রে যাওয়া পর্য্যন্ত তোমার আমার দায়িত্ব।··· কিন্তু ভাই, টাকা কিন্তু মোটা হাতে মেরে নেওয়া যাবে এই ফাঁকে।

মুকুন্দ শুধু বলিল—হুঁ।

অন্ধকারে শশী মুকুন্দর মুখ দেখিতে পাইল না। শশী ভাবিল, টাকার কথায় হয়ত মুকুন্দর মন ভিজিয়াছে, বলিল—আর তুমি ভেবে দেখ ভাই —স্বয়ং ভগবানই আমাদের দ্বারা এ কাজ করাচ্ছেন। তাঁরই ইচ্ছায়— মানে, তাঁরই যোগাযোগে সব কিছুই হয়, নইলে তুমি ত শিক্ষিত ছেলে —লেখাপড়া ক'রছ—তুমিই ভেবে দেখ ভাই, এ মেয়ের ভাল-মন্দ ক'রবার ক্ষমতা কি তোমার আমার আছে?···যা ক'রছেন তিনিই ক'রছেন —আমরা ত মাত্র উপলক্ষ্য।

মুকুন্দ দুই হাটু চাপিয়া বসিয়াছিল, গম্ভীর স্বরে বলিল—হুঁ!

শশী বলিল—অথচ দেখ, কর্ত্তার কথায় রাজী না হ'লেই—তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার···আমারও।······

মুকুন্দ কোন কথা না বলিয়াই গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

শশী বলিল—যা বাজার ভাই, এত বড় দাঁওটা কিন্তু হাতছাড়া করা কোন-মতেই উচিত নয়। শোভেন্দ্রের এ কাজ উদ্ধার ক'রে দিতে পারলে ওকে কিন্তু একেবারে কিনে রেখে দেওয়া যাবে, তা বুঝতে পেরেছ?··· ···পাঁচ হাজার হেঁকেছে আর কোন্ না দু' এক হাজার বক্‌শিশও

হ'য়ে যাবে।......এত বড় মারটা ছেলেমানুষী ক'রে ছেড়ে দিও না মুকুন্দ !

মুকুন্দ যেন খোঁচা খাইয়া জলিয়া উঠিল, বলিল—দেখুন শশীবাবু, আপনি বড় ভাই'এর মত—আপনাকে আর বিশেষ কি ব'লব ! যে রকম societyতে আপনারা মেশেন তেমনিই গ'ড়েছেন নিজেদের রুচি। যে শয়তান আপনাদের এ দুর্ব্বুদ্ধি দিয়েছে সেই আপনার মুখে এই সব কথা যুগিয়েছে। আশ্চর্য্য প্রবৃত্তি ! বলিহারি আপনাদের !......একটি ভদ্রলোকের মেয়ের সর্ব্বনাশ ক'রতে আপনারা যে-ফন্দি এটেছেন তাতে আপনাদের তারিফই ক'রতে হয়। আমার মন ভেজানর জন্যে যথেষ্ট রকম উপদেশ দিয়েছেন—এখন আমার অনুরোধ, দয়া ক'রে ভবিষ্যতে এই সব উপদেশ আমায় আর দিতে আসবেন না, আপনাকে আমি চিনি।

—চেন, ভাল কথাই ! বলিয়া শশী আপন মনে কি বিড়বিড় করিতে করিতে শুইয়া পড়িল।

মুকুন্দও তাহার বিছানায় শুইয়া যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়াই পড়িয়া রহিল। বিষম তিক্ততায় তাহার সমস্ত মনটা যেন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে !

ঘণ্টার পর ঘণ্টা গড়াইয়া চলিল, মুকুন্দ দুই চোখের পাতা এক জায়গায় করিতে পারিল না। সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া যতবারই সে মনস্থির করিতে চেষ্টা করে ততবারই যেন অশান্তির আগুন উঁকিঝুঁকি মারিতে থাকে। শেষরাত্রে অবসন্নচিত্ত মুকুন্দর তন্দ্রা আসিল।

তন্দ্রার ঘোরে সে স্বপ্ন দেখিল—সে যেন বিবাহ করিতেছে। বিবাহের রাত্রে বরের বেশে সে দাঁড়াইয়া, আর তাহাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া

তাহারই গলায় বরমাল্য দান করিতেছে অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে। মুখখানা তার অতীব সুন্দর—বিষন্ন—কিন্তু ঔজ্জ্বল্য ও পবিত্রতা যেন সারামুখখানিতে বিরাজ করিতেছে। আয়ত চোখ দু'টিতে নীরব ভাষা—পরম নির্ভরতার একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত যেন চোখ দুটিতে রহিয়াছে।···

···মুকুন্দ নিজের গলা হইতে মালাটি খুলিয়া বধূর গলায় পরাইয়া দিল। তাহার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ তৃপ্তির উল্লাসে ভরিয়া গেল। মনে হইল—জীবন সত্যই ধন্য।······তারপর বিবাহের সময় আসনে বসিয়া যখন তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করা হয়—তখন মুহূর্তে কোথা হইতে আসিল কালবৈশাখীর ঝড়। চারিদিকে হৈ চৈ—চিৎকার উঠিল। তখন হতবাক্ সে—চাহিয়া দেখিল—ভীতা ত্রস্তা বধূ যেন পরম নির্ভরতার সহিত বিপন্নার মত তাহার দিকে তাকাইতেছে।······মুহূর্তে আলোগুলি যেন নিভিয়া গেল—সুরু হইল ঝড়ের মাতামাতি। ঝড়ের মধ্যে বধূর হাত ধরিয়া সে অসহায়ভাবে দাঁড়াইয়া, ঠিক এমনি সময়ে জোর করিয়া তাহার বাহুপাশ হইতে কাহারা যেন বধূকে ছিনাইয়া লইয়া গেল। অস্পষ্ট আঁধারেও মুকুন্দ চিনিল—তাহাদের পুরোভাগে জমিদার শোভেন্দ্র নারায়ণ রায়।······মুকুন্দ চিৎকার করিতে গেল, পারিল না,—গলা দিয়া একেবারেই স্বর বাহির হইল না। কণ্ঠ যেন চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ······দৌড়াইয়া ধরিতে গেল—এক পা'ও নড়িতে পারিল না।······শুধু অসহায়—নিতান্ত অসহায়ের মত অন্ধকারের মধ্যে সে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।······একা—শুধু একা—কেউ কোথাও নেই—সম্পূর্ণ অসহায় সে·········

তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। মুকুন্দ ঘুমের ঘোরে চমকিয়া প্রায় লাফাইয়া

উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিল—স্বপ্ন—শুধু স্বপ্ন।……তাহার একটু হাসিই পাইল।…মনে মনে বলিল—মানুষ স্বপ্নে কি সব অদ্ভুতই না দেখতে পায়!…কিন্তু আশ্চর্য্য বটে!…

সে আবার পাশ ফিরিয়া শুইল।

ঘুম যখন ভাঙ্গিল তখন সকালের প্রথম রোদ জানালার ফাঁকে ফাঁকে ঘরের মধ্যে উঁকি মারিতেছে। মুকুন্দ চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বসিল এবং দরজার দিকে তাকাইয়া যেন একটু অবাক হইয়া গেল। দেখিল, শোভেন্দ্র দরজার কাছেই চেয়ারে বসিয়া সিগারেট্ টানিতেছে—আর সহচর শশী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া কি যেন তাহাকে বলিতেছে। মুকুন্দর সর্ব্বাঙ্গ একেবারে জ্বলিয়া উঠিল।

মুকুন্দকে খাট হইতে নামিতে দেখিয়াই শোভেন্দ্র সোজা হইয়া বসিল, বলিল—এই যে মুকুন্দ—আমি তোমারই অপেক্ষা ক'রছিলাম। আচ্ছা, হাতমুখ ধুয়ে আগে চা খেয়ে নাও—তারপর কথাবার্ত্তা হবে'খন।

মুকুন্দ বলিল—সে সব পরে হবে'খন—বলুন না আপনি!

শোভেন্দ্র আড়চোখে চাহিয়া বলিল—কি ঠিক ক'রলে?

মুকুন্দ নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া শোভেন্দ্র ঘুরিয়া বসিয়া ডাকিল—শশী!…শশী কাছেই ছিল, বলিল—আজ্ঞে—

—মুকুন্দর মুখ থেকে এখুনি আমি শেষ জবাব চাই—সে পারবে কি না!—অবশ্য আমার জন্যে যে স্বার্থত্যাগ ও ক'রবে—তার জন্যে আমি তাকে এক কালীন পাঁচহাজার টাকাই দেব, আর তার মাসহারা এ মাস থেকে একশ' টাকা ক'রেই সে পাবে।…ভেবে দেখ্‌তে গেলে আমার

টাকার অঙ্কটাও কিছু খাটো নয় শশী।...কেবল একটা জে: প'ড়েই না...

শশী বলিল—নিশ্চয়—নিশ্চয়।—সে কথা আর ব'লতে...আমি ' মুকুন্দকে কাল রাত্রেই সব ভেঙ্গে বুঝিয়ে বলেছি—। আমরা ত মা: উপলক্ষ্য—এতে আর বিশেষ কিছু...

ধীর গম্ভীর স্বরে মুকুন্দ বলিল—দেখুন, এক কথাই আপনাকে আমি একশ'বার ব'লতে বাধ্য হ'চ্ছি কিন্তু নিরুপায় হ'য়ে।...টাকার প্রত্যাশী আমি নই, আমায় দয়া ক'রে অত লোভ দেখাবেন না। আপনার টাকা—আপনাদের সাহায্য না পেলে খড়ের মত স্রোতের মুখে কোথায় ভেসে চ'লে যেতাম, কিন্তু তাই ব'লে আমিও ত একটা মানুষ। বিবেক ব'লে একটা জিনিষ সবারই থাকে, ধনী নির্ধন সবারই। কাল সারারাত বিবেকের সঙ্গে লড়াই ক'রেছি—পারি নি তাকে বোঝাতে। আপনার দোহাই—এ পাপ থেকে আমায় নিষ্কৃতি দিন।—আমার আর......

মুকুন্দ নতমুখে দাঁড়াইয়া যেন কাঁপিতে লাগিল। কথাগুলি যেন মরিয়া হইয়াই সে বলিয়া ফেলিল। ইহার পর আর যুক্তি বা তর্ক চলে না। শোভেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের মধ্যে অধীরভাবে বারদুই পায়চারী করিয়া মুকুন্দর দিকে স্থিরনেত্রে তাকাইয়া গম্ভীর স্বরে বলিল—তা হ'লে তুমি রাজী নও?

মুকুন্দ 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বলিতে পারিল না।

ক্ষণকাল স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শোভেন্দ্র বলিল—দেখ মুকুন্দ, ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে।...ঠিক এমনি ভাবে আমার সুমুখে দাঁড়িয়ে

কথা ব'লবার সাহস তোমার আছে—এ আমার জানাই ছিল না। তুমি বোধ হয় ভুলেই গেছ—কার সুমুখে দাড়িয়ে কথা ব'লছ!—তোমার নিজের ভবিষ্যৎ আমারই হাতের মুঠোয়—সেটাও বোধ হয় একেবারে ভুলে যাও নি। এখনও ভেবে কথা বল।···একটা এগিয়ে এসে নিরুপায় হ'য়েই তোমায় ব'লছি। মেয়ের মামা—মেয়েটা নিজে—তারাও জানে যে মাঝে একজন, উপলক্ষ্য···

মুকুন্দ মুখ না তুলিয়াই বলিল---এর ভেতরে আমাকে আর টানছেন কেন ?

—শুধু সমাজ—সমাজের চোখে ধুলো দেবার জন্যে।

— কিন্তু তিন কুলে যার কেউ নেই—তার আবার সমাজ কিসের ?

অস্থির ভাবে শোভেন্দ্র বলিল—ছেলে মানুষ তুমি, তোমায় আর কি বোঝাব!···সমাজ ঘুস না পেলেই মুক্তকণ্ঠে গেয়ে বেড়াবে—অমুকের মেয়ে ঘরের বার হ'য়ে গেছে। আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতগোত্র কার না আছে?··· এই জন্যেই ত তারা চাইছে একজন মধ্যস্থ লোক।

কম্পিতকণ্ঠে মুকুন্দ বলিল—আমায় আপনি ক্ষমা করুন···বরং শশীবাবু নিজেই এ দায়িত্ব নিলে ভাল হয়। আমি মনকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না—এ কাজ আমার দ্বারা একেবারেই অসম্ভব।

শোভেন্দ্র চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল এবং একটি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল—হুঁ।

তারপর শশীর দিকে তাকাইয়া বলিল - দেখ শশী, আজ যে অপমান আমায় সহ্য ক'রতে হ'ল, এত বড় অপমান আমায় আর কোনদিন সহ্য ক'রতে হ'য়েছে কি না, জানি না। এত বড় পরাজয় উঃ! সেদিন

মহাদেবের হাতেও এমনি ধারা অপমান আমার হ'য়েছিল না, (হ'য়েছিল আমার পরাজয়।

সুযোগ বুঝিয়া সান্ত্বনার স্বরে শশী বলিল—সে জন্যে কিছু ভাববেন না আপনি, সবই আমি ঠিক ক'রে নেব'খন, আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি···

বিরক্তভাবে শোভেন্দ্র বলিল—রাখো শশী।

তারপর স্বর পরিবর্তন করিয়া যেন নিজেই নিজেকে বলিল—বাবা কত বড় ভুলই ক'রে গেছেন, আর তারই জের টেনে চ'লছিলাম আমি। গরীব—গরীব, গরীবকে দয়া করার মত—তাকে সাহায্য করার মত, তাকে মানুষ ক'রে তোলার মত বড় পাপ এ সংসারে বোধ হয় আর নেই, যেন দুধকলা দিয়ে সাপ পোষা, তা ছাড়া আর কিছু নয়···

শশী গতরাত্রের কথা ভুলে নাই। সুযোগ বুঝিয়া চাটুকরের মতই বলিয়া ফেলিল—আজ্ঞে, সে যা ব'লেছেন।

নইলে সামান্য Street Beggar, ডাষ্টবিনের ময়লা খেয়ে যাদের জীবনে বেঁচে থাকা অভ্যাস, তাদের যাচ্ছিলাম আমি মানুষ ক'রতে, দশের ভেতর একজন ক'রে দাঁড় করাতে—ভদ্রসমাজে চালু ক'রতে। কি ভুল !···

মুকুন্দ নিরূপায় হইয়া কাঠের পুতুলের মতই দাঁড়াইয়া কথাগুলি শুনিল।

রক্তচক্ষু মেলিয়া শোভেন্দ্র কিছুক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া শ্লেষের স্বরে বলিল—মুকুন্দ, পূর্ব্বজন্মে বোধ হয় আমাদের কোন ঋণ ছিল তোমার কাছে। আমি মনে ক'রছি, সে ঋণ আজ এতদিনে

শোধ হ'ল। এবং বোধ হয় তোমারও তাই মনে হ'য়েছে। অতিথি তুমি, এর চেয়ে বেশী তোমায় কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

মুকুন্দ নতমুখে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেদিকে কিছুক্ষন চাহিয়া থাকিয়া শোভেন্দ্র গুরুগম্ভীর স্বরে ডাকিল —মোধো!

মনিবের মেজাজ বুঝিয়া মধু এক লম্বা সেলাম ঝাড়িয়া ধনুকের মত আসিয়া বাঁকিয়া দাঁড়াইল।

শোভেন্দ্র হুকুম করিল—ম্যানেজারকে ডাক্। সদরে কাল মহাদেব চালির মোকদ্দমা আছে, কাগজ পত্র নিয়ে আসতে বল্। আজই একবার সদরে গিয়ে উকীলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তদ্বির ক'রে আসুক।

তারপর চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শশীর দিকে তাকাইয়া বলিল —আমার ঘরে এসো শশী, কথা আছে।

তের

বেলা দশটা। মেঘমুক্ত নির্ম্মল রৌদ্রে সমস্ত আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছে। বড়দলের বিল ছাড়াইয়া একখানি নৌকা ধীরে ধীরে হীরাদীঘিতে প্রবেশ করিল।

দীঘির জলে লাল ফুল হাসিতেছে। ওদিকে [illegible]নে পদ্মফুলগুলি পাপড়ী মেলিয়া পরম আরামে রোদ পোহাইতেছে [illegible]কোচকীর কলরব স্থরু হইয়াছে।

মেয়েদের ঘাটে পাড়ার মেয়েরা স্নান করিতে ও জ[illegible]ইতে আসিয়াছে। এ পাশে পুরুষদের ঘাটে কয়েকটি ছেলে কোমরে [illegible] বাঁধিয়া চিৎকার করিয়া জল ছিটাইয়া ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া দীঘি একে[illegible] মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে।

তাহারই পাশে নৌকা ভিড়াইয়া মাঝি বলিল—এখানেই নামুন কর্ত্তা, ওদিকে রাস্তা। বেশী দেরী ক'রবেন না বাবু—গাঙ্গে কিন্তু এর পর প'ড়ে জোয়ার ঠেল্‌তে হবে।

—না মাঝি, আমার দেরী মোটেই হবে না, আমি যাব—আর আসব বলিতে বলিতে একটি হৃষ্টপুষ্ট স্থদর্শন যুবক নৌকার ছই'এর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং দীঘির পাড়ে লাফাইয়া পড়িল। এই যুবকই মুকুন্দ।

মুকুন্দ এ অঞ্চলে কোনদিন আসে নাই। ডাঙায় নামিয়া চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল এবং ধীরে ধীরে রাস্তার উপরে উঠিল।

ঘাটে ছেলেরা তখন ঝাঁপাঝাঁপি চিৎকার বন্ধ করিয়া 'হা' করিয়া অপরিচিত লোকটির দিকে তাকাইয়া আছে। মেয়েদের ঘাটে ছোট বড় তিনটি মেয়ে ও দু'টি বৌ স্নান করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একটি মেয়ে বিশেষভাবে মুকুন্দর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মুকুন্দ একবারটি মাত্র সেদিকে তাকাইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। কি সুন্দর চেহারা মেয়েটির!

একজন বর্ষীয়সী বিধবা স্ত্রীলোক স্নান করিবার জন্য ওদিক হইতে ঘাটের দিকেই আসিতেছেন। জিজ্ঞাসাবাদ করিবার মত কাহাকেও সম্মুখে না পাইয়া মুকুন্দ ইতস্ততঃ করিয়া তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিল—মা, একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞেস্ ক'রব?

এ পাড়াগাঁয়ে সচরাচর এমন সুন্দর মিষ্টভাষী সুবেশ ছেলে দেখিতে পাওয়া যায় না। মেয়েদের সম্মিলিত কৌতূহলী দৃষ্টি মুকুন্দর উপর নিবদ্ধ। ছেলেটির মুখের 'মা' ডাক বিধবার বড়ই ভাল লাগিল। বলিলেন—তুমি কাকে খুঁজছ? কোন্ বাড়ী যাবে বাবা?

—আমি চন্দ্রশেখর মুখুয্যে মহাশয়ের বাড়ীতে একবারটি যাব মা। কথাটা বলিয়াই মুকুন্দ মাথা নীচু করিল।

—কোন্ বাড়ী? চন্দ্রশেখর মুখুয্যের বাড়ী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিধবা বলিলেন—ও! বলিয়াই তিনি মুখ ফিরাইয়া স্নানরতা একটি রূপসী মেয়ের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইলেন। মুকুন্দ তাহা লক্ষ্য করিল। তাহার সন্দেহ হইল—হয়ত—এই-ই সাবিত্রী।

বিধবা মুহূর্তে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন—তুমি কোত্থেকে আসছ বাবা তোমাদের দেশ কি বেল'ঘরে ? তোমার নামই কি বিকাশ ?

মুকুন্দ হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। এ প্রশ্নের জন্য সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। কি বলিবে সে ভাবিয়া না পাইয়া মুখ নীচু করিল। তাহার মুখখানা যেন একেবারে রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

বিধবার মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন—বুঝেছি, তা এতে আর লজ্জার কি আছে বাবা ? আজ বিকালেই ত তোমার আসবার কথা ছিল, না বাবা ? কৈ, প্রকাশ বাবু এলেন না ? তিনি ব'লে গিয়েছিলেন, কাল তোমায় একেবারে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবেন। আহা, চমৎকার ভদ্রলোকটি তিনি—মণিলালের মুখে সবই শুনেছি। যেমন দাদা—তেমনি ভাই। তিনি বোধ হয় বিকালেই আস্‌বেন—সাবিত্রীকে দেখতে বোধ হয় তোমায় আগেই পাঠিয়েছেন, না বাবা ?

মুকুন্দ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। বিধবা হয়ত তাঁহার প্রশ্নের উত্তর পাইলেন।

বিধবা বলিলেন—ওদের বাড়ী ত এই কাছেই—তুমি বরং আমার সঙ্গেই এস বাবা, আমিই তোমাকে ওদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসছি। নতুন মানুষ তুমি, চিনতে পারবে কি না !…বলিয়াই বিধবা [illegible] আর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চোখের ইসারায় কি বলিলেন। [illegible] আগে আগে চলিলেন। মুকুন্দ যন্ত্রচালিতের মত তাঁহার [illegible] চলিল।

বিধবা বলিলেন—তারপর, বিকাশ, কোন [illegible] তোমরা সহরের মানুষ, আমাদের এ [illegible]

ভাল লাগবে কেন? দেখ না, জলে জলে কাদায় কাদায় কি অবস্থাই হ'য়েছে!····

মুকুন্দ দেখিল, এখনও নীরব থাকিলে সত্যই অশোভন হয়। সঙ্কোচ ও জড়তা এড়াইয়া বলিল—সহরের চেয়ে আমার এই পল্লীগ্রামই ভাল লাগে। আমাদের বেলঘরেও যে একেবারে খাঁটি সহর তা নয়—পাড়াগাঁরই মত এক রকম। তবে এমন চমৎকার খাল বিল নালা—এ সব দেখা আমাদের ভাগ্যে বড় জোটে না।

মুকুন্দর কথাগুলিতে বিধবা অত্যন্ত প্রীত হইলেন। বলিলেন—তোমাদের বেলঘরে ষ্টেশন দিয়ে আমি অনেকবার যাতায়াত ক'রেছি বাবা। আমার ছেলে যে নৈহাটিতে রেলে চাকুরী ক'রত। এখন সে বদ্‌লী হ'য়ে গেছে কাঠিহারে। বৌমা, নাতিপুতি সবই সেখানে। ছেলে চিঠি লিখেছে, বোধ হয় শীগগীরই নিতে আসবে। আমার কিন্তু বাবা ও-সুব খোট্টার দেশে গিয়ে আটক থাকতে মোটেই ইচ্ছে করে না।

মুকুন্দ যে কি বলিবে আর কি না বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। কি উদ্দেশ্যে সে আসিল এখানে আর ভগবান এ কি ফাসাদে ফেলিলেন তাহাকে!···এ আবার কি অভিনয়ের সূত্রপাত?······

শোভেন্দ্রের সঙ্গে যখন সমস্ত সম্পর্ক চিরদিনের মতই চুকিয়া গেল, তখন একবার দেখিয়া যাওয়া যে, সত্যই ইহার ও অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত কি না—একবার বুঝিয়া লওয়া, মেয়েটি সত্যই অসচ্চরিত্রা কি না এবং প্রয়োজন হইলে [illegible] শোভেন্দ্রের এই ষড়যন্ত্রের সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া [illegible] উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা—ইহাই ছিল মুকুন্দর উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য লইয়াই সে শ্রীনগরের জমিদার বাড়ী

ত্যাগ করিয়া একখানি নৌকা করিয়া রেলষ্টেশনের দিকে না গিয়া চুপি চুপি এই বড়দলের বিল সোজা পাড়ি দিয়া কালীদহে আসিয়াছে। নৌকার মধ্যে সর্ব্বক্ষণ সে আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে। সমস্ত রাত ভাবনায় চিন্তায় দুই চোখের পাতা সে এক জায়গায় করিতে পারে নাই, বিশেষতঃ শোভেন্দ্রের আজ সকালের কথাগুলি শেলের মত তাহার বুকে বাজিয়াছে।......ধনীর দান গ্রহণ করিয়া নিজের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার কল্পনা ছাড়িয়া যদি রাস্তায় রাস্তায় ফিরি করিয়াও পেট চালাইতে হইত—তাহাও যে ছিল ইহা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়ঃ। এখানে আসিবার পথে কতবার মুকুন্দ উদ্গত অশ্রু সম্বরণ করিয়াছে—নিজের অলক্ষ্যে কতবার মনের মধ্যে কত কি গড়িয়াছে—কিন্তু এখানে ব্যাপার যে এতদূর গড়াইয়াছে ইহা সে স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই। সাবিত্রীকে এক ঝলক্ দেখিয়াই মুকুন্দ বুঝিয়াছে—কেন শোভেন্দু তাহার জন্য এতদূর পাগল হইয়া উঠিয়াছে। মুকুন্দর মনে হইল—সাবিত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে শোভেন্দু যে সমস্ত কথা তাহাকে বলিয়াছে—হয়ত সে সবই মিথ্যা। শুধু তাহাকে বুঝাইবার ও রাজী করাইবার জন্যই এই কথাগুলির অবতারণা মাত্র। নইলে শশী চক্রবর্ত্তীর মত ঘুনো জোচ্চোর আর শোভেন্দ্রের মত লক্ষপতি লম্পট কাজ এত সহজ বুঝিলে—এত নীচু হইয়া তাহাকে অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া এতদূর খোসামোদ কিছুতেই করিত না।

সাবিত্রীদের বাড়ীতে উঠিয়া তাহার মামার সহিত কিভাবে আলাপ করিবে —আত্মপরিচয় কি দিবে—ইহা ভাবিতেও মুকুন্দ যেন অস্থির হইয়া উঠিল।

বিধবা বলিলেন—তোমায় কি ব'লব বাবা—বড় ভাল মেয়ে এই সাবিত্রী। গাঁয়ের ভেতর ওর জোড়া নেই। রূপ ওর যেটুকু—তার চেয়ে গুণই বেশী—তুমি খুব সুখী হ'তে পারবে বাবা।

মুকুন্দ নীরবে পথ চলিতেই লাগিল।

বিধবা বলিলেন—আহা-হা, রাঙ্গাবৌর কি বরাত! তার এত আশা—এত ভাবনা এই মেয়েটার জন্যে—আহা, দেখেও যেতে পারলো না কেমন চাঁদের মত জামাই! সবই বরাত রে বাবা—সবই বরাত,—নইলে সাতটা দিনও ত হয়নি এখনও।······আবার তাও বলি এই মণিলালের কথা। বাপু, রাঙ্গাবৌর দেখে শুনে দেবার যেন কেউ ছিল না—সেই বিয়ের চেষ্টাটা এখন ত তুই ক'রছিস—তা দু'দিন আগে ক'রলেই পারুতিস্!···বোনের সঙ্গে সম্পর্কও রেখেছিল ভারি!···

রাস্তার মোড় ফিরিলেই সাবিত্রীদের বাড়ী নজরে পড়ে। বিধবা দেখাইয়া বলিলেন—এই-ই তোমার শ্বশুরবাড়ী হ'বে বাবা—বড় গরীব।

কয়েক পা আগাইয়া কাছাকাছি আসিয়া বিধবা ডাকিলেন—বলি অ মণিলাল, মণিলাল! এই দেখ গো কে এসেছে···কাকে নিয়ে এসেছি।

মণিলাল ঘরের ভিতরেই ছিল। ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া আসিল এবং মুকুন্দর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইল।

মুকুন্দ দুই করতল একত্র করিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিল; মণিলালও প্রতি-নমস্কার করিয়া দাওয়া হইতে নামিয়া আসিল।

বিধবা বলিলেন—নাও, দেখছ কি—তোমাদের বিকাশ গো—ব'সতে দাও।

মণিলাল 'ও' বলিয়াই ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়া একটি মাদুর বাহির

করিয়া আনিল এবং দাওয়ার এক কোণে তাড়াতাড়ি পাতিয়া দিয়া সসঙ্কোচে বলিল—এস বাবা, এস—ব'স। আমরা বড় গরীব—তোমাদের একটু ব'সতে দেবার জায়গাও আমাদের নেই।

মুকুন্দ বলিল—শুধু শুধু আপনি নিজেকে ব্যস্ত ক'রছেন। আমার জন্যে আপনার কিচ্ছু ভাবতে হ'বে না।···বলিয়াই সে মাদুরের উপর বসিয়া পড়িল।

মণিলালও এক পাশে বসিল। বলিল—তারপর প্রকাশবাবু এলেন না যে? তাঁর টেলিগ্রাম কাল পেয়ে কালই রওনা হ'য়েছিলে বুঝি?···

মুকুন্দ সংক্ষেপে শুধু বলিল—হ্যাঁ।

বিধবা বলিলেন—আমি তা হ'লে এখন চ'ললাম মণিলাল—তোমরা কথাবার্তা বল। তার আগে বাছাকে কিছু খেতে টেতে দাও। ঐ যে সাবিত্রীও এসে প'ড়েছে।···ওখানে দাঁড়িয়ে কেন মা? যাও, ঘরে যাও—লজ্জা কিসের?···

সাবিত্রী লজ্জায় মাটির সহিত একেবারে মিশিয়া গিয়া কোনরকমে পিছনের দরজা দিয়া ঘরে গিয়া ঢুকিল।

মণিলাল ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়া সাবিত্রীকে কি বলিয়াই আবার আসিয়া বসিল। বলিল—বিকাশ, জামাটামা খুলে ফেল বাবা—হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও আগে।—তারপর কথা বলব'খন। সবই ত বুঝতে পারছ বাবা—প্রকাশবাবুর কাছে বোধ হয় সবই শুনেছ—। যাই হোক্, তোমাকে বলবার কিছুই নেই—তুমি এখন আমাদের আপনার জন। তুমি এসেছ—পাড়ার পাঁচজন কেউ এখনো জানতে পারে নি—একটু পরে সবাই আসবে'খন। কি আর বলব বাবা এখানকার লোকজনের

কথা—ব্যাটারা সবাই হিংশুটে আর স্বার্থপরের দল। এই বাস্তুভিটেটুকু আর সামান্য কিছু জমি—এর ওপর ব্যাটাদের যত লোভ!—যেই শুনেছে যে, বিয়ে ঠিক ক'রেছি বেজঘরের—অমনি ব্যাটাদের যেন মাথায় আগুন ধ'রে উঠেছে। ওরা চায় যে সাবিত্রীর এখানেই বিয়ে দি আর ভিটে জমি যা আছে—তা বাদেও কিছু নগদ টাকা দিই। আমি এখানে রটিয়ে দিয়েছি—প্রকাশবাবু ওকে পাকা দেখে একেবারে আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত সেরে গেছেন—। তোমাকেও যদি কেউ জিজ্ঞেস্ করে বাবা—তবে ঐ কথাই বোলো কিন্তু। এখন পাড়ার মাতব্বররা কেউ কেউ চেষ্টা ক'রছে কি ভাবে বিয়ে পণ্ড ক'রবে, আর জব্দ ক'রবে আমাকে। জন কয়েক মিলে আজ সকাল থেকে জোট পাকিয়েছে দেখ্‌ছি। তাই আজ ভাবছিলাম—এখান থেকে চ'লে গিয়ে আমার বাড়ী কলমীডাঙ্গায় গিয়ে বিয়ে দিলে কেমন হয়। প্রকাশবাবু ও-বেলায় আস্‌ছেন ত ?…

মুকুন্দর যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। মুখ তুলিয়া মরিয়া হইয়া এবার মণিলালের দিকে তাকাইয়া বলিল—দেখুন, আপনাকে দুই একটি কথা আমি ব'লব, অবশ্য জানি না, আপনি আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রবেন কি না…বা এ ব্যাপার আপনার জানা আছে কি না। যদি জানা থাকে ভালই—আর যদি জানা না থাকে—তাহ'লে হয়ত--

মুকুন্দর শুষ্ক মুখের দিকে তাকাইয়া এবং তাহার কণ্ঠস্বরে কেমন একটা ভাব দেখিয়া মণিলাল যেন ভয়ঙ্কর অস্বস্তি বোধ করিল। সে বিস্ময়ের স্বরে বলিল—কি কথা বাবা? তোমার মত ছেলে সংসারে আজকাল ক'টি মেলে? প্রকাশ বাবুর কাছে সবই ত শুনেছি…কোন রকম কিছু…

মুকুন্দ বলিল—আপনাকে ব'লতে আমার সাহস হ'চ্ছে না, কিন্তু না ব'লেও উপায় নেই। আর এ-কথা দ্বিতীয় লোককে ব'লবারও নয়।

মণিলালের মুখখানা যেন একেবারে রক্তশূন্য হইয়া গেল। তাহার ভয় হইল, বিকাশ যেন কি সংবাদই বলে! কোনো খারাপ খবর কিছু.........

মুকুন্দ ঘাড় নীচু করিয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল—আমি টেলিগ্রাম পেয়েই এসেছি বটে, তবে আপনাকে একটু খুলে ব'লতে হ'বে আমাকে, আপনাদের এ বিয়ের মধ্যে রহস্য কি আছে? কি আপনাদের মতলব?...

মতলব! মণিলাল যেন আকাশ হইতে পড়িল। বিকাশ বলিতে চায় কি?......মণিলাল ধরা গলায় বলিল—তোমার কথা শুনে আমার যে বড্ড মন কেমন ক'রছে বাবা! এ তুমি কি বল্‌ছ? পাড়ার কেউ তোমায় কিছু ব'লেছে বুঝি? এর ভেতর রহস্যই বা কি আর মতলবই বা কি?

মুকুন্দ যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, বলিল—দয়া ক'রে অপরাধ নেবেন না। বিশেষ কারণ আছে ব'লেই আপনাকে ব'লতে বাধ্য হ'য়েছি। আপনি......

মণিলাল যেন কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল—এ সব তুমি কি ব'লছ বাবা? ......কাল সকালে প্রকাশ বাবু এলেন—বিয়ের কথা তুললেন—অনেক কিছু ব'ললেন—মেয়ে দেখলেন—তারপর নিজেই আগ্রহ ক'রে মেয়েটি নিতে চাইলেন। আমি ওর বিয়ে দেওয়ার জন্যে অস্থির হ'য়ে বেড়াচ্ছিলাম, ভাবলাম, ভগবান মুখ তুলে চাইলেন—যথার্থই একটি ভাল পাত্র পাওয়া গেল—অমনি রাজী হ'য়ে গেলাম। তারপর ত অনেক কথাবার্ত্তা হ'য়েছে

—আর আজ বিকালে ত তোমাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর আসবার কথাই র'য়েছে। তাঁকে এর আগে কোনদিন দেখিনি বা তাঁকে চিনিও না, তবে আলাপে যতদূর বুঝেছি—তাঁর মত ভদ্রলোক আজকাল সংসারে কচিৎ দেখা যায়!……

মুকুন্দ একটু হাসিল—দুঃখের হাসি। মনে মনে সে সবই বুঝিল। বুঝিল, শোভেন্দ্র ইহাদের সম্বন্ধে একটি মস্ত চাল চালিয়াছে। বলিল—আমার যা জানবার আমি জেনে নিয়েছি। এইবার সোজাসুজি কোন রকম ভূমিকা না ক'রে আপনাকে ব্যাপারটা ব'লছি।

মণিলাল ব্যস্তসমস্তে বলিল—বল বাবা, বল শীগ্‌গির,—আমার যে আর তর সইছে না।

মুকুন্দ বলিল—দেখুন, প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বা বিকাশ ব'লে বেলঘরের কোনও লোক নেই। এ বিয়ের সম্বন্ধে বা পাত্রের সম্বন্ধে বা যা-কিছু আপনি শুনেছেন, সবই মিথ্যে—সব ভূয়ো। আপনি একটা বড় রকম জোচ্চোরের পাল্লায় প'ড়েছেন।

মণিলাল আঁৎকাইয়া উঠিল। তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না।

মুকুন্দ বলিল—প্রকাশ ব'লে যে লোক আপনাকে আত্মপরিচয় দিয়েছে,—তার আসল নাম শশী চক্রবর্ত্তী। তার বাড়ী ঘর দোর, টাকা পয়সা কিছুই নেই। একটা পয়লা নম্বরের জোচ্চোর, জালিয়াৎ। আর তাকে এ কাজে যে লাগিয়েছে—তার নাম শুনলে বোধ হয় একটু অবাক হবেন। তিনি আপনাদেরই নতুন জমিদার উশৃঙ্খল লম্পট শোভেন্দ্র নারায়ণ রায়। জানি না কি ক'রে সে আপনাদের মেয়ের সন্ধান পেয়েছে—আর কেন

তার নজর এদিকে প'ড়েছে। আর প্রকাশের ভাই বিকাশ ব'লে পরিচয় দিয়ে যাঁকে ক'লকাতা থেকে এনেছে—সে আমি। আমার নাম বিকাশ নয়, মুকুন্দ। মুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দেখুন টেলিগ্রাম—বলিয়া মুকুন্দ টেলিগ্রামখানি মণিলালকে দেখাইল।

মণিলালের অন্তরাত্মা শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিয়াছিল। টেলিগ্রামখানার উপর একবার চোখ বুলাইয়া সে ঘাড় নীচু করিল।

কিছুক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। তারপর মুকুন্দ বলিল—আপনার প্রকাশ বাবু অর্থাৎ শশী চক্রবর্ত্তী শোভেন্দ্রের সমস্ত রকম কুকাজের সহচর আর মোসাহেব, আর নেহাৎ অভাগা আমি—ছেলেবেলায় মা-বাবা হারিয়েছিলাম, তাই দয়া ক'রে আশ্রয় দিয়ে লেখা-পড়া শিখিয়েছিলেন জমিদার উপেন্দ্র নারায়ণ। তিনি অবশ্য আমাকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি গত হ'বার পর শোভেন্দ্র আমার পড়ার খরচ বন্ধ করে নি বটে তবে কাল হঠাৎ তার এই টেলিগ্রাম পেয়ে শ্রীনগরে এসেই ত আমার চক্ষুস্থির। এতদিন যে আমায় লেখাপড়া শিখিয়েছে এবং এখনও অর্থ সাহায্য ক'রছে—এই সুযোগ নিয়েই সে আমাকে যা ব'লতে চায়—তা আর আপনাকে ব'লবার নয়। বলে, বিয়ের সব ঠিক্-ঠাক্—সবই শশী ব্যবস্থা ক'রে এসেছে! শুধু বিকাশ নাম নিয়ে তার ভাই সেজে বিয়ে ক'রে বৌ নিয়ে বেলঘরেয় রওনা হ'য়ে……আর যা ব'লেছে—আমি মুখে আনতে পারব না।……আমি রাজী হই নি। আমায় নানারকম ভয় দেখিয়েছে—টাকার প্রলোভন দেখিয়েছে—কিছুতেই রাজী হই নি। শেষটায় রাগ ক'রে আমায় যা-ইচ্ছা-তাই ক'রে গালি দিয়ে আমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেছে। মানে, যে ৭৫৲ ক'রে

ডাক্তারী পড়বার খরচ মাসে মাসে তার এষ্টেট্ থেকে পেতাম, সেইটে বন্ধ হ'য়ে গেল আর কি ! তা সে হোক্ গে, সেজন্যে আমার মোটেই দুঃখ নেই—শুধু শুধু তিনটে বছর পণ্ডশ্রম হ'ল, এই যা !······

মণিলাল যেন এতক্ষণে ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল—এখন উপায় ?······কি সর্ব্বনাশ ! জমিদারটা ত আজ চার পাচ দিন হ'ল এ গাঁয়ে এসেছিল, এর আগে সে ত কোনদিনই এ মহালে আসে ও নাই শুনেছি। আমাদের কাউকে বা সাবিত্রীকে সে চিনবেই বা কি ক'রে ?···ঐ দীঘির ঘাটেই এসে সেদিন বজরা ভিড়িয়েছিল আবার রাত্রে তার বজরাতে নাকি ডাকাত প'ড়ে। সে ডাকাতটা নাকি ধরাও প'ড়েছে ! তাই ত—তা তুমি কি কর বাবাজী ?

মুকুন্দ বলিল—আমি ক'লকাতায় মেডিক্যাল কলেজে পড়ি। শশী জোচ্চোরটা বোধ হয় আপনাকে ব'লেছে যে, আমি খিদিরপুরের ডকে চাকুরী করি, না ?

—হ্যাঁ, তাই ব'লেছে বটে।

মণিলালের মুখখানা একেবারেই বিবর্ণ হইয়া গেল। অস্ফুটে সে বলিল —এখন উপায় ?

মুকুন্দ বলিল—উপায় এখনও আছে, এর পরে কিন্তু আর কোনও উপায় থাক্ত না।

মণিলাল বলিল—এত বড় জোচ্চোর—এত বড় বদমাসও দুনিয়ায় থাকে ?···কি আশ্চর্য্য !

মুকুন্দ বলিল—আমি বিয়ে ক'রে তার কাজ উদ্ধার ক'রে দিতে রাজী না হওয়ায় শোভেন্দ্র একেবারে ক্ষেপে গেছে। আর শশী তাকে জোর্

ক'রে ব'লেছে—যেমন ক'রে পারে, সাবিত্রীকে তার হাতে তুলে দেবেই। শশীর পুরস্কার এ কাজে পাঁচ হাজার টাকা দিতে চেয়েছে শোভেন্দ্র। এ চক্রান্ত সবই শোভেন্দ্রের আর ঐ শশীটা কাজ উদ্ধার ক'রতে দরকার হ'লে মানুষও খুন ক'রতে পারে—টাকার জন্যে। তার কাছে কোন রকম কাজই অসম্ভব নয়। দরকার হ'লে জোর ক'রে······

হঠাৎ ঘরের মধ্যে কেমন একটা অস্ফুট গোঙানি ও কাতরস্বর শোনা গেল। মনিলাল—ওকি—বলিয়াই দাওয়া হইতে উঠিয়া ব্যস্তভাবে ঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল—সাবিত্রী, ও সাবিত্রী······ মুকুন্দ বাবু, আসুন ত একবারটি—দেখুন ত কি হ'ল ?

মুকুন্দ ছুটিয়া গিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল এবং দেখিল, সাবিত্রী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে। অনুমানে বুঝিল, ঘরের ঐ কোণে বসিয়াই সমস্ত কথাবার্ত্তা সে শুনিতে পাইয়াছে এবং এ আকস্মিক মূর্চ্ছার কারণও সম্ভবতঃ তাই।

মাথায় ও চোখেমুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে দিতে মুকুন্দ বলিল—ব্যস্ত হবেন না মনিবাবু, এখুনি জ্ঞান হবে। এঁর কি মাঝে মাঝে এ রকম হয় ?·········

—কই না—শুনিনি ত কখনও।

ভগবানই বোধ হয় মানুষকে এমনিভাবেই সুযোগ জুটাইয়া দেন। মুকুন্দ অপলক চোখে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।—বাস্তবিক কি সুন্দর মুখশ্রী—যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা ! চুলগুলি থরে থরে সাজান, বিস্তৃত ভ্রূর নীচে চোখ দু'টি যেন তুলি দিয়া আঁকা। দারিদ্র্যের সাধ্য কি—এর গরিমা এতটুকু ম্লান করে। মুকুন্দর আর চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা হইল না।

সে বুঝিল—ইহার জন্ত শোভেন্দ্র শুধু শুধু পাগল হয় নাই। কার্য্যসিদ্ধির জন্ত হতভাগাটা এই মেয়েটির নামে কত কি-না রচনা করিয়াছে!……

কিছুক্ষণ বাদেই সাবিত্রীর জ্ঞান হইল। সে চোখ মেলিয়া দেখিল, তাহার মাথার কাছে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া তাহার মামা ও এ পাশে তাহারই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আগন্তুক ভদ্রলোকটি। ব্যস্ত হইয়া সে উঠিতে গেল। মুকুন্দ বলিল—ব্যস্ত হ'বেন না, শরীর কি দুর্ব্বল বোধ হ'চ্ছে?

সাবিত্রী কোন উত্তর না দিয়া পাশ ফিরিয়া উঠিয়া বসিল। কেন যে সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল—অন্তরে তাহার যে কি ভীষণ দুর্য্যোগ—তাহা একমাত্র জগদীশ্বর ভিন্ন অপর কে বুঝিবেন!…তাহার মাথায় যেন আগুন ছুটিতে লাগিল…সেই জমিদার…এ বিবাহ তাহারই চক্রান্ত…ভাবিতেও সাবিত্রী যেন ভয়ে ত্রাসে কাঠ হইয়া উঠিল।

মুকুন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দরজার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল—আমার ত আর দেরী ক'রবার উপায় নেই মণিলাল বাবু। দীঘির ঘাটে নৌকো বাঁধা র'য়েছে—আমাকে এখুনি রওনা হ'তে হবে।……আমার কর্ত্তব্য আমি ক'রে গেলাম—এখন ভগবানের ওপর ভরসা ক'রে ভালমন্দ যা-হয় আপনারা ক'রবেন।

মণিলালও উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—সে কি কথা! কোথায় যাবেন আপনি এখন? আপনার কোনমতেই এখন যাওয়া হ'তে পারে না—বিশেষ, খাওয়া দাওয়া না ক'রে! আগে বিশ্রাম নিন্—খাওয়া দাওয়া করুন—আর বলুন, আমি এখন কি ক'রব?

মুকুন্দ মাথা চুলকাইয়া বলিল—সে আপনিই ভেবে দেখুন—এখন কি কর্ত্তব্য! তবে ভগবান সাক্ষী ক'রে ব'লে গেলাম – আমি যা ব'লেছি—

তার একবর্ণও মিথ্যা নয়। আমার মনে হয় যে, সে হতভাগা শশীটা হয়ত নিজেই এসে বে' করতে চাইবে—ব'লবে বিকাশ রাজী হয়নি—কি, যা হোক্ একটা কিছু ব'লবে—হয়ত বা মোটা টাকাও আপনাকে দিতে চাইবে, কি আর কাউকে বিকাশ ব'লে এনে দাঁড় করাবে।···শুধু সেইজন্তেই আপনাকে সাবধান ক'রতে আমার এতটা পথ আসা!···

সাবিত্রী ঘরের ওকোণে গিয়া চুপটি করিয়া মাটির দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সেদিকে একবার তাকাইয়া মুকুন্দ ঘর হইতে বাহির হইয়া দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল।

মণিলাল ধীরে ধীরে সাবিত্রীর কাছে গেল। ডাকিল—সাবিত্রী!···

সাবিত্রী কথা বলিতে পারিল না। আস্তে আস্তে অতি কষ্টে মুখ তুলিয়া মামার মুখের দিকে তাকাইল। তাহার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। অশ্রুভারাক্রান্ত স্বরে সে বলিল—মামা, আমায় একটু বিষ এনে দিতে পারেন? আর কত সহ্য ক'রব?···

—কেন মা? এ কথা কেন ব'লছিস্?······আমি থাকতে তোর ভয় কিসের?·········

—তা ছাড়া আর যে কিছুই পথ দেখি না, মামা।

সাবিত্রী উদ্গত অশ্রু সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিয়া বলিল—আত্মহত্যা আমায় ক'রতেই হবে মামা—আপনি জানেন না—আমার মত পোড়া কপাল কারুর নয়—আমারই জন্তে মা আমার······

ক্রন্দনের আবেগে আর কিছুই সে বলিতে পারিল না।

মণিলালও সান্ত্বনার বাক্য আর কিছুই বলিতে পারিল না। মুকুন্দ

দাওয়ার উপরে দাঁড়াইয়া সাবিত্রীর কথাগুলি সবই শুনিল। মণিলাল ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

মণিলাল বলিল—তা হ'লে তুমি এখন কি কলকাতাতেই যাবে মুকুন্দ?

দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া মুকুন্দ বলিল—হ্যাঁ, আমায় এখুনি রওনা হ'তে হবে। আমারও জীবনের পথ একেবারেই বদ্‌লে গেল। ডাক্তারী পড়া ত এই পর্য্যন্ত শেষ হ'লই। কেন না, অত টাকা আর আমি কোথায় পাচ্ছি বলুন? এখন চেষ্টা চরিত্র ক'রে যা হোক্ একটা চাক্‌রী বাক্‌রী জুটিয়ে নিতে হবে। অবশ্য আমার জন্যেও আমি ভাবি না—আমার জন্যেও ভাব্‌বার কেউ নেই। তবে আপনাদের এখানে এসে আজ সত্যিই আমার মনটা বড্ড খারাপ হ'য়ে গেল। আপনারা এত ভাল মানুষ—অথচ আপনাদেরই অদৃষ্টে এই বিড়ম্বনা!

মুকুন্দর কথাগুলিতে মণিলাল একেবারে গলিয়া গেল। বলিল—তোমায় আর কি ব'লব বাবা, চারদিকে জানাজানি হয়ে গে'ছে—কাল বাদ পরশু বিয়ে। সবাই জানে পাকা দেখা পর্য্যন্ত হ'য়ে গিয়েছে···এখন আমি কি মাথা কুটে মরব?···এ ব্যাপার যদি ঘুনাক্ষরে জানাজানি হয় তা হ'লে কি আর ও মেয়ের বিয়ে হবে?···

মুকুন্দ বলিল—আপনি মিছিমিছি এখন ভাব্‌ছেন কেন?···ও পাড়ার যে ছেলের কথা ব'লছেন, সেখানেই না হয় বিয়ে দিয়ে দিন, না হয় আপনাদের গাঁয়েই নিয়ে যান, প'রে দেখেশুনে বে' দেবেন। মেয়ে ত আর আপনাদের কুৎসিত নয় যে, এতটা ভয় পাচ্ছেন?···

—তোমায় ব'লব কি বাবা, ও পাড়ার সে ছেলেটা একেবারে উচ্ছন্নে

গেছে, অবস্থাও নেহাৎ খারাপ—জেনে শুনে কেমন ক'রে তার হাতে দি ?…বিশেষ ঐ উচ্ছুগ্‌গু করা মেয়ে—তারা সবাই জানে যে পাকা দেখা পর্যান্ত হ'য়ে গেছে, এখন কি আর তারা নিতে চাইবে ? আর এখানকার কি কড়া ব্রাহ্মণ সমাজ—তা ত তুমি জান না বাবা ! আর এ-কাজ এখন সেধে ক'রতে গেলেই টাকা ছাড়া ত কথা বলাই চ'লবে না। আমি যে একেবারেই কপর্দ্দকহীন। দিদিও ত কিছুই রেখে যেতে পারেন নি !

—মণিলাল !

ও-পাড়ার মুখুয্যে মশাই নামাবলী গায়ে খড়ম পায়ে ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে ও কাসিতে কাসিতে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

—আজ্ঞে—বলিয়াই মণিলাল যেন থতমত খাইয়া গেল। কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। একবার বৃদ্ধের দিকে আর একবার মুকুন্দর দিকে তাকাইয়া সত্রাসকণ্ঠে বলিল—আসুন খুড়োমশাই !

—আর আমাদের আসা ! এখন যেতে পারলেই হয়। শুনলাম নরেশের মা'র মুখে, ছেলেটি নিজে এসেছে সাবিকে দেখ্‌তে—তাই একবারটি এলাম। বৈতরণীর তীরে এসে দাঁড়িয়েছি রে বাবা, আমার এখন কি পাড়ার দলাদলিতে যোগ দেওয়া পোষায় !…নারায়ণ-শ্রীমধুসূদন !—বেঁচে থাকত আজ চন্দ্রশেখর—তখন না হয় দু'চারকথা ব'লতাম বা বলা চ'লত।

মণিলাল বলিল—আসুন, দাওয়ায় উঠে আসুন খুড়োমশাই ! এই ত সবে এল, তাই এখনও খবর দিতে পারি নি আপনাদের। বসুন !

তারপর মুকুন্দর দিকে তাকাইয়া বলিল—বাবাজী, তুমি একবারটি ঘরে চল ত—একটু জলযোগ ক'রবে, এস, এস। বলিতে বলিতে ব্যস্ত-

ভাবে মনিলাল মুকুন্দকে একপ্রকার টানিয়াই ঘরের ভিতরে লইয়া আসিল।

ঘরের একটি কবাট ভেজাইয়া দিয়া মুকুন্দকে ঘরের এক কোণে ডাকিয়া লইয়া তাহার হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া মণিলাল একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। চুপি চুপি বলিল—বাবাজী, তুমি এ যাত্রা আমাদের বাঁচাও—তুমি ছাড়া আর কোনও পথ নেই।

মুকুন্দ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। বলিল—আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, আমার নমস্য। ছেলেমানুষী ক'রবেন না, আমায় কি ক'রতে হবে বলুন, অবশ্য সাধ্যের অতীত হ'লে···

—এ ব্যাপার জানাজানি হ'লে ও-মেয়ের আর কিছুতেই বিয়ে হবে না, কেউ নেবে না। তুমি জান না বাবা, এদিকের সমাজের কি কড়া শাসন! আমার দু'দুটি মেয়ে—ব'লতে গেলে তাদেরই বিয়ের বয়েস পেরিয়ে গেছে—তাদের ভেতর আবার সাবিত্রীকে কোথায় নিয়ে যাব?··· সাবিত্রীকে তুমিই গ্রহন কর! এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ ক'রছি তুমি সুখী হ'তে পারবে।···

—অ মণিলাল, বলি বাইরে এস বাবাজী একবারটি, শুনি সব কি রকম কি ব্যাবস্থা করছ?'···বৃদ্ধ মাদুরের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়াছেন।

—যাই খুড়োমশাই, ঐ দেখ বাবাজী, বল—আমি এখন কি মাথা কুটে ম'রব?

মুকুন্দ অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া বলিল—আপনি একটা মস্ত ভুল ক'রছেন। আপনি আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চান কি হিসেবে? আপনি আমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না—জোচ্চোর কি ঠক, ভাল কি মন্দ!

তারপর না আছে আমার বাড়ীঘরদোর না আছে কিছু রোজগার—ব'লতে গেলে আমি এখন পথের ভিখিরী।......আমার পক্ষে ত এখন সম্পূর্ণ অসম্ভব।...

মুকুন্দর হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে মণিলাল বলিল—গাছতলায় থাক্‌লেও আমি জানব যে, সাবিত্রীকে আমার জলে দিই নি। তুমি পুরুষ ছেলে তায় শিক্ষিত।—ভগবান তোমার অন্ন মারবেন না বাবা।—নইলে তুমিই ভেবে দেখ—তুমি যা ব'ললে তা যদি সত্যিই হয়—তবে কলমীডাঙ্গায় নিয়ে গিয়েই কি আমি ওকে রক্ষা ক'রতে পারব? বিলের ওপারেই ত সেই গাঁ—।

মুকুন্দ নিরুপায় হইয়া বলিল—আপনি অবুঝ হবেন না—আপনি চেষ্টা চরিত্র করুন! একান্ত যদি কোন সুবিধা নাই-ই হয়—আমায় জানাবেন পরে—আমি ঠিকানা রেখে যাচ্ছি—। চাকুরী বাকুরী একটা না জুটিয়ে এ দায়িত্ব আমার পক্ষে নেওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়।

মণিলাল মুকুন্দর হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল—সবই বুঝতে পারছি বাবা—কিন্তু বুঝেও যে অবুঝ হচ্ছি—। ভগবানের কাছে এই কামনা করি—তুমি রাজরাজেশ্বর হও।

মুকুন্দ নীচু হইয়া মণিলালের পায়ের ধুলা লইল।

মণিলাল বলিল—আমি এখন এদের কি ব'লব, তাই বল?

মুকুন্দ কোন কথা বলিল না, মাথা নীচু করিয়া মাটির দিকে তাকাইয়া রহিল।

মণিলাল বলিল—বাইরে এস বাবা, বুড়োর সঙ্গে দুটো কথা ব'লে যাও। বুড়োকে তুমি শুধু বল যে, মায়ের অসুখ ব'লে এ তারিখে

বিয়ে হবে না—পরে দিনস্থির করা যাবে ; অন্য কথা কিছু বোলো না। যা বলার আমিই বলব'খন।

মুকুন্দ বাহিরে আসিয়া বৃদ্ধের পায়ের ধুলা মাথায় লইল এবং মাদুরের উপর বসিল। বৃদ্ধ আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—দাদাজীবনের নাম ?...

মুকুন্দ সবিনয়ে বলিল—শ্রীমুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।...তবে বিকাশ ব'লে সবাই ডাকে।

—পিতার নাম ?...

—৺রামকমল বন্দ্যোপাধ্যায়।

—নিবাস ?

মুকুন্দ একমুহূর্ত্তে চিন্তা করিয়া লইয়া বলিল—আগে ছিল ২৪ পরগনার বেলঘরেয়,—কিন্তু এখন আর বাড়ীর সঙ্গে বিশেষ সংস্রব নেই—কলকাতারই বাসিন্দা হ'য়ে গেছি একরকম।

মণিলাল বলিল—বাড়ী ঘর অবশ্য সবই বেলঘ'রেয় আছে।

বৃদ্ধ বলিলেন—বেশ বেশ, খাসা জামাই। আহা, চন্দ্রশেখরও দেখে যেতে পারল না, রাঙ্গাবৌমাও দেখে যেতে পারলেন না! একেই বলে অদৃষ্ট!...আচ্ছা, বাবাজী মণিলাল, দাদাজীবন মুকুন্দ, আমি এখন উঠি তা হ'লে আবার আসব'খন পারি ত ও বেলার দিকে একবার।...আর বাবা, এই বেতো আর কেশো শরীর এ আর টেনে কুলোতে পারি না—এখন যেতে পারলেই হয়!...দুর্গা-শ্রীহরি!...

মণিলাল বলিল—তাই ত খুড়োমশাই, বড় মুস্কিল হ'য়ে গেল যে!

বৃদ্ধ বলিলেন—কি রকম ?...

—এই ২৩শে তারিখে ত আর কাজ হ'য়ে উঠ্ছে না দেখ্ছি। বিকাশের

মা'র বড্ড অসুখ, এখন তখন অবস্থা—ও ত এখুনি ক'লকাতা রওনা হ'য়ে যাচ্ছে, শুধু খবরটা দিতে এসেছে।

বৃদ্ধ বলিলেন—তবেই ত মুস্কিল বাবা, শুভকাজে গোড়াতেই বিঘ্ন! দুর্গা-শ্রীহরি!···মেয়েটার অদৃষ্টটাই যেন কি রকম!······

মণিলাল বলিল—যা ব'লেছেন খুড়োমশাই, ভাবছি, আজই এখানকার ঘরদোরে তালা মেরে সাবিত্রীকে নিয়ে কলমীডাঙ্গা চলে যাই—পরে সুবিধে হ'লে ৩১ শে কাজ হবে—না হয় অগ্রহায়নের গোড়াতেই হবে। উপায় ত আর নেই। মানুষের হাত আর কতটুকু বলুন?···

বৃদ্ধ উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন—সত্যি কথাই বাবা, মানুষের হাত এতে কিছুই নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই হবার উপায় নেই—দুর্গা-শ্রীহরি। তুমি তাড়াতাড়ি ক'রলে কি হবে বাবা, তাঁর ইচ্ছাতেই সব-কিছু, নারায়ণ শ্রীমধুসুদন।···তুমিই বা বাড়ী ঘর ছেড়ে কতদিন এখানে ব'সে থাকবে? জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে—এই তিন বিধাতা নিয়ে···দুর্গা শ্রীহরি!

বৃদ্ধ দুর্গা নাম জপ করিতে করিতে চলিলেন।

মুকুন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমি এখন চলি তা হ'লে, এই নিন্ আমার ঠিকানা। আমার একটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর ঠিকানা এ। আমি যেখানেই থাকি এই ঠিকানায় চিঠি দিলেই আমি পাব।···ব্যাপার যা দেখছি তাতে আমার বেশীক্ষণ এখানে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়।

একটু কাগজে মুকুন্দ তাহার ঠিকানাটা লিখিয়া দিল।

মণিলাল বলিল—কি হয় না হয়—সবই তোমায় পত্রে জানাব বাবা। উপস্থিত ত রক্ষা হ'ল—এখন সেই প্রকাশ বাবু এসে কোন গণ্ডগোল না বাধায়!······বহু দূরের পথ যাবে বাবা, বেলাও যথেষ্ট হ'য়েছে - একটু

জলযোগ ক'রে যাও বাবা—তোমায় আর বেশী কি বলব !......এত বড় বিপদে যে আমায় প'ড়তে হবে, স্বপ্নেও ভাবিনি।

আসন পাতিয়া খাবার রাখিয়া সাবিত্রী পূর্ব্বেই রান্নাঘরে গিয়া চুপটি করিয়া বসিয়াছিল। ঘরে ঢুকিয়া মণিলালের নির্দ্দেশে মুকুন্দ ঈষৎ আপত্তি জানাইয়া খাইতে বসিল। খাবার সত্যাই তাহার মুখে অমৃতের মত লাগিল। খাঁটি দেশী খাবার—চিঁড়ে, কলা, দুধ, খেজুর গুড়ের পাটালি, আমসত্ত্ব সত্যাই এক অপূর্ব্ব যোগাযোগ। খাইতে বসিয়া মুকুন্দ সাবিত্রীর কথাই ভাবিতে লাগিল।... কি অদৃষ্ট!......অথচ রূপে গুণে এমন লক্ষ্মী মেয়ে......

মুকুন্দ বলিল—আচ্ছা, সেই শশী জোচ্চোরটা বোধ হয় আসবে'খন। বোধ হয় কেন আসবেই। টাকার লোভে সে জীবনের মায়াও করেনা। তাকে কি ব'লবেন ? পাড়ার লোকের মুখেও হয়ত সে শুনবে যে, তার ভাই বিকাশ এসে ব'লে গেছে যে, তার মায়ের অসুখ এবং এ তারিখে বিয়ে হবে না একথাও ব'লে গেছে।

মণিলালও শুধু এই কথাটাই এখন চিন্তা করিতেছিল, বলিল—সেই কথাই ত ভাবছি বাবা। কি যে বলব'খন !...তার ত বিকালে আসবার কথাই র'য়েছে। পাড়ার কারুর সঙ্গে দেখা হ'লেই ত সর্ব্বনাশ !...আমি না হয় বেলা থাকতেই দীঘির ঘাটে গিয়া ব'সে থাকব। নৌকো ক'রে দীঘির ঘাটেই ত এসে নামবে। তখন যা হয় ব'লে ঐ ঘাট থেকেই বিদেয় করব'খন। এ ছাড়া ত মাথায় কিছুই আস্‌ছে না। গাঁয়ে ঢুকলেই ত কেলেঙ্কারী সব ফাঁস হ'য়ে যাবে।......

—মণিলাল বাবু বাড়ী আছেন নাকি ?···মণিলাল বাবু !···

গলার স্বর শুনিয়া দু'জনেই যে শুধু চিনিতে পারিল, তাহা নয়, চমকিয়া উঠিল। বেড়ার ফাঁকে উঁকি মারিয়া দেখিয়া মণিলাল ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল—মুকুন্দ, সর্ব্বনাশ! সেই প্রকাশ—না শশী—সেই লোকটাই যে এসে পড়েছে—বাড়ীর ভেতর ঢুকছে দেখ! আরও দুটো লোক সঙ্গে ক'রে এনেছে যে! তুমি ঘর থেকে বেরিও না বা দেখা দিয়ো না। আমি আস্‌ছি—দৌড় কতদূর দেখি! ভগবান, কত শাস্তিই যে বরাতে লিখেছ! হায়রে অদৃষ্ট!······

মণিলাল ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিল—কে?······প্রকাশ বাবু যে, আসুন আসুন—বলিতে বলিতে মুখ কালি করিয়া উঠানে গিয়া দাঁড়াইল।

প্রকাশ (ভূতপূর্ব্ব শশী) মণিলালকে দেখিয়াই হর্ষোৎফুল্ল মুখে দুই করতল একত্র করিয়া নমস্কার করিল, বলিল—অসময়ে এসে প'ড়েছি মণিবাবু—কিন্তু উপায় নেই···বাধ্য হ'য়েই আস্‌তে হ'ল। যদিও কথা ছিল যে বিকালেই আসব। যাই হোক্—১১টা ৪৭ মিনিট ৪২ সেকেণ্ড গতে শুভক্ষণ, ঐ সময়ে পাকা দেখাটা সেরে ফেলতে হ'বে—উভয়পক্ষের এখানে ব'সেই। সেজন্যে পুরুতঠাকুর মশাইকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলাম। আর, এইটিই আমার ভাই বিকাশ। বিকাশ! ইনিই তোমার মামা-শ্বশুর মণিলাল বাবু—প্রণাম কর!···

বিকাশ নামধারী চার-আনা-বার আনা চুলছাঁটা ক্যাসানদুরস্ত যুবকটি ব্যস্তভাবে মণিলালকে প্রণাম করিতে গেল, কিন্তু মণিলাল—"থাক্ থাক্" বলিয়া ছেলেটিকে ধরিয়া ফেলিয়া তাহার প্রণাম করা এক প্রকার

অসম্ভব করিয়া দিল। তারপরই একটি বুকভাঙ্গা প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সজল চোখে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। কি যেন বলিতে গিয়াও বলিতে পারিল না—এমনই ভাব দেখাইল।

শশীর কিন্তু ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইল।......ব্যাপার কি?...যে লোক কাল অতদূর ভদ্রতা করিয়াছে—মেয়েটাকে বিদায় করিতে পারিলেই যে বাঁচিয়ে যায়—তাহার এ আকস্মিক ভাবান্তরের কারণ কি?...উঠিয়া দাওয়ায় বসিতে পর্য্যন্ত বলিতেছে না...চোখে জল—বিমর্ষভাব...

প্রকাশ বলিল—ব্যাপার কি বলুন ত মণিলাল বাবু?

বহুকষ্টে নিজেকে সামলাইয়া মণিলাল চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিল—আর ব্যাপার!......এদিকে সব শেষ হ'য়ে গেছে...মণিলাল দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

অস্ফুটে প্রকাশ বলিল—কি ব'লছেন বুঝতে পারছি না ত?...

—কাল রাত্রে কলেরা হ'য়েছিল সাবিত্রীর—দু'ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হ'য়ে গেল। ভাবনা চিন্তার হাত থেকে আমায় রেহাই দিয়ে সে তার জায়গায় চ'লে গেছে...মণিলাল কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে প্রায় রাঙ্গা করিয়া তুলিল।

প্রায় এক মিনিটকাল কাহারও মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। তারপর প্রকাশ বলিল—সবই অদৃষ্ট মণিলাল বাবু, কি আর করব—আচ্ছা...আমরা এখন চলি তা হ'লে?......

—একটু দাঁড়ান বলিয়া মণিলাল ঘরে ঢুকিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে সেই নোটের তাড়াটি বাহির করিয়া আনিয়া প্রকাশের হাতে দিয়া বলিল—অপরাধ নেবেন না শশী বাবু—

বলিয়াই মণিলাল সঙ্গে সঙ্গে একটু থতমত খাইয়া গেল। প্রকাশের 'শশী' নামটা মুকুন্দর মুখে বারকয়েক শুনিয়া অন্যমনস্কভাবে অসতর্ক মুহূর্তে হঠাৎ সে বলিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু সামলাইয়া লইবার জন্য তন্মুহূর্তেই কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া একটু দম লইয়া বলিল—কি আর ব'লব আপনাকে প্রকাশবাবু—বলিতে বলিতে শশীর মুখের দিকে তাকাইয়া মণিলাল দেখিল—শশীর মুখখানায় কে যেন সদ্য এক পোচ কালি লেপিয়া দিয়াছে! কেমন একটা ত্রাস ওর চোখে মুখে।

মণিলাল শুধু বেকুব নয়—নিজেকে অপরাধী মনে করিল। জমিদারের অন্তরঙ্গ লোক—একটা বিঘ্ন ঘটাইতে পারে, বিপদে ফেলিতে পারে—…ভাবিতেও মণিলালের মনের ভিতর কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

শশী দ্বিরুক্তি না করিয়াই নমস্কার করিয়া বিবর্ণমুখে সাঙ্গোপাঙ্গসহ বিদায় লইল। কি সে মনে করিয়া গেল—সে-ই জানে, তবে মণিলাল যখন ঘরে গিয়া ঢুকিল তখন মুকুন্দ দেখিল যে, ভয়ে ত্রাসে ভদ্রলোক রীতিমত কাঁপিতেছে।

বেড়ার ফাঁক দিয়া মুকুন্দ এতক্ষণ সবই দেখিতেছিল। ব্যাপারটা সে রীতিমত উপভোগ করিতেছিল। অতি দুঃখে তাহার হাসি আসিল। বলিল—আপনি এত অন্যমনস্ক? কি আশ্চর্য্য! শেষটায় ওর আসল "শশী" নামটাই মুখের ওপর ব'লে ফেললেন?……আমার মনে হয়, আগে যা ব'লেছিলেন তা ওর বিশ্বাস হ'য়েছিল, কিন্তু আপনার ঐ কথাটিতেও বোধ হয় বুঝে গেল মরার কথাটা একদম ভুয়ো, আর আমিই এসে হয়ত ব্যাপারটা ফাস ক'রে দিয়েছি। ঘাটে ত একখানা নৌকাও

দেখতে পাবে, আবার হয়ত জিজ্ঞাসাবাদ ক'রবে কাউকে।…আপনি গুছিয়ে কোন কথা ব'লতে জানেন না।

মণিলাল মরিয়া হইয়া বলিল—যাক্, পাপ ত বিদেয় হ'ল, এখন যা খুসী করুক্ গে, আমার আর ভাল লাগে না ছাই! আজই এ গাঁ ছাড়তে পারলে বাঁচি!

মুকুন্দ হাসিমুখে বলিল—যাকে পুরুত ব'লে পরিচয় দিচ্ছিল—ওকে আমি চিনি। শোভেন্দ্রের রাঁধুনে ঠাকুর, বাড়ী ওর বাঁকুড়া। ও লোকটাকে আমি অবশ্য চিনিনা, কে জানে কোত্থেকে ধ'রে নিয়ে এসেছে।…দেখলেন ত, আমি না এলেই হ'য়েছিল আর কি!……এখন আপনার বিশ্বাস হ'ল ত?……

মণিলাল বলিল—কি যে বল বাবা তার ঠিক নেই—তোমায় ক'রব অবিশ্বাস?

মুকুন্দ বলিল—আচ্ছা, ও টাকাটা কিসের দিলেন বলুন ত?…

মণিলাল অপ্রতিভ হইয়া বলিল—টাকার কথাটা তোমায় এতক্ষণ বলিনি মুকুন্দ—হয়ত তুমি কিছু ভাবতে পার এই জন্যেই।……বিয়ের খরচ ব'লে কাল ঐ চারশ' টাকা আমায় জোর ক'রে দিয়েছিল। আমি নিতে চাইনি—এই পৈতে ছুঁয়ে ব'লছি।

মৃদু হাসিয়া মুকুন্দ বলিল—কি আশ্চর্য্য! আমি কি আপনাকে অবিশ্বাস ক'রছি যে, অত ক'রে ব'লছেন?……কিন্তু যাই হোক, আশ্চর্য্য এই মানুষের জীবন, যাই বলুন আপনি!……কিছুক্ষণ আগেও আপনার সঙ্গে কোন পরিচয় ছিল না আমার, আর এখন মনে হ'চ্ছে, কত আপনার জন আপনি।

কথাকয়টি মণিলালের অন্তর স্পর্শ করিল। সে বলিল—আমার এই বয়সে, তোমার মত ছেলে আমার নজরে পড়েনি বাবা। তুমি যা উপকার আজ ক'রলে আমাদের!—একটা বংশের মুখ রাখলে, একটা জীবন দান ক'রলে! নইলে—ভেবে দেখ, ঐ জোচ্চোরের জোচ্চুরি ধরা কি আমার সাধ্য ছিল বাবা?······

মুকুন্দ বলিল—শশীর নাম যখনই আপনার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে—তখনই ওর সন্দেহ হ'য়েছে আমার ওপর—আর শোভেন্দ্র যদি কোনক্রমে জানতে পারে যে, তার এই ষড়যন্ত্র আমিই ফাসিয়ে দিয়েছি—তা হ'লে সে কি ক'রবে আমায়—তা ব'লতে পারছি না!

তারপরই তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল—যাক্‌গে, আমি সেজন্যে মোটেই ভাবি না। ওর জমিদারীতে আমি বাসও করি না, কিছু না। কিন্তু যাই বলুন আপনি, আমার মনে হয়—এরা খুনের চেয়েও ভয়ঙ্কর—নইলে কাজ হাসিল ক'রতে রাস্তা থেকে লোক ধ'রে এনে দিন দুপুরে যা-ইচ্ছা-তাই ক'রতে চায়, এত বড় স্পর্দ্ধা এদের? জমিদার ব'লে এরা কি মনে করে যে, তারই মর্জ্জির ওপর এতগুলো লোকের সুখ-দুঃখ, মান-ইজ্জৎ সবই নির্ভর ক'রে? এর কি কোনও প্রতিকার নেই?···

শেষের কথা কয়টি মুকুন্দ এমনিভাবেই বলিল যে, মণিলাল বুঝিল মুকুন্দ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। মণিলাল বলিল—চুপ কর বাবা—কেউ এসে শুনবে, যে গ্রাম! তবুও ভাল যে, পাড়ার এক পাশে ঝোপে ঢাকা বাড়ী এটা, নইলে এতক্ষণ এই বাড়ীর ওপরই কুরুক্ষেত্র বেধে যেত না?······

মুকুন্দ বলিল—আচ্ছা, এবার তা হ'লে আমি রওনা হই? এখনও রওনা হ'লে বিকালের গাড়ীটা ধ'রতে পারব।

মণিলাল বলিল—এ অসময়ে তোমায় কেমন করেই বা বলি যেতে! অথচ রাখতেও ত ভরসা পাচ্ছি না বাবা। যে গাঁ এটি! তার ওপর শশীবাবু আবার কি ক'রে গেলেন কে জানে!······যাই হোক্, তুমি আর একটু দেরী ক'রে যাও বাবা—শশী ওরা যদি এখনও রওনা না হ'য়ে থাকে!······তুমি বরং ব'স, আমি দীঘির ঘাটটা চট্ ক'রে একবার ঘুরে দেখে আসি।······

মণিলাল চলিয়া গেল। মুকুন্দ বসিয়া কত কি-ই ভাবিতে লাগিল। তাহার মনে হইল—গত কাল রাত্রি হইতে সে যাহা কিছু দেখিতেছে, যাহা কিছু শুনিতেছে—সবই স্বপ্ন।···স্বপ্নেই এ সমস্ত সম্ভব হয়—। নইলে সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে—সম্পূর্ণ অপরিচিত ইহারা—ইহাদের সহিতই বা এই অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় ব্যাপারে তাহাকে এমনি ভাবে জড়িত হইতে হইবে কেন?···কে সে ইহাদের? কোথায় ছিল সে?··· সাবিত্রীর কথা ভাবিতে তাহার মন সত্যই যেন সমবেদনায় পূর্ণ হইয়া গেল। বাস্তবিক অদৃষ্টের হাত কি কেহই এড়াইতে পারে না?··· কি সুন্দর মেয়ে এই সাবিত্রী! অথচ···

···সাবিত্রীকে জীবনসঙ্গিনী করিয়া সত্যই কি সে সুখের নীড় বাঁধিতে পারিবে? সে সৌভাগ্য কি সত্যই তাহার হইবে? কিন্তু তাহার পূর্বেই ক্রোধান্ধ শোভেন্দ্র শশীর চক্রান্তে যদি·······। ভাবিতে ভাবিতে মুকুন্দ যেন ঘামিয়া উঠিল।···এই সব উচ্ছৃঙ্খল জমিদারদের পক্ষে

কিছুই ত অসম্ভব নয়।···সাবিত্রীর সঙ্গেও জীবনে কোনদিন আর দেখা হইবে কি না সন্দেহ···

ঘরের উত্তরের দিকের দরজাটা হঠাৎ খুলিয়া গেল। মুকুন্দর চমক ভাঙ্গিল। মুখ ফিরাইয়া দেখিল, পৈঠার উপরে দাঁড়াইয়া সাবিত্রী, মাটির দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুকুন্দ এক ঝলক তাকাইয়া পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল যে, পাড়াগাঁয়ের পুঁটি খেঁদী শ্রেণীর মেয়ে এ নয়। মুকুন্দ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—আমায় কিছু ব'লবেন আপনি ?···

স্থিরকণ্ঠে সাবিত্রী বলিল—যার ব'লতে কেউ নেই—তার লজ্জা ক'রে ব'সে থাকলে চলে না। আমি রান্না ক'রছি—আমার অনুরোধ—এমন অসময়ে, আপনি না খেয়ে যেতে পারবেন না—মামা যাই বলুন, সব কথাই আমি শুনেছি ঘরে ব'সে এবং সেই ভরসায়ই আপনাকে ব'লছি।—লোকে যা-ইচ্ছে ভাবুক—বলিয়াই সে মাথা নীচু করিল, বলিল—নিজের দশজন থাকলে অপর দশজনের কথা ভাবতাম। না খেয়ে এখন আপনি কিছুতেই যেতে পারবেন না।

এ কথার পর বোধ হয় প্রত্যাখ্যানের কথা মনে আসিলেও মুখে উচ্চারণ করা চলে না। মুকুন্দ আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিল—আচ্ছা—কিন্তু দেরী হয় না যেন! আর—আর একটি কথা আমার ব'লবার ছিল, ভেবেছিলাম বলার সুযোগ পাব না···

সাবিত্রী মুখ না তুলিয়াই পৈঠার উপরে দাঁড়াইয়া মাথা নীচু করিয়া রহিল।

মুকুন্দ বলিল—আমার অবস্থার কথা সবই ব'লেছি আপনার মামার কাছে—বোধ হয় সবই শুনেছেন আপনি—আর আমার যা ব'লবার তা'ও

আমি ব'লেছি—। যদি চাকরী বাকরী একটা জোটাতে পারি—তা হ'লে আপনার মামাকে চিঠি দেব—কেমন?...

ইহা অপেক্ষা আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই—মুকুন্দ তাহা বুঝিল এবং লক্ষ্য করিয়া দেখিল—সাবিত্রীর সুন্দর মুখখানা যেন মুহূর্ত্তে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।—রৌদ্রে নয়—ঠিক এই বয়সে যে কারণে মেয়েদের মুখ এমনিভাবেই রাঙা হইয়া উঠে। শত অশান্তির মধ্যেও মুকুন্দর মনে যেন পুলকের হিল্লোল বহিয়া গেল। সে মুখ ফিরাইয়া লইল। সাবিত্রীও যেন বিষম লজ্জায় ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

মুকুন্দ ভাবিল, সাবিত্রীকে মুখোমুখি এইভাবে দাঁড় করাইয়া লজ্জা দেওয়াটা বোধ হয় অনুচিত হইল।—বেচারী কি মনে ভাবিল!...ছিঃ...

কিন্তু পরক্ষণেই সে অবাক হইয়া দেখিল যে, সাবিত্রী আবার আসিয়া পৈঠার উপর দাঁড়াইয়াছে এবং সত্রাসদৃষ্টিতে ইতস্ততঃ তাকাইতেছে। ভাবটা এই, যে, কেহ কোথাও আছে কিনা বা দেখিতেছে কিনা!

মুকুন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—কি?......মুকুন্দ দেখিল—এ যেন সে-সাবিত্রী নয়—এক মুহূর্ত্তে সাবিত্রী যেন তাহার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছে।

সাবিত্রী ঘরে ঢুকিয়া কবাটে হেলান দিয়া নতনেত্রে দাঁড়াইয়া সসঙ্কোচে বলিল—একটি উপকার আপনাকে ক'রতে হ'বে—আপনি ছাড়া এ-কাজ আর কারুর দ্বারা হবার নয়। আপনার যদি বিশেষ অসুবিধে না হয়...

মুকুন্দ বলিল—অসুবিধে কিছুই নেই, কি কাজ বল?

মুকুন্দ হঠাৎ "আপনি" ছাড়িয়া "তুমি" বলিল এবং এই সম্বোধনটা

প্রথমে একটু কানে ঠেকিলেও উভয়েরই বোধ হয় ভাল লাগিল! মুকুন্দ ভাবিল, সাবিত্রী হয়ত বিবাহের কথাই তাহাকে বলিবে··· হয়ত তাহাকেই···

সাবিত্রী চুপি চুপি বলিল—আমাদের এখানকারই কাছারীর সর্দ্দার, নাম তার মহাদেব—আমায় সে মা ব'লে ডাকে। আজ চার পাঁচদিন সে সদরে হাজতে আটক র'য়েছে—কাল তার মোকর্দ্দমা। যে জমিদারের নাম আপনি ব'ল্লেন, তিনিই ঐ বেচারীর নামে মিথ্যামিথ্যি ক'রে সে ডাকাতী আর খুন ক'রেছে— এই ব'লে মামলা ক'রেছেন। অথচ আমি খুব ভালভাবেই জানি যে, তার কোনই দোষ নাই। আপনি দয়া ক'রে এই জিনিষটা নিন—এটা বিক্রী ক'রলে হয়ত একশ' টাকা হবে। এই টাকা দিয়ে আপনি মোকর্দ্দমাটা যদি একটু দেখেন, কোন ভাল উকীল লাগিয়ে—যদি বেচারাকে বাঁচান যায়······আপনার পায়ে পড়ি।······আমার বরাতে যা আছে হবেই—কিন্তু যে লোকটির জন্যে আপনাকে ব'লছি সত্যিই সে দেবতার চেয়েও বড়—আমার জন্যে সে যা ক'রেছে······

সাবিত্রীর চোখে জল আসিল, বলিল—কাল সন্ধ্যের ও তার বৌ আর ছেলেটা এসেছিল—তাদের কি কান্না! অথচ—সত্যিই যদি সে ডাকাতি ক'রেই জেলে যেত—আমার এতটুকু দুঃখু ছিল না। যদি আপনার একান্ত অসুবিধে না হয়—তবে দয়া ক'রে গরীবের এই উপকারটুকু করুন—ওর ছেলে গণেশের মুখে সবই শুনবেন আপনি। কিন্তু মামা যেন কিছু টের না পান! এ সংসারে এমন একটি লোক ওর আর নেই-ই, আমারও নেই যে, ওকে একটু বাঁচাবার চেষ্টা ক'রবে। কোনো

কূল-কিনারা না পেয়েই আপনাকে ব'লছি।…

মুকুন্দ যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।…শোভেন্দ্রের বাড়ী হইতে আজ সকালে যখন সে বাহির হইয়া আসে—তখনই তাহার মুখে এই মোকর্দ্দমার কথা সে শুনিয়াছিল। সাবিত্রীর সকাতর অনুরোধে প্রতাপান্বিত লক্ষপতি জমিদার শোভেন্দ্র নারায়ণ রায়'এর বিরুদ্ধে আসামী পক্ষ সমর্থন করিয়া তাহাকে সমস্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।—অবলম্বন এই হারছড়াটি—যাহার মূল্য বড় জোর একশপঁচিশ টাকা।…যে শোভেন্দ্র তাহার বাড়ী হইতে আজ তাহাকে শেয়াল কুকুরের মত দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল অথচ যাহার দেওয়া অন্নে এতদিন সে প্রতিপালিত—সেই শোভেন্দ্রের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিতে হইবে সদর আদালতে দাঁড়াইয়া……! এদিকে সাবিত্রীর এই সকাতর অনুরোধ—আর নিজে সে মামলা মোকর্দ্দমার কিই বা বোঝে ?…

মুকুন্দর চোখের সম্মুখে দুনিয়ার রং যেন বদ্‌লাইয়া গেল! চিন্তিত মুখে বলিল—এ হারছড়া কোথায় পেলে সাবিত্রী ?

সাবিত্রী বলিল-ঐ হারগাছিই সম্বল ছিল মা'র—আমার জন্যে রেখেছিলেন। কিন্তু মামা যেন হারের কথা টের না পান—তা হ'লে আর দেওয়া হবে না।

মুকুন্দ বলিল—কিন্তু মায়ের শেষ দানটুকু তুমিই বা এভাবে নষ্ট ক'রবে কেন ?……

সাবিত্রী অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল—যদি ভগবান কোনদিন আপনাকে সেকথা বলার সুযোগ আমায় দেন, তবেই ব'লব আপনাকে—কেন এতটা এগুচ্ছি। মহাদেব আমাদের জন্যে যা ক'রেছে তার কাছে এ হারছড়া

কিছুই নয়। মহাদেবের জন্যেই যদি ওটা বিক্রী ক'রতে হয়—তবে মা স্বর্গ থেকে নিশ্চয়ই আশীর্ব্বাদ ক'রবেন—আপনি আমায় বিশ্বাস করুন! মোকর্দ্দমার কথা বা এ হারের কথা মামা যেন কিছু জানতে না পারেন! মহাদেবের ছেলে গণেশের মুখে সবই আপনি শুনতে পাবেন। ও পাড়ায় তাদের বাড়ী—আমি এক ফাঁকে খবরটা তাকে দিচ্ছি। ক'ল্‌কাতার পথে আজ একটা দিন আপনাকে সদরেই থাকতে হ'বে—আপনার খুবই কষ্ট হ'বে—কিন্তু—ওরা বড় গরীব—দিন আনে দিন খায়—একটা সংসার একেবারেই ভেসে যাবে। আপনার সুবিধে অসুবিধের কথা না ভেবে অবুঝের মতই আপনাকে ব'লছি, কিন্তু একটা গরীবের যে কত বড় উপকার করা হবে—বিশেষ আমার…

সাবিত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া মুকুন্দর দয়া হ… বলিল—কষ্ট আমার কিছুই হবে না। কিন্তু মামলা মোকর্দ্দমার অ… কি-বা বুঝি? যাই হোক্‌, আমার সাধ্যমত চেষ্টা ক'রব—তবে মামলা… নাগেন্দ্র রায়ের সঙ্গে—এই যা!

কিছুক্ষণ দু'জনেই নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। অতঃপর সাবিত্রীই বলিল—মামার সঙ্গে বোধ হয় কলমীডাঙ্গায় মামাবাড়ীতে আজই রওনা হ'তে হ'বে। কেলেঙ্কারী বরাতে যা ছিল—তা ত হ'য়েছেই—আরও কি আছে জানিনা।…আপনার সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হ'বে কি না তাও জানি না।—বলিতে বলিতে সাবিত্রী কাঁদিয়া ফেলিল। ঠিক এ অবস্থায় জীবনে কোনদিন মুকুন্দ পড়ে নাই। হাত বাড়াইয়া সাবিত্রীর হাত দু'খানি ধরিয়া কোমলকণ্ঠে সান্ত্বনার স্বরে কি সে বলিতে গেল কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই সাড়া পাইয়া বেড়ার ফাঁকে উঁকি মারিয়া দেখিল—মণিলাল খিড়কী

পার হইয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতেছে এবং এদিকে তাকাইয়া দেখিল, সাবিত্রী ইত্যবসরে গলবস্ত্র হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়াই মুহূর্তে অন্তর্দ্ধান করিল।

নিতান্ত শান্তশিষ্ট ছেলেটির মত মুকুন্দ একাকী চুপটি করিয়া বসিয়া পড়িল।...

একটা কাঁঠঠোকরা পাখী আপনমনেই ঘরের পিছনের একটা নারিকেল গাছের খোড়লের মুখে অবিরাম ঘা মারিয়া শব্দ করিয়া চলিয়াছে।...

চৌদ্দ

পরদিন সন্ধ্যা ঘোর হইতে না হইতেই কালীদহের ইতর-ভদ্র সকলেই অবাক হইয়া শুনিল, মহাদেব ঢালি সদর হইতে খালাস পাইয়াছে। হাকিম নাকি অতিশয় ভালমানুষ, গরীবের মা-বাপ; মনোমত এবং উপযুক্ত প্রমাণ না পাইয়া জমিদারের বজরায় ডাকাতি এবং নায়েবকে খুন করার অভিযোগে অভিযুক্ত মহাদেবকে তিনি বেকসুর খালাস দিয়াছেন। তিনি নাকি বলিয়াছেন, এ মোকার্দ্দমা সাজান; একটি মাত্র লোকের পক্ষে একখানি লাঠি মাত্র সম্বল করিয়া অতগুলি পাইক বরকন্দাজ এবং মাল্লাদের সহিত লড়াই করিয়া ডাকাতী করা এবং বন্দুক রিভলভার ও টাকাকড়ি ইত্যাদি কাড়িয়া লওয়া সম্ভব নয়। তাঁহার ধারণা ডাকাতির সহিত হয়ত নায়েব সংশ্লিষ্ট আছে এবং প্রাতঃকালে তাহাকে যাহারা জখম করিয়াছে তাহাদের মধ্যে মহাদেব থাকিলেও উপযুক্ত প্রমাণাভাবে তিনি তাহাকে খালাস দিতে বাধ্য হইয়াছেন। মহাদেবের পক্ষ হইতে নাকি বলা হইয়াছে যে, তাহার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ একেবারেই মিথ্যা। ঐ দিন সে প্রায় সমস্ত রাত্রিই গাঁয়ের ৺চন্দ্রশেখর মুখুয্যে মহাশয়ের বাড়ীতে ছিল। ঐ রাত্রেই তাঁহার স্ত্রী ৺গঙ্গালাভ করেন। এ সম্বন্ধেও সে সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছে। মুখুয্যে মহাশয়ের মেয়ে সাবিত্রী

প্রয়োজন হইলে তাহার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। হাকিমের মত—নায়েব সম্ভবতঃ এই ডাকাতীর সহিত সংশ্লিষ্ট আছে—কিন্তু কোন দলের উল্লেখ না করিয়া ব্যক্তিবিশেষের নামে যখন চার্জ্জ আনা হইয়াছে তখন এ মামলা ভিত্তিহীন বলিয়াই তিনি অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। বিশেষ উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ এবং উপযুক্ত পুলিশতদন্তের সত্বেও কোনও জিনিষপত্র যখন পাওয়া যায় নাই। ব্যক্তিগত আক্রোশের ফলেই এই মোকর্দ্দমা দাঁড় করান হইয়াছে।

সদরের সব চেয়ে বড় উকীল মহেন্দ্রবাবু মহাদেবের পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন—এ কথা শুনিয়াও গাঁয়ের লোকেরা যেন বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিল না। যাহা হউক, মহাদেবের শাস্তি ভোগ হইল না—এই ব্যাপারটাই কাহারও নিকট যেন ভাল ঠেকিল না। সকলেই এক-বাক্যে রায় প্রকাশ করিল—এক মাঘেই শীত পালায় না, জমিদারের সহিত বিরোধ—দেখ না—কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়ায়!

খবরটা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল—এবং নায়েব রসিক গড়গড়িও হাসপাতালের বিছানায় শুইয়া দুঃসংবাদের মতই খবরটা শুনিল এবং বোধ হয় তাহার মস্তকের আঘাতের গুরুত্বটা আর একবার উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

পিতাপুত্র শ্রান্ত অবসন্ন দেহ লইয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

গণেশ ডাকিল—মা!—

মহাদেবের স্ত্রী পাগলিনীর মত ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। সংবাদ

সে ইতঃপূর্ব্বেই পাইয়াছে। সমস্ত মুখখানিতে তাহার ত্রাসের ছাপ কিন্তু তাহার মধ্যেও এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের বহিপ্র্রকাশ।

মহাদেব কোন কথা বলিল না। ধীরে ধীরে দাওয়ার উপরে উঠিয়া পা ছড়াইয়া বসিল, বলিল—একটু তামাক সাজ্, আগে আর লগিটা বার করে দে—আমি কলমীডাঙ্গা থেকে আগে হ'য়ে আসি। ঘাটে ডোঙ্গা আছে ত?

গণেশ বলিল—আছে।

মহাদেবের স্ত্রী তামাক সাজিতে সাজিতে বলিল—এখনই কি না গেলে হয় না? এই অবস্থায়···

মহাদেব বলিল—না, যেতে হবে এখুনি, যে মা'র দয়ায় বেঁচে এলাম তাঁকে খবরটা না জানিয়ে মুখে ত অন্ন তুলতে পারব না।··· আর ঘরের জিনিষ-পত্তর যা আছে বেঁধে ছেঁদে ফেল্, এ গাঁয়ে আর থাকব না—এ শালা জমিদারের তালুকে আর বসত ক'রব না কালই সব বেচে কিনে চ'লে যাব।

একটা বুকজোড়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শ্রান্ত মহাদেব হুঁকা হাতে তুলিয়া লইল।

বিলের জল এই কয়দিনে আরও বাড়িয়াছে। ধানগাছগুলি অথৈ জলের মধ্যে প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া আসিয়াছে, তবুও তাহাদের মাথা তুলিবার কি ব্যর্থ প্রয়াস! শীষগুলি জলের উপরে কোন মতে মাথা বাঁচাইয়া যেন হাবুডুবু খাইতেছে; অসহায় মরণোন্মুখ ডুবন্ত জীবের বাঁচিবার যেন শেষ চেষ্টা!···

মহাদেব বিল পাড়ি দিতে দিতে চারিদিকে চাহিয়া প্রকৃতির এই ধ্বংসলীলার অগ্রগতি দেখিয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল—যাক্, ডুবে যাক্ সব—একটি আটিও যেন কারুর ঘরে তুলতে না হয়!

কেন যে এই কথাগুলি সে বলিল, তাহার কোনও উপযুক্ত কারণ মনের মধ্যে খুঁজিয়া না পাইলেও তাহার অন্তর যেন সায় দিয়া এই কথা কয়টিই বলিতে চাহিল। এমনিই হয় মানুষের, যখন সংসারের কাছে একমাত্র তিক্ততা ছাড়া কিছুই আর তাহার পাওনা থাকে না।

সন্ধ্যার অন্ধকার বহুক্ষণ আগেই ঘোর হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আকাশে মেঘের আড়ম্বর নাই—কিন্তু নানা রং'এ দলভ্রষ্ট হইয়া তাহারা এদিকে ওদিকে বেড়াইতেছে। হাটুরেরা হাটের ফেরত লম্বা ডিঙ্গিতে দল বাঁধিয়া গান করিতে করিতে চলিয়াছে।

ডোঙ্গা ডাঙ্গার উপর টানিয়া রাখিয়া মহাদেব গ্রামের ভিতর ঢুকিল।

আজ হাটের দিন। গাঁয়ে বাজার নাই—সপ্তাহে দুইদিন হাট বসে। মণিলাল হাট হইতে এখনও ফেরে নাই। মহাদেব—দাদাঠাকুর বাড়ী আছেন নাকি—বলিয়া উঠানে গিয়া দাঁড়াইল।

সাবিত্রী ঘরে বসিয়া মামার ছোট ছেলেটিকে ঘুম পাড়াইতেছিল—গলার স্বর শুনিয়াই চিনিত পারিল এবং তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল।

বাড়ীর অন্যান্য ছেলেমেয়েরা পাড়ার চক্রবর্তীদের বাড়ী গিয়াছে—সেখানে ৺সত্যনারায়ণের পূজা হইতেছে। পূজা অন্তে তাহারা প্রসাদ পাইয়া বাড়ী ফিরিবে। মণিলালের স্ত্রী রান্নাঘর হইতে হাঁকিয়া বলিলেন—কে-রে সাবি?...

সাবিত্রী বলিল—আমাদের প্রজা হয় মামীমা—মহাদেব—কালাদ'র বাড়ী। মামী দেখিয়া চিনিলেন—এই লোকটিই সেদিন সকালে সাবির মা'র মৃত্যুসংবাদ দিতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। তিনি আবার ফিরিয়া বসিয়া রান্নায় মন দিলেন।

মহাদেব সাবিত্রীকে দেখিয়া এক গাল হাসিয়া দূর হইতেই প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—বেঁচে এসেছি মা—কেবল তোরই দয়ায়—তোরই আশীর্ব্বাদের জোরে মা।···একেবারে বেকসুর খালাস দিয়েছে।

সাবিত্রীর মুখে হাসি ফুটিল—সত্যকার অনাবিল আনন্দের হাসি। এমনি হাসি অনেকদিন সে হাসে নাই। আনন্দের আতিশয্যে সে আর কথা বলিতে পারিল না।

মহাদেব বলিল—খুব জব্দ হ'য়েছে শালা জমিদার—কিন্তু ঐ দেব্‌তাকে তুই কোথায় পেলি মা? দেবতা আমাকে বাঁচানর জন্যে যা ক'রেছে তা ত এক মুখে ব'লে শেষ ক'রতে পারব না।

সাবিত্রী মহাদেবকে দাওয়ায় উঠিয়া বসিতে বলিল। মহাদেব উঠিয়া বসিয়া এদিকে ওদিকে চাহিয়া চুপি চুপি বলিল—গণেশের হাতে একখানা চিঠি আর একটা জিনিষ তিনি দিয়েছেন মা তোকে দেওয়ার জন্যে। আমার সঙ্গে ত তাঁর আর দেখা হয় নাই—মামলার সময়ও তিনি আদালতে ছিলেন না। গণেশকে সব ব'লে আর সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই তিনি দেবতা মা, একথা আমি জোর ক'রেই ব'লতে পারি। সমস্ত দিন তিনি ষ্টেশনের ঘরে না খেয়ে-দেয়ে ব'সেছিলেন। মামলার পরে গণেশ গিয়ে তার সঙ্গে দেখা ক'রে

এসেছে। তখন এই চিঠি আর জিনিষ তিনি দিয়েছেন। বিকেলের গাড়ীতেই তিনি ক'লকাতা চ'লে গে'ছেন।

সাবিত্রী যে কি বলিবে—আর কি না বলিবে ভাবিয়া পাইল না। এদিকে ওদিকে চাহিয়া চুপি চুপি বলিল—দেখি মহাদেব চিঠিখানা।···

কাপড়ের খুঁটে সযত্নে বাঁধা চিঠিখানা খুলিয়া মহাদেব সাবিত্রীর হাতে দিল।

কম্পিত হস্তে সাবিত্রী চিঠিখানি লইয়া ঘরে ঢুকিল এবং ভাঁজ খুলিয়া পড়িল।

স্নেহের সাবিত্রী,

তোমাকে চিঠি লেখার অধিকার আমার নাই—কিন্তু তা জেনেও দু'ছত্র লেখার লোভ সামলাতে পারলাম না। খুব গোপনে প'ড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিও। বোধ হয় কালই মামার সঙ্গে মামাবাড়ীতে চ'লে গে'ছি। —তোমাদের বাড়ী থেকে এসে অবধি তোমার কথা এক মুহূর্ত্তও ভুলতে পারি নি। নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তার চেয়ে তোমার চিন্তাই মনের মধ্যে হ'য়েছে প্রবল। এ চিন্তার অবসান হবে সেদিন, যেদিন এই বুকের মধ্যে একান্তে তোমায় পাব। সেদিন কি পাব না? ভগবান কি এতই নিষ্ঠুর হবেন?···তোমার ছেলে মহাদেব খালাস পেয়েছে।—সে এক ইতিহাস—সব কথা খুলে লিখ্‌তে গেলে এক পাঁচালী হয়ে যাবে। মহাদেবের সঙ্গে আমি ইচ্ছে ক'রেই দেখা করি নি—

কারণ শোভেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যেতে পারে—এই জন্যেই, তবে গণেশের মুখেই সব শুনতে পাবে। নেহাৎ ভগবান সহায় ব'লতে হবে—নইলে আমি কি আর ভেবেছিলাম যে, এই সদরের হাকিম আমারই জানাশুনা লোক!—এঁর ছেলে অমিয় বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু আমার—আমরা একসঙ্গেই ডাক্তারী পড়েছি। তাঁকে সব কথা ভেঙ্গে ব'ললাম এবং তাঁকে বিশেষ ক'রে ধরায় তাঁরই কথামত সদরের সব চেয়ে বড় উকীল মহেন্দ্রবাবুকে মহাদেবের পক্ষে উকীল দাঁড় করিয়েছিলাম। অন্যান্য সবই মহাদেব ও গণেশের মুখে শুনতে পাবে। আর একটি কথা, সে হারছড়াটি আমি বেচতে পারি নি।—তোমার মা'য়ের জিনিষ—বেচতে আমার কেমন লাগল। আমার নিজের কাছে কিছু টাকা ছিল আর কিছু জোগাড় পত্র ক'রে কাজ একভাবে উদ্ধার হ'য়ে গেছে। তোমার কাতর অনুরোধ যে রাখতে পেরেছি আর মহাদেব যে মুক্তিলাভ ক'রেছে—এতেই আমি ধন্য। তবে মহাদেবের এই ব্যাপারের ভিতর যে কি রহস্য আছে—যদি কোনদিন সুযোগ পাই—তোমার মুখে শুনবো। আজ এই পর্য্যন্ত। আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও। আমার স্নেহ-ভালবাসা নিও। ইতি শুভার্থী

শ্রীমুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিঠিখানি পড়িয়া সযত্নে ভাঁজ করিয়া হাতের মুঠার ভিতর রাখিয়া সাবিত্রী ক্ষণকাল স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতর দুর

'ঢুর্ ঢুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং মনের ভিতর এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল। অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে একটি দীর্ঘ-শ্বাস বাহির হইবার পূর্ব্বেই সে চাপিয়া ফেলিল। মনে মনে বলিল—কি মহৎ অন্তঃকরণ! সত্যই দেবতা।

দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইতেই মহাদেব বলিল—মা, এই জিনিষটা···

ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া সাবিত্রী চুপি চুপি বলিল—ওটা তুমি আর এখানে বার ক'রো না মহাদেব, তুমি নিয়ে যাও।

মহাদেব সবিস্ময়ে বলিল—কেন মা?

সাবিত্রী বলিল—বিশেষ কারণ আছে ব'লেই ব'লছি। আর এক সময়ে তোমায় খুলে ব'লব—বলিয়া সে চোখের ইসারায় রান্নাঘরের দিকে দেখাইয়া দিল।

মহাদেব অনুমানে বুঝিল, কোন কথা বলিল না।

সাবিত্রী এদিকে ওদিকে চাহিয়া চুপি চুপি বলিল—মামী আমার বিশেষ ভাল নজরে দেখ্‌ছেন না—যেন গলগ্রহের মত এখানে এসে উপস্থিত হ'য়েছি। ওঁর মেয়ের বিয়ের কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে—ও জিনিষ আমার ভোগে লাগবে না মহাদেব। উনি দেখ্‌তে পেলেই নিয়ে যাবেন'খন। তার চেয়ে তুমিই নিয়ে যাও!

মহাদেব বলিল—এ নিয়ে আমি কি ক'রব মা?···

সাবিত্রী দুই পা আগাইয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিল—মা ব'লে ত ডেকেছ—আমারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে, দাবী আছে। গণেশের ত বিয়ে দেবে—আমি গণেশের বৌকে ওটা উপহার দিলাম। তাকে দিও। আমার দিব্যি, এতে আর তুমি অমত ক'রো না।

মহাদেব অপ্রস্তুতের মত খুব আস্তে বলিল—কিন্তু, তুই ত জানিস্ মা আমার অবস্থা—জানিস্ ত সেদিনের ব্যাপার ? এর পরেও এই জমিদারীতে কোন্ সাহসে বাস করি বল্ ? ভাগ্যিস্ ভগবান সহায় ছিলেন আর এই মাথার ওপর তোর পায়ের ধুলো ছিল মা, নইলে জেলখানার ঘানি টান্তে টানতেই এ জীবনটা যে বেরিয়ে যেত ! তাই ভেবেছি—ঐ লক্ষীছাড়া জমিদারের জমিদারী ছেড়ে গাঁ ছেড়ে কালই চলে যাব মা। ঐ গাঁয়ে থাকৃতে আমার এতটুকু ইচ্ছে নেই । সাত পুরুষের ভিটেয় আগাছা গজাবে, তা হোক্, আমি মনকে এই ব'লে বোঝাবো যে, আমি ত ইচ্ছে ক'রে ছেড়ে যাই নি। কিন্তু মা, তোর পরিণাম যে কি হবে—এ ভেবে ছেড়েছুড়ে গিয়েও যে আমি শান্তি পাব না।···ও ভদ্দর লোকটি কে মা ?···

সাবিত্রী এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিল—স্বর্গের দেবতা, আর কিছু পরিচয় ত জানিনে মহাদেব, কিন্তু তুমি কোথায় যাবে ঠিক ক'রেছ ?

মহাদেব বলিল—গণেশের মামার বাড়ী ফরিদপুরেই চ'লে যাই মা। কোথায় আর যাব বল ? আমাদের মত হতচ্ছাড়াদের যাবার আর জায়গা কোথায়ও কি আছে ? হা ভগবান !···কিন্তু যেখানেই থাকি মা—মাঝে মাঝে তোর খবর নেবই।

তারপরই স্বর যথাসম্ভব নামাইয়া বলিল—এ জিনিষ তা হ'লে আমি নিয়েই চ'ললাম মা। তোর বিয়ের সময় এসে তাহ'লে তোকে দিয়ে যাব, কেমন ?

বলিয়া মহাদেব একটু হাসিবার চেষ্টা করিল। বলিল—এইবার তা হ'লে উঠি মা, রাতও হ'য়ে গেল—ভরা বিল পাড়ি দিতে হবে।—বলিয়া

সে মাথা নীচু করিয়া প্রণাম করিয়া সাবিত্রীর পায়ের ধুলা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সাবিত্রীর চোখে জল আসিল। কি বলিতে গিয়াও সে বলিতে পারিল না।

সজল চোখে মহাদেব বলিল—আর যদি কোনদিন তোর ছিচরণ দেখা এই পোড়া অদেষ্টে নাই থাকে মা, তাতেও আমার কোনো দুঃখু নেই। তোর একটা পথ হ'য়েছে, এই কথাটা কানে শুনতে পেলেই মহাদেবের স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী হবে মা।...

পনের

জনাকীর্ণ কলিকাতার সহরতলীতে প্রকাণ্ড একটি ঔষধের কারখানা। প্রায় দুই হাজার লোক এই কারখানায় কাজ করে। নিরূপায় মুকুন্দ আজ দুই দিন হইল এখানে একটি চাকুরী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, মাহিয়ানা মাত্র পঞ্চাশ টাকা; তাহা হউক, এই পঞ্চাশটি টাকাই তাহার নিকট বর্ত্তমানে লক্ষ টাকার সমান। এত শীঘ্র এই দুর্দ্দিনের বাজারে ভাগ্য যে তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইবে তাহা সে আশা করিতে পারে নাই। এম্ বি পাশ করিয়া নামজাদা ডাক্তার হইবার স্বপ্ন তাহার ফুরাইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও নিজে গায়ে খাটিয়া রোজগারের সামান্য এই কয়েকটি টাকা—এ অর্থোপার্জ্জন সত্যই যেন সার্থক; শোভেন্দ্রের শেষ কথাকয়টি মনে হইলে সত্যই তাহার অন্তরের মধ্যে যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়! অদৃষ্টে ছিল—তাই নিরূপায় হইয়া মুখ বুজিয়া বিষমাখান কথাগুলি সেদিন তাহার শুনিয়া আসিতে হইয়াছে।

মেডিক্যাল মেস্ হইতে তল্পীতল্পা গুটাইয়া আজ তিন দিন হইল সে বেনিয়াটোলায় অতি সাধারণ গোছের একটি মেসে আসিয়া উঠিয়াছে। মেডিক্যাল কলেজের রেজিষ্টারে এখনও তাহার নামটি আছে—এ মাসটিতে থাকিবে···ভাবিতেও মুকুন্দর মনটার ভিতর কেমন যেন কাঁটার মত

বিঁধিতে থাকে। অবুঝ মন অনেক সময়ে সোজাকথাটাও বুঝিতে চাহে না। সময় সময় তাহার মনে হয়—সত্যই কি পরের গলগ্রহ না হইয়া কোন উপায়ে আর তিনটি বৎসর পড়িয়া বাহির হওয়া যায় না?...

কারখানায় কাজ করিতে করিতে এই দুইটি দিন এই কথাটাই সে কতবার ভাবিয়াছে আবার আকাশকুসুম মনে করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে। কারখানার অন্যান্য কর্ম্মচারীদের দিকে তাকাইয়া তাহার মনে হইয়াছে, কেমন কলের পুতুলের মত ইহারা কাজ করিয়া চলিয়াছে! বৃহত্তর কোন সম্ভাবনার মোহ যাহাদের নিশীথ শয্যাকে কন্টকিত করিয়া তোলে না, দুনিয়ায় বোধ তাহারাই সুখী।

এই কয়টি দিনে সে যেন নূতন মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। মেডিক্যাল ষ্টুডেণ্ট্ মুকুন্দর সহিত কয়েকদিন আগেও যাহাদের পরিচয় ছিল, এখন তাহারা বর্ত্তমানের মুকুন্দর সহিত আলাপ করিতে গেলে নিশ্চয়ই অবাক হইবে। পরিবর্ত্তন মানুষের কত শীঘ্র কতখানি হইতে পারে আশ্চর্য্য!...

এই দুই দিনে কারখানার কাজের ফাঁকে তাহার মন কতবার চলিয়া গিয়াছে কালীদহে—হীরাদীঘির ঘাটে। কতবার সে ভাবিয়াছে সাবিত্রীর কথা। সময় সময় তাহার মনে হইয়াছে, সম্পূর্ণ নিঃসহায় নিঃসম্বল সে, সামান্য চাকুরীর উপর নির্ভর করিয়া এত বড় একটি দায়িত্ব গ্রহণ করা কি তাহার পক্ষে উচিত?

আবার তখনই তাহার মনে পড়িয়াছে সাবিত্রীর বিদায়ক্ষণের সেই কথাগুলি; মনে হইয়াছে—যেন সাবিত্রী জলভরা ডাগর দু'টি চোখ মেলিয়া অধীর আগ্রহে তাহারই প্রতীক্ষায় প্রতিটি মুহূর্ত্ত কাটাইতেছে! গণেশের

হাতে তাহার চিঠিখানি পাইয়া বেচারী হয়ত কত কি রঙীন স্বপ্নের জাল বুনিতেছে !

সে চাকুরী পাইয়াছে—এ খবর শুনিয়া সাবিত্রী খুবই সন্তুষ্ট হইবে—ইহা আর কেহ না বুঝিলেও মুকুন্দ বোঝে। তাই আজ সে ভাবিতেছিল—একখানি পত্রদ্বারা মণিলাল বাবুকে আগামী কল্যই জানাইয়া দিবে।

ভাবিতে ভাবিতে সে মেসে ফিরিতেছিল। ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল—তাহার খাটের উপরে একখানি খামের চিঠি। পরিষ্কার ঝরঝরে মেয়েলী অক্ষরে লেখা তাহারই নাম ও ঠিকানা; ঠিকানা তাহার বন্ধুর বাসার—সেখান হইতে ঠিকানা কাটিয়া 'রি-ডাইরেক্ট্' করিয়া এই মেসের ঠিকানায় পাঠাইয়াছে।

চিঠি কোথা হইতে আসিয়াছে বুঝিতে মুকুন্দর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। বীরেনদের বাসার ঠিকানা সে-ই মণিলাল বাবুকে দিয়া আসিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ সাবিত্রীই এই চিঠি দিয়াছে। তাহার মনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব আনন্দের ঢেউ বহিয়া গেল। তাড়াতাড়ি খামখানির একপাশ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে চিঠি বাহির করিয়া পড়িল।

শ্রীশ্রীদুর্গা—

সহায়—

কলমীডাঙ্গা

সোমবার

শ্রীচরণকমলেষু,—

গণেশের হাতে যে চিঠি দিয়াছিলেন—তাহা সেইদিনই সন্ধ্যার পর পাইয়াছিলাম। চিঠিখানি কম করিয়া একশ'বার পড়িয়াছি আর পড়িতে পড়িতে আমার যে কিরূপ লাগিয়াছে

তাহা সামান্য পত্রে আপনাকে জানাইতে পারিলাম না। আপনি মানুষ নন—দেবতা। যে উপকার করিয়াছেন—তাহা আপনাকে আর বিশেষ কি লিখিব। আমি সর্ব্বদাই মা লক্ষ্মীর কাছে আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি—আর যাহা বলিতেছি—তাহা আপনাকে এ-পত্রে লিখিয়া আর জানাইতে পারিলাম না। আমি আপনাকে এই চিঠি লিখিতেছি খুবই গোপনে—কেউই জানে না। জানিলে এ পত্র আর আপনাকে লেখা হইত না। কলমীডাঙ্গায় মামার বাড়ীতে এই কয়দিন আসিয়া অবধি মামীর নির্য্যাতন ভোগ করিতেছি। মামা বিশেষ খারাপ দেখেন না আমাকে—কিন্তু মামীর যেন দুই চোখের বিষ আমি! আর মামীর ওপর মামাও কিছু বলিতে পারেন না। ভোরে গোবর-ঝাঁট হইতে সন্ধ্যায় গোয়ালে সাঁঝাল দেওয়া পর্য্যন্ত সব রকম কাজের ভারই এখন আমার উপর পড়িয়াছে। কাজে অবশ্য আমি পেছুই না—কিন্তু পান হইতে চুন খসিলেই মামীর মুখের দিকে তাকান ভার হইয়া ওঠে। কিন্তু এ সবে'ও আমার কোন দুঃখের কারণ ছিল না। বহুকষ্টে মামার বাক্স হইতে আপনার ঠিকানা একপ্রকার চুরি করিয়াই আপনাকে এই পত্র লিখেতেছি। আমার বিবাহ এখানে একপ্রকার স্থির হইতে চলিয়াছে। কমপক্ষে সত্তর বছরের এক বুড়োর সঙ্গেই মামা-মামী আমাকে দেওয়ার মনস্থ করিয়াছেন। আমি হইব তাঁর তৃতীয়পক্ষ, এই গ্রামেই বাড়ী—অবস্থাপন্ন কৃপণ—এক পাল ছেলে-মেয়ে—নাতিনাতনী তাঁর। ছেলেদের সঙ্গে তিনি পৃথক;

বুড়োবয়সে তাঁর সেবাশুশ্রূষার জন্য আমাকে তাঁহার একান্ত দরকার। গতকাল বৈকালে দেখিতে আসিয়া আমার রূপের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন এবং ৩০শে তারিখে বিয়ের দিন স্থির করিবার জন্য মামাকে বারবার বলিয়া গিয়াছেন। আমাকে বিসর্জ্জন দিয়া মামামামী কিছু মোটা টাকা বুড়োর নিকট হইতে পাইবেন মনে হয়—এবং মামীর ইচ্ছা—[illegible]র মেয়ে দুইটিকে সেই টাকা দিয়া ভাল পাত্র দেখিয়া শুভদিনে বিয়ে দেন। আমি আপনাকেই অন্তরের মধ্যে স্বামী বলিয়া—দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আমি আমার কর্ত্তব্যও ঠিক করিয়া ফেলিয়াছি। আমি আপনাকে কোনরূপ বিপদের মধ্যে বা অসুবিধার মধ্যে ফেলিতে চাহি না, কারণ সবই ত আপনি বলিয়া গিয়াছেন। তবে সত্যই যদি সেই বুড়োর গলায় মালা দিতে হয়—তাহার পূর্ব্বে আমি বিয়ের রাত্রেই কাপড়ে আগুন জ্বালিয়া এ জীবন শেষ করিয়া দিব। অধিক আর আপনাকে কি লিখিব। আমার নামে কোন চিঠিপত্র দিবেন না। ইতি—

প্রণতা সাবিত্রী

চিঠিখানি মুকুন্দ ক্রমান্বয়ে তিনবার পড়িল।......পরিষ্কার ছাঁদের হরফ—চমৎকার লেখা......পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া মুকুন্দ আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।

দেওয়ালে বাংলা ইংরাজী মিশান একখানি ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাইয়া মুকুন্দ দেখিল আজ ২৮ তারিখ। ভাল করিয়া চাহিয়া আর

একবার দেখিল। তারপরই একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।……আজ আটাশ, পরশু ত্রিশ তারিখ, ভাবিতেও মুকুন্দর কাছে পৃথিবীর আলোবাতাস যেন মুছিয়া গেল। কি ভাবিয়া একখানা চিঠি লিখিবার জন্য সে কলম ও প্যাড্ টানিয়া লইল এবং কিছু লিখিবার পূর্ব্বেই আবার কি ভাবিয়া ঘড়ির দিকে তাকাইয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

যোগ

গতরাত্রে শুভলগ্নে শুভকাজ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাসি-বিয়ে ও কুশণ্ডীকা সম্পন্ন হইতে ও আহারাদির পর্ব্ব সমাপ্ত হইতে বেলা প্রায় চারিটা বাজিয়া গেল। নবপরিণীতা বধূকে লইয়া পাল্‌কী চড়িয়া বর চলিয়াছে বিলের ঘাটে। সেখান হইতে নৌকাযোগে তাহারা রওনা হইবে।

পাল্‌কীর দুই পার্শ্বে হৈ হৈ করিতে করিতে চলিয়াছে গ্রামের ছোট ছোট দিগম্বর ছেলেমেয়েদের দল। পিছনে ঢোলক ও সানাই বাজাইতে বাজাইতে আসিতেছে তিনজন বাজাদার; তাহাদের পিছনে আসিতেছে সাশ্রুনয়নে মণিলাল—সঙ্গে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থপাড়ার জন কয়েক লোক। তাহাদের পিছনে মেয়ে ও বৌ'দের দল—কাহারও কাহারও ...খ আবার কলসী রহিয়াছে।

রজনীগন্ধার মত অপরূপ পরমাসুন্দরী বধূ সাবিত্রী বসিয়া আছে মাথা নীচু করিয়া—চোখে তাহার জল; আর তাহারই পার্শ্বে বসিয়া পরম-সুন্দর বর মুকুন্দ। যে দেখিল—সেই বলিল—খাসা মানাইয়াছে—এমনটি না হইলে কি আর মানায়?·· পড়শীরা বলিল—একেই বলে যোগাযোগ। মণিলাল বলিল—যাক্, মেয়েটার তবু একটা হিল্লে হ'ল। মণিলালের স্ত্রী মনে মনে বলিল—পাপ বিদেয় হ'ল।

বিলের ঘাটে মনসাতলায় আসিয়া বেহারারা পাল্কী নামাইল। হুড়মুড় করিয়া দুইপাশ হইতে ছেলেমেয়েদের দল গিয়া পাল্কীটাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের সরাইয়া দিয়া দুই পাশ হইতে দুইটি মেয়ে মুকুন্দ ও সাবিত্রীকে পাল্কী হইতে হাত ধরিয়া নামাইল।

সমবয়সী একটি মেয়ে সাবিত্রীর কানে কানে বলিল—কি ভাই—এখনও কাঁদছিস্ যে, ছিঃ! বুড়োর গলায় ত আর মালা দিতে হ'ল না—রাজপুত্তুর বর নিজে পায়ে হেটে এসে মালা দিয়েছে—আবার কি চাইবে? মনের মত বর পেলি—আবার চোখে জল কিসের জন্যে লা?...

সাবিত্রী না পারিল কথা বলিতে—না পারিল মুখ ফিরাইতে।...আজ সে স্বামীর সংসার করিতে চলিয়াছে; আজ তাহার মা নেই—অভিমানে দুঃখে তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন—এত বড় দুঃখ আজ সে চাপা দিবে কেমন করিয়া?......

নৌকায় উঠাইয়া দিয়া মণিলাল মাঝিকে বারংবার সাবধান করিয়া দিয়া। বলিল—মাঝি, ভরা বিল, খুব সাবধান কিন্তু! বড় জল হ'লে যেখানেই হোক্, নৌকো বেঁধো কিন্তু—আর খালের মুখে অসম্ভব রাগ। ওদের না হয় নামিয়ে দিয়ে খালি নৌকো টেনে আগে নদীতে বার ক'রে নিও। বেশী রাত ক'রে ফেলো না আবার—রাত্তির গাড়ী যেন ফেল্ না হয়।......

একটি বৌ আসিয়া মুকুন্দকে বলিল—শুনছেন—অ মশাই!—আমি আপনার বৌদি হই! নৌকোয় ত চাপ্‌ছেন—আর দেরী সইছে না বুঝি? চোরের মত তাড়াতাড়ি নিয়ে সরতে পারলেই বাঁচেন, না?

হাসিয়া মুকুন্দ মৃদুস্বরে বলিল—তা যা ব'লেছেন বৌদি—এখানে চোর

সাজাই বুদ্ধিমানের কাজ, যে গাঁ আপনাদের? তবুও ভরসা যে সাত-পাকটা কালই সেরে নিয়েছি—নইলে যার ওপর বুড়ো মানুষের লোভ যায়—তাতে আর আমাদের মত……

বাকী কথা কয়টি হাসির দ্বারাই মুকুন্দ বুঝাইয়া দিল।

তারপর বলিল – বেলা আর নেই বৌদি—আবার খুলনায় গিয়ে গাড়ী ধরতে হ'বে—এইজন্যেই যা একটু তাড়াতাড়ি ক'রছি—নইলে সত্যিই ব'লছি বৌদি, আপনাদের ফেলে যেতে একটুও ইচ্ছে ক'রছে না।

ঠোঁট উল্টাইয়া চোখ টানিয়া বৌদি বলিলেন—আমরাই বা রাখি কোন্ ভরসায়? যাই হোক্, নৌকোর মধ্যে এক সঙ্গেই দিলাম বটে তবে গরীব বৌদির একটি কথা দয়া ক'রে রাখবেন। আপনারা ত আবার সহরের লোক—নিয়মকানুন কিছুই মানতে চান না।

মুকুন্দ হাসিয়া বলিল—আচ্ছা আপনার কথা শুনবো, বলুন কি ক'রতে হবে? ····

বৌদি বলিলেন—আজ কালরাত্তির, সেটা যেন খেয়াল থাকে রাত্রে এক গাড়ীতে থাক্‌বেন না কিন্তু! সাবিত্রীকে মেয়ে-গাড়ীতে দিয়ে দেবেন। বুঝেছেন মশাই? এই বেলায় যত পারেন, মুখে মুখ দিয়ে বকবক্ করুন! আবার আস্‌ছেন ত শীগ্‌গিরই?

—চেষ্টা ক'রব বৌদি কথা দিতে পারছি না কবে পারব—তবে চিঠি লিখ্‌বো।

একটা 'বৌ কথা কও' পাখী পার্শ্বস্থ একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের মগডালে বসিয়া অকারণে চিৎকার করিয়া মরিতেছিল,—বৌদি চোখের ইঙ্গিতে ভাবপ্রকাশ করিয়া বলিলেন—ঐ শুনুন!

মুকুন্দ হাসিয়া বলিল—শুনেছি বৌদি···পাখীটা কি অসভ্য দেখুন, এতগুলি লোকের সামনে···

নৌকা ধীরে ধীরে কূল ছাড়াইল। মাঝি বৈঠা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া এবার লগি মারিতে আরম্ভ করিল। ডুবন্তপ্রায় ধানগাছগুলি দুই খণ্ডে কাটিয়া নিজের পথ রচিয়া ঢেউ তুলিয়া নৌকাখানা ছল্ ছল্ শব্দে ছুটিল।

মুকুন্দ বলিল—মাঝি, সন্ধ্যের আগেই কিন্তু বিল থেকে বেরিয়ে যাওয়া চাই। অবিশ্যি এইভাবে টেনে গেলে খুব পারলে! একটু কষ্ট ক'রে রাতের গাড়ীটা ধরিয়ে দাও—তোমায় বক্‌শীশ্ দেব'খন। গাড়ী না ধ'রতে পারলেই মুস্কিল—সমস্ত রাত ষ্টেশনে পঁচতে হ'বে তা হ'লে।

মাঝি বলিল—কেন ভাবনা ক'রছেন বাবু? মাঝিগিরি ক'রে এই মাথায় চুল পাকিয়ে ফেললাম! চুপ ক'রে বসুন, গাড়ীর ঢের সময় থাক্‌বে বাবু। এ বিল ত পাড়ি দিলাম ব'লে!······

গাঁয়ের ঘাট ছাড়াইয়া নৌকা অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছে। সূর্য্য আকাশের শেষপ্রান্তে গিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘাটের লোকদের এতদূর হইতে কেমন আব্‌ছায়ামত দেখাইতেছে—তবুও সাবিত্রী অপলকচোখে সেদিকে তাকাইয়া রহিয়াছে—চোখ তাহার জলে ভরা।

মুকুন্দ বলিল—সাবিত্রী, ও-ভাবে আর তাকিয়ে থেকো না, এদিকে ফিরে বোসো। চোখে জল দেখলে মনটা আমার সত্যিই কেমন ক'রে ওঠে—তুমি কাঁদছ কেন ব'লতে পার?···

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে সাবিত্রী বলিল—জানি না চোখে কেন জল আসছে? মা'র কথাটা বড্ড মনে প'ড়ছে। সাবিত্রী অঞ্চলপ্রান্তে মুখ ঢাকিল।

সাজাই বুদ্ধিমানের কাজ, যে গাঁ আপনাদের? তবুও ভরসা যে সাত-পাকটা কালই সেরে নিয়েছি—নইলে যার ওপর বুড়ো ...ষের লোভ যায় —তাতে আর আমাদের মত······

বাকী কথা কয়টি হাসির দ্বারাই মুকুন্দ বুঝাইয়া দি...

তারপর বলিল – বেলা আর নেই বৌদি—আবার ...নায় গিয়ে গাড়ী ধরতে হ'বে—এইজন্যেই যা একটু তাড়াতাড়ি ক...—নইলে সত্যিই ব'লছি বৌদি, আপনাদের ফেলে যেতে একটুও ইচ্ছে ...ছে না।

ঠোঁট উল্টাইয়া চোখ টানিয়া বৌদি বলিলেন—...রাই বা রাখি কোন্ ভরসায়? যাই হোক্, নৌকোর মধ্যে এক সঙ্গেই ...ম বটে, তবে গরীব বৌদির একটি কথা দয়া ক'রে রাখবেন। আ...রা ত আবার সহরের লোক—নিয়মকানুন কিছুই মানতে চান না।

মুকুন্দ হাসিয়া বলিল—আচ্ছা আপনার কথা শুন্‌বো, ...ন কি ক'রতে হবে? ····

বৌদি বলিলেন—আজ কালরাত্তির, সেটা যেন খেয়াল থাকে। রাত্রে এক গাড়ীতে থাক্‌বেন না কিন্তু! সাবিত্রীকে মেয়ে-গাড়ীতে দিয়ে দেবেন। বুঝেছেন মশাই? এই বেলায় যত পারেন, মুখে মুখ দিয়ে বক্‌বক্ করুন! আবার আস্‌ছেন ত শীগ্‌গিরই?

—চেষ্টা ক'রব বৌদি কথা দিতে পারছি না কবে পারব—তবে চিঠি লিখ্‌বো।

একটা 'বৌ কথা কও' পাখী পার্শ্বস্থ একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের মগডালে বসিয়া অকারণে চিৎকার করিয়া মরিতেছিল,—বৌদি চোখের ইঙ্গিতে ভাবপ্রকাশ করিয়া বলিলেন—ঐ শুনুন!

মুকুন্দ হাসিয়া বলিল—শুনেছি বৌদি···পাখীটা কি অসভ্য দেখুন, এতগুলি লোকের সামনে···

নৌকা ধীরে ধীরে কূল ছাড়াইল। মাঝি বৈঠা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া এবার লগি মারিতে আরম্ভ করিল। ডুবন্তপ্রায় ধানগাছগুলি দুই খণ্ডে কাটিয়া নিজের পথ রচিয়া ঢেউ তুলিয়া নৌকাখানা ছল্ ছল্ শব্দে ছুটিল।

মুকুন্দ বলিল—মাঝি, সন্ধ্যের আগেই কিন্তু বিল থেকে বেরিয়ে যাওয়া চাই। অবিশ্যি এইভাবে টেনে গেলে খুব পারবে! একটু কষ্ট ক'রে রাতের গাড়ীটা ধরিয়ে দাও—তোমায় বক্‌শীশ্ দেব'খন। গাড়ী না ধ'রতে পারলেই মুস্কিল—সমস্ত রাত ষ্টেশনে পঁচতে হ'বে তা হ'লে।

মাঝি বলিল—কেন ভাবনা ক'রছেন বাবু? মাঝিগিরি ক'রে এই মাথায় চুল পাকিয়ে ফেললাম! চুপ ক'রে বসুন, গাড়ীর ঢের সময় থাকবে বাবু। এ বিল ত পাড়ি দিলাম ব'লে!······

গাঁয়ের ঘাট ছাড়াইয়া নৌকা অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছে। সূর্য্য আকাশের শেষপ্রান্তে গিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘাটের লোকদের এতদূর হইতে কেমন আব্‌ছায়ামত দেখাইতেছে—তবুও সাবিত্রী অপলকচোখে সেদিকে তাকাইয়া রহিয়াছে—চোখ তাহার জলে ভরা।

মুকুন্দ বলিল—সাবিত্রী, ও-ভাবে আর তাকিয়ে থেকো না, এদিকে ফিরে বোসো। চোখে জল দেখলে মনটা আমার সত্যিই কেমন ক'রে ওঠে—তুমি কাঁদছ কেন ব'লতে পার?···

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে সাবিত্রী বলিল—জানি না চোখে কেন জল আসছে? মা'র কথাটা বড্ড মনে প'ড়ছে। সাবিত্রী অঞ্চলপ্রান্তে মুখ ঢাকিল।

মুকুন্দ আরও কাছে আসিয়া বসিল, সস্নেহে ডাকিল—সাবিত্রী !···

সাবিত্রী মুখ তুলিল। মুকুন্দ বলিল—ছিঃ, কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো একেবারে রাঙ্গা ক'রে তুলেছে ! আমার কথা শোন—ঘোমটা খুলে ফেল দিকি—এখানে ত কেউ আর দেখ্‌তে আস্‌ছে না।

মুকুন্দ নিজেই সাবিত্রীর ঘোমটা-টা টানিয়া সরাইয়া দিল। বলিল—আগে চোখ মুখটা ধুয়ে ফেলো ত লক্ষ্মীটি !······

নৌকা হইতে হাত বাড়াইয়া জল লইয়া চোখে মুখে দিয়া সাবিত্রী কাপড়ের আঁচলে মুখ মুছিতে যাইতেছিল—মুকুন্দ তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল এবং কাছে টানিয়া আনিয়া নিজেই পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া নিজহাতে তাহার মুখখানি বেশ করিয়া মুছাইয়া দিল।

সাবিত্রী অস্ফুটে বলিল—মাঝি !·········

সাবিত্রীকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া ভিতরদিকে সরিয়া বসিয়া মুকুন্দ বলিল—দাঁড়িয়ে লগি মারছে যে—দেখ্‌তে পারছে না ছই'এর ভেতর !···বলিয়াই তাহার কপোলে একটি চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিয়া সস্নেহ-আবেগে বলিল—সাবিত্রী, সত্যি কথাই তোমায় বল্‌ছি—দীঘির ঘাটে তোমায় প্রথম দেখেই আমি চিনতে পেরেছিলাম। শেষ পর্য্যন্ত সত্যিই যদি তোমার মামামামী আমার হাতে তোমায় না দিতেন—তবে যে কি ক'রতাম, জানিনা। সে বুড়োটার আমার ওপর খুব রাগ হ'য়েছে না ?

কৃত্রিম অভিমানে সাবিত্রী বলিল—জানি না।

হাসিয়া মুকুন্দ বলিল সত্যিই সাবিত্রী, তোমায় দেখে আমার মনের আশা মেটে না। এত সুন্দর তুমি—এত ভাল—অথচ তোমার মামী

কেমন তোমায় বলিদানের ব্যবস্থা ক'রেছিলেন!······বাস্তবিক, হয়ত তুমি কি মনে ভাববে—কিন্তু সত্যি কথাই তোমায় বলছি সাবিত্রী—আর জন্মে বোধ হয় ভগবানের কাছে রূপের জন্যে উপাসনা করেছিলে—তাই এজন্মে এত রূপ······

বাধা দিয়া সলজ্জহাস্যে সাবিত্রী বলিল—রূপ না ছাই—আমার আবার রূপ!······

স্মিতহাস্যে মুকুন্দ বলিল—রূপসী মেয়েরা অহঙ্কারী হয় শুনেছিলাম—তোমায় দেখে আমার সে ধারণা বদ্‌লে গেল সাবিত্রী। আমার লোকসানের চেয়ে লাভের ভাগটাই যেন বেশী ব'লে মনে হ'চ্ছে।

সাবিত্রী জিজ্ঞাসুনেত্রে বলিল—কেন?

মুকুন্দ বলিল—লোভেন্দ্রের পয়সায় ডাক্তারীটা প'ড়ছিলাম—কলেজে বেশ নামও ক'রেছিলাম। ভেবেছিলাম পাশটা দিয়ে যেমন ক'রে পারি, একবার বিলেত ঘুরে এসে একটা হোমড়া-চোমড়া বিলাত-ফেরত ডাক্তার হ'য়ে ব'সে যাব প্র্যাকটীশ্ ক'রতে—মোটর হাঁকাব। তা সে আশায় ছাই পড়েছে—ভালই হ'য়েছে। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই। কারণ, যদি কোনদিন পাশ ক'রে বেরিয়ে ডাক্তার হবার পর লোভেন্দ্রের মুখে এই কথাগুলো শুনতে হ'ত—তাহ'লে ঘৃণায় লজ্জায় ডাক্তারী পেশা ত ছাড়তে হ'তই—হয়ত গ্লানিতে আমার আত্মহত্যা করা ছাড়া শেষে আর গত্যন্তর থাকৃত না।······তুমি যাই বলো সাবিত্রী, সংসারে যার মা-বাবা নেই—তার কেউ নেই এবং শুধু সেইজন্যেই—শুধু তাই ভেবেই তোমার চিঠি পেয়ে পাগলের মত ছুটে এসেছিলাম—তোমায় বুকে তুলে নিতে।

সাবিত্রীর মুখখানা যেন অকস্মাৎ অন্ধকার হইয়া গেল। বলিল—

আমার জন্যে তোমার অনেক শাস্তিভোগ হ'ল। ব'লতে গেলে—আমিই তোমার পথের কাঁটা হ'লাম।

মুকুন্দ মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল - কেন সাবিত্রী ?

—আমাকে বাঁচাতে গিয়েই না তোমার এত শাস্তি!……বলিয়া ই সাবিত্রী মুখ ফিরাইয়া লইল। বলিল—আচ্ছা, আমাদের এ বিয়ের কথা সেই হতভাগা জমিদারটা জানতে পারেনি ত ?

হো হো করিয়া হাসিয়া মুকুন্দ বলিল—সে কথা আর এখন জান্‌ছি কি ক'রে বল ? আজই ত একটি লোককে দেখলাম, মনে হ'ল যেন শোভেন্দ্রেরই কোন লোক,—সেদিন শ্রীনগরেই দেখেছিলাম বোধ হয়! রাস্তায় হঠাৎ একবার দেখা হয়েছিল তখন, জানাটাই ত স্বাভাবিক তার। আর টের পেলেই বা কি ? কিন্তু শোভেন্দ্রের ওপর আজকের দিনে তোমার এতটা রাগা উচিত হচ্ছে না কিন্তু সাবিত্রী।……

বলিয়াই সাবিত্রীর চিবুক ধরিয়া মুকুন্দ বলিল—সেই ত তোমার এ বিয়ের ঘটক নইলে কোথায় বা ছিলাম আমি—আর কোথায় বা ছিলে তুমি ?……

সাবিত্রীর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। বলিল—ঘটক বিদায় তুমিই করলে—না ঘটকই তোমায় বিদায় দিলে ?

হাসিয়া মুকুন্দ বলিল—ঘটক বিদায় সেদিন ভাল মতই পেতাম, যদি সেদিন শোভেন্দ্র আমায় সদরে দেখতে পেত আর জানতে পারত যে, আমিও এর মধ্যে রয়েছি। ভাল কথা, তোমার ছেলেকে ত দেখতে পেলাম না সাবিত্রী !

সাবিত্রী বলিল—কি ক'রে আর দেখবে ? কে-ই বা তাকে আমার

বিয়ের খবর দিতে গে'ছে? কোন রকমে একটু খবর পেলেই সে ছুটে আসত। আর ও গাঁ ছেড়ে সে চলে যাবে ব'লে গিয়েছিল—চ'লেই গেছে হয়ত।

—কেন? চ'লে যাবে কেন?

—এ জমিদারের জমিদারীতে সে আর বাস ক'রবে না ঠিক ক'রেছে।

মুকুন্দ বলিল—ভালই ক'রেছে। বাস্তবিক সাবিত্রী, আমার মনে হ'চ্ছে, আমি যেন আজ মুক্ত। তোমায় পেয়ে আমি খুবই সুখী। ঈশ্বরকে আমি শতসহস্র বার ধন্যবাদ দিচ্ছি এ জন্যে যে, তিনি আমায় পথের সন্ধান দিয়েছেন।...

সাবিত্রী মুখ নীচু করিয়াই বলিল—এ কয়দিন আমি দিন রাত মা-লক্ষ্মীকে ডেকেছি।

হাসিয়া মুকুন্দ বলিল—সে জন্যেই ত চাকরীর জন্যে ছ'মাস বেকার অবস্থায় ঘুরতে হ'ল না। চাকরীটায় ঢুকেই দু'দিন কামাই করতে হ'ল। যাই হোক, এখন পঞ্চাশ টাকায় ঢুকলাম বটে, তবে পরে উন্নতি হবে। এতেই আমাদের দু'জনার চ'লে যাবে কি বল?......

ঘাড় নাড়িয়া সাবিত্রী সম্মতি জানাইল।

মুকুন্দ বলিল—আমি ত সমস্তদিন প্রায় বাইরে থাকব—ঘরে একা একা থাকতে তোমার খুবই কষ্ট হবে, না?

সাবিত্রী বলিল—কি আর কষ্ট!......

মুকুন্দর সাবিত্রীর মুখের উপর হইতে যেন চোখের দৃষ্টি সরাইতে ইচ্ছা হইল না। বলিল—সাবিত্রী, একটা কথা কতবার মনে হ'য়েছে

অথচ তোমায় জিজ্ঞেস করা হয়নি, বলব ?···আচ্ছা, শোভেন্দ্র লক্ষ্মীছাড়াটা তোমায় চিন্‌ল কি ক'রে ?······

সাবিত্রী বোধ হয় এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুতই ছিল, বলিল—দীঘির ঘাটে ওর বজরা একদিন সন্ধ্যের আগে এসে ভেড়ে—আমি তখন দীঘির ঘাটেই গা ধুতে গিয়েছিলাম—তখন আমায় দেখেছিল। আগে কখনও দেখিনি ওকে······

সাবিত্রী মুখ নীচু করিয়া যেন নিজেকে সামলাইয়া লইল। ঐ একটি দিনের ঐ কয়েকটি ঘণ্টা সময় তাহার জীবনে যে কত বড় পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়া গিয়াছে—তাহা একমাত্র অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কাহারও নিকট কি বলিবার ?······কি সে বলিবে ? স্বামীর নিকট বলিবার মত কি আছে তাহার ?

সন্ধ্যারাণী ধীরে ধীরে তাঁহার অঞ্চল-প্রান্তে দিনের সমস্ত আলো প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন।···বিল ছাড়াইয়া নদীর [illegible] ভাটির টানে গা ভাসাইয়া দিয়া নৌকা ছল্ ছল্ শব্দে চলিয়াছে।

মুকুন্দ বলিল—আমিও তাই ভেবেছিলাম সাবিত্রী।······আচ্ছা, ওদের যা মতলব ছিল তা যদি ওরা ক'রতে পারত—তা হ'লে সে অবস্থায় কি ক'রতে তুমি ?

বলিয়াই মুকুন্দ হাসিয়া ফেলিল।

সাবিত্রী যেন শিহরিয়া উঠিল, বলিল—সে উপায় মেয়েরা জানে—যখন তারা তাদের সর্ব্বস্ব হারাতে বসে। নদীনালায় এখনও জলের অভাব হয়নি—উনুনে আগুন আছে।

মুকুন্দ বলিল—কিন্তু নদী খাল বিল এ-সব সবজায়গায় থাকে না সাবিত্রী। ওদের যা উদ্দেশ্য ছিল—তা শুনলে তুমি……

বাধা দিয়া সাবিত্রী বলিল—থাক্, সে কথা আমি শুনতে চাই না……আমার ভাল লাগে না।

মুকুন্দ একটু অপ্রস্তুত হইল, বলিল—আচ্ছা আচ্ছা—ও-সব কথা আর তুলবো না। তুমি কিছু মনে ক'রো না সাবিত্রী।—বলিতে বলিতে মুকুন্দ সাবিত্রীকে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল, বলিল—দু'একদিন আমরা মাসীমার ওখানে থাকব'খন। কালই ত মাসীমার বড় ছেলে নবীনকে টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছি শিয়ালদ' ষ্টেশনে এসে আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে। তারপর একটা বাসা দেখে শুনে নিয়ে আমরা দু'জনে সুখের নীড় বাঁধবো, কি বলো ?……

সাবিত্রীর মুখখানা আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আবেগোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মুকুন্দ সাবিত্রীকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিল—সাবিত্রী, কি ইচ্ছে ক'রছে জানো ?—আমাদের এ চলার যেন আর শেষ না হয়—তোমায় বুকের ভেতর বেঁধে যেন চিরদিন এমনি ভাবেই ভেসে বেড়াতে পারি—তোমার মুখখানার ওপর থেকে কোনদিন যেন চোখের পলকটিও না ফেলতে হয়……

সতের

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাবিত্রীকে একখানি 'ইণ্টার ক্লাশ্' মেয়েদের কামরায় তুলিয়া দিয়া মুকুন্দ প্লাট্‌ফর্মে নামিয়া দাঁড়াইল। বলিল—কোন ভয় নেই তোমার—চুপচাপ ঘুমিয়ে থাক, আমি মাঝে মাঝে এসে খবর নেব'খন।

হাসিয়া সাবিত্রী চুপি চুপি বলিল—তবে আর এক গাড়ীতে উঠতে আপত্তি ছিল কি? যা নিয়ম আছে তা মানতে হয়। বেহুলার কথা জান ত? বৌদি কি ব'ললেন তোমায়? শুধু এক জায়গায় থাকা নয়—মুখ দেখতেও নাই।

মুকুন্দ ম্লান হাসি হাসিয়া চুপি চুপি বলিল—কিন্তু তোমাকে একা ফেলে আর এক গাড়ীতে গিয়ে উঠতে আমার মন সরছে না। আচ্ছা, কাটুক্ কোনমতে রাতটা—ভোরে গাড়ী থামলেই রবীনেতে আমাতে বধূবরণ ক'রতে আসব'খন, কি বল?

সাবিত্রী হাসিয়া ঘাড় কাৎ করিল। ওপাশ হইতে একটি বৌ মুচকি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি ভাই—নতুন সংসারে ঢুকলে বুঝি? ভাল!

সাবিত্রী ঘাড় ফিরাইয়া হাসিয়া ফেলিল। ওদিকে গাড়ীর ঘণ্টা দিয়াছে। মুকুন্দও হাসিতে হাসিতে কয়েকখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা ছাড়িয়া একখানি মধ্যম শ্রেণীর কামরায় গিয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার সঙ্গে

সঙ্গেই গাড়ীতে গিয়া উঠিল আর একটি যুবক এবং মুকুন্দর পার্শ্বেই বসিয়া একটি সিগারেট ধরাইল।

গাড়ী ধীরে ধীরে প্লাট্‌ফর্ম্ ছাড়াইল।

এক গাল ধোঁয়া ছাড়িয়া আড়চোখে মুকুন্দর দিকে তাকাইয়া যুবক বলিল—কতদূর যাবেন আপনি?

জড়ান বিছানাটা খুলিতে খুলিতে মুকুন্দ বলিল—যতদূর এ গাড়ী যাবে।

—ও, ক'ল্‌কাতা—বলিয়া যুবকটি সিগারেটে এক জোর টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল—আসুন, সিগারেট নিন্!

মুকুন্দ বলিল—মাফ্ ক'রবেন মশাই, আমি কোনও নেশারই বাধ্য নই।

চোখ টানিয়া যুবক সহাস্যে বলিল—ও মশাই, তা হ'লে ত একটা heavy establishment বাঁচিয়ে ফেলেছেন দেখছি। যাই হোক্, 20th centuryতে বিশেষ ভাল ছেলের লক্ষণ এ। Excuse me, আপনি কি student?

মুকুন্দ পাতা বিছানার উপর আড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল—হাঁ, medical.

—ও, কোন্ Year Sir, আপনার?……

—এই 3rd. Year M. B. চ'লছে।

গায়েপড়া আলাপ এড়াইবার জন্যই মুকুন্দ তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

যুবকটি বলিল—বেশ বেশ, আপনারা ত মশাই জীবনের পথ বেছে-

গুছে নিয়েছেন—তা এদিকে কোত্থেকে আসছেন? বেশ-ভূষা দেখে যেন কেমন কেমন লাগ্‌ছে দাদা !······

বিরক্তি মনের মধ্যে চাপিয়া মুকুন্দ বলিল—আ[illegible] বে' ক'রে ফিরছি।

যুবকটি যেন অতিমাত্রায় উৎসাহিত হইয়া উ[illegible]। বলিল—তবে ত মশাই, আমরা মিষ্টিমুখের দাবী ক'রতে পারি।

মুকুন্দর হাসি পাইল। বলিল—দাবী ত ক'র[illegible] পারেন, তা আপনি এদিকে কোত্থেকে আস্‌ছেন? যাবেনই বা কোথায়?

যুবকটির দন্তপংক্তি বিকশিত হইয়া উঠিল। ব[illegible]—আমি? —হেঃ, আমাদের কথা আর ব'লবেন না মশাই!—মাছিমারা [illegible]-অন্তর কেরাণী-গিরিতে ঢুকেছি মশাই এই তিনটি বচ্ছর। ছ'মা[illegible]রে তিন দিনের ছুটিতে দেশে এসেছিলাম মশাই—আবার এই ফিরছি[illegible] আবার কাল ত বেলা উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই ঘানিগাছে গিয়ে লাগতে হ[illegible] হে-হে-হে—

প্রসঙ্গ এড়াইবার জন্য যুবকটি বেঞ্চের উপর পা[illegible]ইয়া টান টান হইয়া শুইয়া পড়িয়া রামপ্রসাদী গান ধরিল—

কলুর চোখ-বাঁধা বলদের মত—
চাকরী-মা আর ঘুরাবি কত?
আর্কীস্—গাছে জুড়ে দিয়ে মা—
পাক দিতেছ অবিরত!
একবার তুলে দে মা আর্কীস্গুলো
দেখি মা তোর অভয় পদ।······
মা আমায় আর··········

মুকুন্দ মনে মনে হাসিতে লাগিল। মনে মনেই বলিল—আচ্ছা পাগল

সহযাত্রী জুট্‌লো বটে!……পাশ ফিরিয়া শুইয়া সে কত কি-ই চিন্তা করিতে লাগিল। মনের মধ্যে কত কি রঙীন স্বপ্নের জাল বুনিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল—সাবিত্রীর কথা—নিজের কথা—নিজেদের ভবিষ্যতের কথা; কত কি…একটার পর একটা…। গত রাত্রে মোটেই ঘুম হয় নাই—শরীরটাও তাহার অবসন্ন বোধ হইতে লাগিল।

চিৎপাত হইয়া শুইয়া যুবকটি ও-পাশ হইতে বলিল—ও ভদ্দর্‌লোক, ঘুমুলেন নাকি?…মুকুন্দ চোখ বুজিয়া ছিল। ঘুমের ভাণ করিয়া ইচ্ছা করিয়াই কথা বলিল না।

যুবকটি আবার গুণ গুণ করিয়া গান ধরিল—

"এবার বড় মা আমার টানাটানি প'ড়েছে—
উপার্জ্জনের নামটি নেই মা—দেনায় মাথা ডুবেছে।
বড় টানাটানি প'ড়েছে।
বাজারেতে ধার মেলে না—এবার চুরি ক'রব শ্যামা—
চুরি ক'রব তোর ঐ পা দু'খানি।…"

মুকুন্দ কিছুক্ষণ বাদে সত্যাই ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত দুইটার উপর। ট্রেণ আসিয়া বনগাঁ ষ্টেশনে থামিয়াছে।

যুবকটি নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া ছিল, আড়মোড়া খাইয়া উঠিয়া বসিল; চাহিয়া দেখিল, মুকুন্দ নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে।

কামরার দরজা খুলিয়া যুবকটি প্লাটফর্ম্মের উপর নামিল। রাত্রি অনেক—তার উপর কিছুক্ষণ আগে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। যাত্রীরা কেহ বিশেষ গাড়ী হইতে নামে নাই। জংসন ষ্টেশন, ট্রেণ এখানে

প্রায় দশ মিনিট থামিবে। ফিরিওয়ালারা হাঁকিয়া চলিয়াছে—গরম চা, বাবু—পান বিড়ি সিগারেট—গরম খবার···ইত্যাদি। যাহারা রাণাঘাট লাইনে যাইবে, তাহারা কুলীদের লইয়া ব্যস্ত। কেহ হাঁকিতেছে—কুলী—এই কুলী—ইধার আও!

যুবকটি সম্মুখের দিকে কিছুটা গিয়া একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিল এবং অর্দ্ধসুপ্ত একটি লোককে ঈষৎ ধাক্কা দিয়া জাগাইল। বলিল—কি শশীদা, ঘুমুলে নাকি?

চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিয়া ঈশৎ হাসিয়া শশী বলিল—ঘুমুবো কেন ভাই? তারপর মুখ আগাইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া পরম আগ্রহভরে বলিল—খবর কি বল ত তোমার? সেই রাত দশটায় গাড়ী ছাড়বার আগে তোমার সঙ্গে দেখা আর এখন যে রাত কাবার হ'তে চ'লল! আর চাঁদবদন নিতাই চাঁদের দেখা সাক্ষাৎ নেই, ভাবলাম—ভাইটির বুঝি এখন অর্দ্ধেক রাত, একেবারে শিয়ালদা'য় গিয়ে চোখ খুলবে বুঝি! ······তারপর—কত্‌দূর?······

—তুমিও যেমন দাদা! শশী চকবর্ত্তীর সাকরেদ্ না আমি? টাকার গরমে দাদা—ঘুম ত ঘুম···ঘুমের বাবা পর্য্যন্ত পালিয়ে গেছে সাতসমুদ্দুর পারে। তোমাদের শোভেন্দ্র জমিদার যা টাকার লোভ দেখিয়েছে, তাতে ছ'মাসে ঘুম এলে হয়!

শশী হাসিল। এক কোণে সরিয়া আসিয়া বলিল—তা ত হ'ল, এখন অবস্থা কতদূর কি বুঝলে? দমদম ষ্টেশনে কি কাজ হাসিল করা যাবে—না শিয়ালদা'য় নেমেই follow ক'রতে হবে? ব্যাপার কি বুঝ্‌লে? আলাপ সালাপ ক'রেছিলে কিছু? মতলব কি দেখলে?···

যুবক বলিল—ভাবগতিক ত ঠিক বুঝতে পারলাম না। মুকুন্দটা ত টেনে ঘুমুচ্ছে। শিয়ালদায় গাড়ী না গেলে ব্যাটা বোধ হয় আর উঠবেও না আর মেয়েটার সঙ্গে দেখাও ক'রবে না রাত্তিরের মধ্যে। আজ যে ওদের কালরাত্তির গো! খুলনায় যখন মেয়েটাকে গাড়ীতে তুলে দেয় তখন আমি পাশে দাঁড়িয়ে। মেয়েটাই বলছিল, রাত্তিরের ভেতর আর দেখা শোনা না ক'রতে। ভোরে শিয়ালদায় গাড়ী থেকে নামিয়ে নেবে ওর কে এক আত্মীয় রবীন না-কি নাম তার, সেও আসবে'খন। ব্যাপার দেখে মনে হ'চ্ছে দমদমার trial successful হ'তেও পারে। আলাপ একটু ক'রেছি, মিথ্যে কথা কিন্তু বলে নি।

শশী বলিল—সে ত হ'ল। শোন ভাই, কাজের কথা বলি। যেমন ক'রে হোক্, মেয়েটাকে শোভেনের হাতে তুলে দিতেই হবে।......ভাই, তোমার পাঁচ আর আমার পাঁচ—এই দশ দশ হাজার টাকা......ভেবে দেখো ভাই—জোচ্চুরিই কর আর জালিয়াতীই কর, গুণ্ডামিই কর আর যাই কর—এতগুলো টাকার মুখ এক সঙ্গে কোনদিন আর চোখে দেখতে হবে না। এ টাকা পেলে ভাই তোমার আমার জীবনে আর খেটে খেতে হবে না। মহা আরামে ভাই একটা বিলিতী মদের দোকান হাঁকিয়ে রাজা হ'য়ে বসা যাবে। আর ছ্যাঁচড়ামি ভাল লাগেনা।...

যুবকটি বলিল—প্রোগ্রাম ত ঠিক করাই আছে, চেষ্টার কি আর ত্রুটি ক'রব?

শশী বলিল—সে ত বটেই, শিয়ালদা পর্য্যন্ত যদি যেতেই হয়, তবে আমাদের কাজ শুধু detective-এর মত follow করা—কোন্ বাড়ীতে গিয়ে ওঠে, শুধু দেখা। তার পরের ব্যবস্থা ত আছেই। আর দমদম

ষ্টেশনেই যদি কাজ মিটিয়ে ফেলতে পার তবে ত সোনায় সোহাগা। কিন্তু শালা মুকুন্দর আক্কেলটা দেখ ভাই! ব্যাটা আমার মাথায় কি-না কাঁঠাল ভাঙ্গলো শেষটায়!···এত ক'রে মণি বাঁড়ুয্যেকে রাজী করালাম, সব ঠিক্ ঠাক্, মাঝখান থেকে ব্যাটা এক প্যাচ্ খেলিয়ে বিয়ের তারিখ ঘুরিয়ে পট্ ক'রে ক'লকাতা থেকে ঘুরে এসে নিজেই বিয়ে ক'রে নিয়ে স'রে প'ড়ছে! হরি হরি!······কিন্তু, ব্যাটা বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিল যে, আমাদের আছে চার চারটে ক'রে চোখ। আরে বাপু, জঙ্গলের এক কোণ থেকে আর এক কোণে যেতে পারলেই কি বাঘের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়? কালীদ' থেকে কলমীডাঙ্গা, মাঝে ত বিলটা— বলি, সে'ও ত শোভেন্দ্রেরই জমিদারী। খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে রীতিমত একটি লোক Spy-এর মত রেখেছিলাম।···আর এত বড় একটা ব্যাপার মিটিয়ে আমাদের সামনে থেকে আমাদেরই চোখে ধুলো দিয়ে কি-না স'রে প'ড়তে চাস্? আচ্ছা, দেখি বাছাধন, তোমার দৌড় কতদূর আর আমাদের দৌড় কত্ দূর? ছ'মাস যদি তোমার পিছু ছুটতে হয়, তা'ও পেছুচ্ছি না সোনার চাঁদ!

যুবকটি বলিল—অত সময় কেন লাগবে শশীদা? দেখনা কি ক'রে ফেলি দু'চার ঘণ্টার ভেতর। আচ্ছা শশীদা, শোভেন বাবু শেষটায় কাজ বাগিয়ে নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রবে না ত? টাকা কথামত ঠিক মেটাবে ত?······

হাসিয়া শশী বলিল—হ্যাঁ রে ভাই, হ্যাঁ! তুই জানিস্ না শোভেনকে। এ-সব ব্যাপারে সে মুক্তহস্ত আর ভারী সাধু। দুই কথা ক'রবে না। এ-ত দেবেই, আরও বক্শীস্ হিসেবে কিছু আদায় করব'খন, তুই

দেখিস্। এ সব ব্যাপারে, ভাই, তোর শশীদার হাতেখড়ি হ'য়ে গেছে বহুকাল।…শোভেনটা ত রেগে একেবারে আগুন হ'য়ে আছে। মুকুন্দকে একেবারে শেষ না ক'রে সে ছাড়বে না—এই তার প্রতিজ্ঞা। এদিকের সব ঠিক্ ঠাক্ ক'রে দুপুরের ট্রেণে সে ত চলে গেছে জান, কিন্তু তার মন র'য়েছে এদিকে পড়ে। তার এখন বুলি হ'য়েছে 'সাবিত্রীকে চাই-ই',—আর মুকুন্দকে শেষ ক'রব, তাতে যত টাকা লাগুক'। বুঝে দেখ তার মনের অবস্থা! আরও মহাদেব চালির সঙ্গে মামলায় হেরে গিয়ে সে একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। দমদমে আর শিয়ালদায় দু' জায়গায়ই ত শোভেন্দ্রের মটোর হাজির থাকবার কথা আছে। প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে এখন ভাই শেষরক্ষে ক'রতে চেষ্টা কর।

ষ্টেশনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।—ঘণ্টা দিয়েছে দাদা, বারাসাতে আবার এসে দেখা করব'খন—বলিয়াই যুবকটি প্লাটফর্ম্মের উপর লাফাইয়া পড়িয়া নির্দ্দিষ্ট কামরার দিকে ছুটিল।

গাড়ী আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কামরার মধ্যে উঠিয়াই যুবকটি দেখিল, মুকুন্দ পাশ ফিরিয়া শুইয়াছে এবং অকাতরে ঘুমাইতেছে। সেদিকে একবার চাহিয়া সিগারেট ধরাইয়া টানিতে টানিতে সে শুইয়া পড়িল।

রাত্রি প্রায় চারিটা। বারাসাত ষ্টেশনে গাড়ী থামিয়াছে। প্লাটফর্ম্ম প্রায় নিঝুম। দুইচারিজন যাত্রী ওঠা-নামা করিতেছে মাত্র।

যুবকটি আবার গিয়া তৃতীয় শ্রেণীর সেই কামরাটিতে উঠিল এবং সন্দিগ্ধচোখে এদিকে ওদিকে চাহিয়া শশীর নিকটে গিয়া বসিল। চুপি চুপি বলিল—দাদা, টেনে ঘুমুচ্ছে এখনও—শিয়ালদায় গাড়ী না ঢুকলে

উঠবে ব'লে মনে হ'চ্ছে না। ফিমেল্ কম্পার্টমেণ্টে আমাদের আসামীও ঘুমে বিভোর ব'লে মনে হ'চ্ছে।

শশী সোৎসাহে বলিল—তা হ'লে দমদমাতেই মেয়েটাকে নামাতে চেষ্টা কর।—কি বল?

—হাঁ, নিশ্চয়ই—গেঁয়ো মেয়ে ত, বাক্‌তাড়া দিয়ে ঠিক নামিয়ে আন্‌ব দেখো'খন!……কিন্তু শশীদা আমার কাছে সোজা কথা বাবা। বে-কায়দা দেখলেই কিন্তু মটোর নিয়ে টেনে লম্বা দেব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুলিশের আর পাবলিকের কোঁৎকা খেতে আমি কিন্তু মোটেই রাজী নই।

শশী যুবকটির বুক চাপড়াইয়া বলিল—কোন ভয় নেই ব্রাদার। টাকার অঙ্কটা মনের ভেতর জপ ক'রতে ক'রতে বুক ফুলিয়ে সোজা কাজে এগিয়ে পড়। No risk, no gain.

হাসিয়া যুবকটি বলিল—কিন্তু দাদা, মেয়েটা যদি মুখুজ্জেকে নিজে চোখে না দেখে গাড়ী থেকে না নামতে চায়, তবেই একটু মুস্কিল হবে'খন। মুস্কিল আর কি—তাড়াতাড়ি দৌড়ে এক গাড়ীতে গিয়ে উঠে ভিড়ে মিশে যাব'খন, কি বল?……

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

শশী বলিল এদিকে একটু এগিয়ে এসো ব্রাদার, অনেক কথা আছে।

দুইজনে চুপি চুপি কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল। কয়েকটি ষ্টেশন ছাড়াইয়া দমদম ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে গাড়ী আসিয়া থামিল। শশী আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল এবং যুবকটি ধীরে ধীরে প্লাটফর্ম্মে নামিয়া কয়েক পা হাটিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট কামরায় গিয়া উঠিল।

গাড়ীতে অধিকাংশ যাত্রীই নিদ্রামগ্ন, মুকুন্দও। যুবকটি কয়েক মুহূর্তের জন্য মুকুন্দর দিকে তাকাইয়া যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া রহিল।

অতঃপর পরবর্ত্তী ষ্টেশন···দমদমে আসিয়া গাড়ী থামিবামাত্র মুকুন্দর দিকে একবার চাহিয়াই যুবকটি প্লাটফর্ম্মে সন্তর্পণে লাফাইয়া পড়িল এবং মাঝের তিনখানি গাড়ী ছাড়িয়া সোজা ইন্টার ক্লাশের মেয়েদের কামরার কাছে দৌড়াইয়া গেল। পাদানির উপরে দাঁড়াইয়া হাতল ধরিয়া মুহূর্ত্তে দরজা খুলিয়া ফেলিয়া নিদ্রিতা সাবিত্রীর দিকে তাকাইয়া ব্যস্তভাবে বলিল—বৌদি, বৌদি!······

সাবিত্রী চমকিয়া উঠিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল এবং ঘোমটা টানিয়া দিল।

—শীগ্‌গির নেমে পড়ুন বৌদি—গাড়ী ছেড়ে দিল ব'লে।—আমি রবীন, মুকুন্দদা ওদিকে জিনিষপত্র নামাচ্ছেন—আমাকে ব'ললেন আপনাকে নামিয়ে নিতে।

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। ও-পাশের বৌটি শুইয়া ছিল, উঠিয়া বসিল। বলিল—ঝট্ ক'রে নেমে পড় ভাই—গাড়ী ছেড়ে দেবে এখুনি। তোমাদের কোথায় বাসা হয়—আমায় জানিও কিন্তু, বেড়াতে যাব। আমাদের কিন্তু ঐ ঠিকানা।···

সাবিত্রীর কানে অর্দ্ধেক কথা ঢুকিল না। ঘাড় নাড়িয়া ব্যস্তভাবে সে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। যুবকটি আগে আগে এবং ঘোমটা-পরা সাবিত্রী পিছনে পিছনে গেট পর্য্যন্ত আসিল। যুবকটি টিকেট-কালেক্টারকে শুনাইয়াই বলিল—দাদা বেশ লোক ত, আগেই গিয়ে মোটরে চেপে ব'সলেন! আসুন বৌদি!······

পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী মোটরে ষ্টার্ট দেওয়াই ছিল এবং দরজাও খোলা ছিল। তাহার মধ্যে চুপ-চাপ বসিয়া ছিল শোভেন্দ্র'র একজন পোষ্টা ড্রাইভার এবং পিছনের সিটে গিয়া বসিয়াছিল শশী। সাবিত্রী বিনা-দ্বিধায় গিয়া তাহার মধ্যে পা দিয়াই আব্ছা-আলোতে শশীকে দেখিবামাত্র যেন ভূত দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্র তাহাকে চিৎকার করিবার সুযোগ না দিয়া শশী তড়িৎবেগে লাফাইয়া উঠিল এবং সবলহস্তে সাবিত্রীকে আকর্ষণ করিয়া সজোরে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল।··· দমদম রোডের উপর দিয়া মোটর তীরবেগে ছুটিয়া চলিল।

* * * *

রেলগাড়ী আবার গন্তব্যপথে ছুটিয়াছে।

দমদম ষ্টেশন অনেকক্ষণ ছাড়াইয়াছে—সম্মুখেই শিয়ালদহ ষ্টেশন। ওদিককার বেঞ্চে জনকয়েক ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিছানাপত্র গোছগাছ করিতেছেন। তাহাদের একজন মুকুন্দর গায়ে হাত দিয়া বলিলেন—শুনছেন? ও মশাই! গাড়ী যে শিয়ালদ'য় এসে প'ড়ল!···

মুকুন্দ হাই তুলিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিল এবং রুমাল দিয়া মুখ মুছিয়া চোখ রগড়াইয়া বিছানার কয়লা ঝাড়িয়া বিছানা জড়াইল।

ট্রেণ প্লাটফর্ম্মে ঢুকিতেছে। রাত্রি প্রভাত হইতেছে—আকাশে বাতাসে এক অপূর্ব্ব আনন্দের হিল্লোল। মুকুন্দ গুণ গুণ করিয়া গান করিতে করিতে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

গাড়ী থামিল। মুকুন্দ প্লাটফর্ম্মে নামিয়াই জোরে পা চালাইয়া মেয়েদের ইন্টারের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।··· কিন্তু সাবিত্রী কোথায়? যেখানে সে বসিয়াছিল, সেখানে নেই ত?

ব্যস্তভাবে মুকুন্দ গাড়ীর মধ্যে উঠিল। কিন্তু কোথায় সাবিত্রী ?...... অন্য গাড়ীতে নায় ত ? কিন্তু তা'ও ত নয়—ঐ ত সেই ভদ্রমহিলাটি —উনিও ত খুলনা হইতেই এ গাড়ীতে আসিতেছেন। মুকুন্দর মনের মধ্যে সত্যই এক আতঙ্কের সঞ্চার হইল !

সে ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—দেখুন, এখানে যে বৌটি ব'সে ছিল......

ভদ্রমহিলা নামিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, কথা শেষ করিতে না দিয়াই মুকুন্দকে বলিলেন—সে ত দমদম জংসনে নেমে গেল। তার কে এক দেওর, দেওরকে সে চেনে না—সেই ত বৌদি ব'লে ডেকে তাকে ঝট্‌পট্ নামিয়ে নিলে। আরও ব'ললে যে, আপনি নাকি ওদিকে মাল-পত্র নামাচ্ছিলেন ! আপনিই ত খুলনায় এ গাড়ীতে ওকে তুলে দিয়েছিলেন ?...

মুকুন্দর বাক্‌রোধ হইয়া গেল। অস্ফুটে তাহার মুখ দিয়া উচ্চারিত হইল—এঁ্যা !......

ভদ্রমহিলাটি মুকুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া অনুমান করিয়া বলিলেন—তবে কি সে অপর কেউ ? অ মা, সে কি ? কি হবে তবে ?...

যন্ত্রচালিতের মত মুকুন্দ প্লাটফর্ম্মের উপর নামিয়া দাঁড়াইল এবং পাগলের মত দিশাহারার মত যাত্রী-জনতার দিকে সর্ব্বহারার হতাশ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। হৃতসর্ব্বস্ব মানুষ যেমন করিয়া পথের উপর আসিয়া দাঁড়ায় !......

পিছন হইতে কে ডাকিল—মুকুন্দদা !......

পরিচিত কণ্ঠস্বর—মুকুন্দ চমকিয়া উঠিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিল, দেখিল, রবীন।

রবীন বলিল—এখানে দাঁড়িয়ে যে? বৌদি কোথায়?···বেশ লোক ত আপনি!······

পাগলের মত রুদ্ধপ্রায়-স্বরে মুকুন্দ বলিল—আসে নি।

আঠার

কর্ম্মব্যস্ত কোলাহলমুখর নগরী ইতিমধ্যেই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বাস্ ট্রাম ট্যাক্সি চতুর্দ্দিকে শব্দ করিয়া ছুটিয়াছে। টলিতে টলিতে মুকুন্দ ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির হইতেছিল না। আঘাত যে তাহার কতখানি—তাহা অপরে আর কি বুঝিবে? অতি কষ্টে সার্কুলার রোডের উপর আসিয়া সে রবীনকে বলিল—তুই এখন যা ভাই, মাসীমাকে বলিস্, দেখা করব'খন।

হাবভাব পরিষ্কার বুঝিতে না পারিয়া রবীন বিরক্ত হইয়া সম্মুখেই একখানি ট্রাম পাইয়া উঠিয়া বসিল।

ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া কি ভাবিয়া সম্ভবতঃ দমদম ষ্টেশনে যাইবার অভিপ্রায়ে শ্যামবাজার-গামী একখানা চলন্ত বাস্ ধরিবার জন্য মুকুন্দ যেমনি রাস্তা পার হইতে যাইবে—অমনি উত্তর দিক হইতে একখানা ট্যাক্সি সোজা আসিয়া তাহার গায়ের উপর পড়িল।...শিখ ড্রাইভার প্রাণপণে 'ব্রেক' কশিল, কিন্তু গতির মুখে চাকা পিছলাইয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে প্রবল এক ধাক্কা খাইয়া মুকুন্দ শিয়ালদা'র চৌমাথার উপরই জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া গেল।

অদৃষ্টের পাঁচালী

—গেল, গেল—শব্দে চারিদিকে ভীষণ চিৎকার উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে পঙ্গপালের মত মানুষ চারিদিক হইতে ছুটিল—প্রত্যেকেরই মুখে এক বুলি —মার শালাকে, ধর শালাকে।……ড্রাইভার বেচারী যে নির্দ্দোষ—কে আর বিচার করে তখন ?……

পুলিশ আসিয়া ভিড় সরাইয়া দিল এবং সংজ্ঞাহীন আহত মুকুন্দকে সেই ট্যাক্সির মধ্যে তুলিয়াই ড্রাইভারকে ক্যাম্বেল হাঁসপাতাল অভিমুখে গাড়ী ছুটাইতে বলিল।…কোথায় গিয়াছে সাবিত্রী আর কোথায় চলিল নিজে সে—মুকুন্দ তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না।

বিচিত্র এই সংসার—বিচিত্র বিধাতার বিধান!……ভবিতব্যতার বিধানে একদা দুইটি পাখী বৃক্ষশাখায় মিলিত হইল। তাহারা ভাবিল—তাহাদের এ মিলন অনাদি অনন্তকালের…। তারপর তাহারা স্থির করিল, তাহারা পরম সুখে বাস করিবে—সুখের নীড় বাঁধিবে।…

বিধাতা কিন্তু ক্রূর হাসি হাসিলেন। নীড়-রচনায় কল্পনাই সার হইল। অকাল-বৈশাখীর ঝড় ঈশাণ কোণ হইতে উঠিয়া একদিন তাহাদের উভয়কে শুধু বৃক্ষচ্যুত করিয়াই ক্ষান্ত হইল না—পরস্পরের আলিঙ্গন হইতে তাহাদের ছিনাইয়া টানিয়া আনিয়া কোথায় কি ভাবে যে নিক্ষেপ করিল—তাহাও বোধ হয় চাহিয়া দেখিবার অবসরটুকুও তাহার হইল না।

অথচ মহাকালের ইঙ্গিতে সবই যেন নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়াই চলিয়াছে। এতটুকু ত্রুটিও কোথায়ও হইবার উপায় নাই।

প্রতিদিন যেমন ভাবে ভোর হয়—যে ভাবে সূর্য্য উঠে, আজও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না।

আজিকার এই অতি দুঃখের সকালটিতে ক্যাম্পবেল্ হাঁসপাতালের ইমারজেন্সী ওয়ার্ডে যখন গুরুতর ভাবে আহত সংজ্ঞাহীন মুকুন্দকে লইয়া ডাঃ রায় ও তাঁহার সহকারীরা যমের সহিত লড়াই করিতেছিলেন, তখন আলমবাজারের কাছাকাছি শোভেন্দ্রেরই এক পরিত্যক্ত জঙ্গলাকীর্ণ বাগান-বাড়ীর একটি নিভৃত কক্ষে সাবিত্রী অজ্ঞান অবস্থায় অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়া ছিল। মটোরের ভিতরে শশীর করকবলিত্ হইয়া সেই যে তাহার মুর্চ্ছা হইয়াছিল—এখনও তাহা ভাঙ্গে নাই।

বেলঘরের বাগান-বাড়ীতে না তুলিয়া সাবিত্রীকে এখানে আনিবার একটা উদ্দেশ্য আছে; মুকুন্দ বেলঘরিয়ার বাগান-বাড়ীর সমস্ত সন্ধান জানে এবং পুলিশ লইয়া উপস্থিত হইতে পারে। পাছে কোনরূপ সন্দেহের কারণ ঘটে, সেই হেতু সমস্ত দিন শোভেন্দ্র কলিকাতার বাড়ীতেই রহিল এবং সমস্ত দিনটা একটা বিষম অস্বস্তির মধ্যে কাটাইল।··· ভোর রাত্রে সেই বাগান-বাড়ীতে বিশ্বস্ত এবং এই প্রকার সর্ব্বসৎকর্ম্মে পটু পুরাতন ঝি রামুর মার জিম্মায় এবং ভৃত্য মধু ও অনুগত দারোয়ান হনুমান শিং'এর তত্ত্বাবধানে সাবিত্রীকে রাখিয়া সেই যে সে চলিয়া আসিয়াছিল, আর কোনও সন্ধানই লইতে পারে নাই। তবে যথাযথ উপদেশ দিয়া সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থাই সে করিয়া আসিয়াছিল।

একটি দিনের আয়ু আর কতটুকু সময়ই বা! সুরা ও নারীর ভবিষ্য সুখসম্ভোগের অধীর প্রতিক্ষায় সমস্ত দিনটা কাটাইয়া সন্ধ্যা ঘোর হইতেই নিজের মটোরে না গিয়া একখানি ট্যাক্সি করিয়া শোভেন্দ্র আলমবাজারের

কাছাকছি গিয়া ট্যাক্সির ভাড়া চুকাইয়া ছাড়িয়া দিল এবং নিজেই খানিকটা পথ পায়ে হাটিয়া সন্দিগ্ধচোখে এদিকে ওদিকে তাকাইয়া নিঃশব্দে বাগান-বাড়ীতে প্রবেশ করিল।……ট্যাক্সিওয়ালা পাছে কোনরূপ সন্দেহ করিয়া বাড়ী চিনিয়া যায়—সেইজন্যেই তাহার এই পন্থা অবলম্বন।

গেট পার হইতেই দেখা হইল হনুমান শিং-এর সহিত। তাহার নিকট কুশল বার্ত্তাদি লইয়া শোভেন্দ্র শীষ্ দিতে দিতে অগ্রসর হইয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। মধু আসিয়া সম্মুখে করজোড়ে বাঁকিয়া দাঁড়াইতেই শোভেন্দ্র অনুচ্চকণ্ঠে বলিল—রামুর মা'কে ডাক্!

রামুর মা আসিয়া অভ্যাসমত মৃদু হাসিয়া দাঁড়াইল।

শোভেন্দ্র ব্যস্তভাবে বলিল—খবর কি রামুর মা?……

—খপর ত বিশেষ সুবিধের দেখছি না দাদাবাবু,—এ জাত-কেউটে কোত্থেকে ধ'রে এনেছেন? এ যে একেবারেই বেয়াড়া দেখছি……

হঠাৎ যেন শোভেন্দ্র একটা ধাকা খাইল। জিজ্ঞাসু মুখে তাকাইয়া বলিল—কি রকম?……

—সারা দিনের ভেতর কিচ্ছু খায়নি—এক ফোঁটা জলও না—

শোভেন্দ্র শুধু বলিল—হুঁ—। তারপর ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া বলিল—কি ক'রছে এখন?…

—কি আর ক'রবে?—পাগ্লীর মত মেঝেয় সারাদিন উপুড় হ'য়ে প'ড়ে আছে—মাঝে মাঝে ফুলে ফুলে কাঁদছে। একটি কথাও ত বলেনি।…

শোভেন্দ্র কোন কথাই বলিল না। যতখানি আশা লইয়া সে আসিয়াছিল—এক নিমিষে যেন তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। হয়ত ভাবিল,

•ই রাণীদিঘির ঘাটের সেদিনকার সেই ঘটনাটির হয়ত আজ পুনরভিনয় হইবার সুযোগ হইবে না, কিন্তু যে মনের রাজ্যে চলিতেছে প্রলয়ের রুদ্র-তাণ্ডব—সেখানে……

রামুর মা বলিল—আপনি কিছু ভাববেন না দাদাবাবু, ওরকম একটু আধটু মেয়েমানুষরা গোড়ায় ক'রেই থাকে—পরে ঠিক্ হ'য়ে যায়। নেহাৎ কচি খুকি ত নয়—সোমত্ত, নইলে জোর ক'রেইত আমি খাওয়াতে পারতাম। সোডার সাথে একটু একটু ক'রে মদ খাওয়াতে পারলে এখন কাজের হ'ত …আপনি এসেছেন…

শোভেন্দ্র এবারও কোন কথা বলিল না, কি যেন অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করিতে লাগিল।

রামুর মা বলিল—আমি বলি দাদাবাবু, এক কাজ করুন। আপনি বন্দুক বাগিয়ে ধ'রে বা ছোরা বুকের ওপর ধ'রে মেরে ফেলার ভয় দেখান, চোটপাট করুন—দেখবেন ঢিট্ হ'য়ে যাবে। প্রাণের মায়ায় দেখবেন, উঠে কত্ কত্ ক'রে গিলতে দিশে পাবে না।…

শোভেন্দ্রের মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল—রামুর মা—তোমরাও মেয়েমানুষ—ওরাও। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে ওদের তফাৎ ওইখানটায়।

রামুর মা শোভেন্দ্রের কথাটার তাৎপর্য্য কিছু বুঝিতে না পারিলেও ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

শোভেন্দ্র বলিল—এতকাল মেয়েমানুষ নিয়ে শুধু চরিয়েই এলে রামুর মা—কিন্তু খাঁটি মেয়ে একটাও দেখনি!…যে মরতেই চাইছে—তাকে

মেরে ফেলার ভয় দেখাতে গেলেও যে পস্তা[illegible] হবে। নিজেদেরই বেকুবে[illegible] মত পিছিয়ে আসতে হবে। ও যে এখন মরিয়া!

রান্নুর মা বলিল—এখন কি ক'রব তাহ'লে? অনেক করে ত[illegible] বুঝিয়েছি—

বিরক্ত হইয়া শোভেন্দ্র বলিল—অনর্থক তুমি নিজেই নিজেকে বুঝিয়েছ, —ওর কানেও ঢোকেনি কিছু···যাক্, তুমি এখানে দাঁড়াও—আমি দেখে আসি একবার।···তারপর যা হয় করা [illegible]'খন।

ঘরখানি ছোট। বাতাসের অভাবে কেমন [illegible] বুনো গন্ধ···। অদূরে কোণে একটা হারিকেন মিট্ মিট্ করিয়া জ্ব[illegible]ছে।

মেঝের উপর সাবিত্রী উপুড় হইয়া পড়িয়া ফু[illegible] ফুলিয়া আকুলভাবে কাঁদিতেছিল।···বারান্দায় দাঁড়াইয়া জানালার ফাঁকে [illegible]ন ধরিয়া শোভেন্দ্র অপলকনেত্রে এ-দৃশ্য দেখিল।······তাহার বুঝিতে [illegible]ত বাকী রহিল না, বল প্রকাশ, ভয় প্রদর্শন বা অনুরোধ—কে[illegible] প্রক্রিয়াই এক্ষেত্রে প্রযুজ্য হইবে না।···

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সে একই ভাবে স্থিরনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

সময়ে সময়ে এমন অভাবনীয় ঘটনার ঢেউও মানুষের মনের দুয়ারে আসিয়া সজোরে দোলা দেয় যে, চিন্তা করিয়া দেখিলে মনে যেন কোন এক অদৃশ্য নিয়ন্তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ইহার মধ্যে রহিয়াছে। আপন ইচ্ছাতে ইহা হয় নাই।

মানুষ চিরদিনই মানুষ—সে পাষাণ নয়। কাহারও কাহারও হৃদয় হয়ত পাষাণেই তৈরী, কিন্তু ঐ শ্রেণীর মানুষেরও হৃদয়ের আঁধার কোণে এমন কোন একটা কোমল তন্ত্রী থাকে—যাহাতে হয়ত কোনদিনই ঝঙ্কার

লাগে না—তাই বাজিয়াও উঠে না। কিন্তু যেদিন সত্যই কোন এক অপ্রত্যাশিত অচিন্ত্যনীয় ব্যাপারের সূত্রে ঐ তন্ত্রীতে ঝঙ্কার লাগিয়া সুরের সৃষ্টি করে, সেদিন সে সুরের রেশ ঐ পাষাণের সমস্ত হৃদয়টুকু শুধু জয় করিয়াই ক্ষান্ত হয় না—তাহাকে এক নূতন পথের ইঙ্গিত দেয়···

ইহাই নিয়ম···

নইলে নিরেট পাষাণ নরহন্তা দস্যু রত্নাকর রামায়ণকার হইতে পারিতেন না ও 'বাল্মীকি' নামে জগৎ-পূজ্য হইতে পারিতেন না। জগাই মাধাইও কোনদিনই পথের আলো দেখিতে পাইত না।

···পাষাণ চিরকাল পাষাণই থাকিত···

পাষাণও গলে। মানুষ-পাষাণের হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। পরিবর্ত্তন মানুষের জীবনে কখন কি ভাবে দেখা দেয়—কেহই বলিতে পারে না।

বিস্রস্তকেশা ভূলুণ্ঠিতা নিতান্ত অসহায় অপরাজিতা এই মেয়েটির দিকে বহুক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে নিজের অজ্ঞাতসারে শোভেন্দ্রের একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

পথ চলিতে চলিতে পথিক যেমন ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষতলে বিশ্রামের জন্য বসিয়া পথের দিকেই কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকে—বোধ হয় অতিক্রান্ত পথের দুর্গমতা এবং দূরত্বটার কথাই ক্ষণকাল ভাবিয়া দেখে, তেমনিই শোভেন্দ্র আজ স্থিরভাবে ক্ষণকালের জন্য জীবনের অতিক্রান্ত পথের দিকে একবার তাকাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।···

পঙ্কিলতা নীচতা এবং স্বার্থপরতার স্তূপের ভিতর হইতে অন্তঃকরণটাকে বহুদিন বাদে আজ টানিয়া বাহির করিয়া সে হিসাব করিয়া দেখিল, —হীরাদীঘির ঘাটের সেদিনকার সেই অমানুষিক ঘটনা হইতে সুরু

করিয়া আজ পর্য্যন্ত এই মেয়েটির সমস্ত দুর্ভোগের জন্য সেই ত দায়ী!…

অনুশোচনার যেন একটা তীব্র বেদনা সে অনুভব করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত মন সায় দিয়া এই কথাটাই বারংবার বলিতে চাহিল—শুধু ভুল নয়—ঘোরতর অন্যায় হইয়াছে।…ভাবিল, ধাপে ধাপে নামিতে নামিতে কেমন পশুর পর্য্যায়ে আসিয়া সে মিশিয়াছে!…কি আশায়—কতটুকু পাইবার আশায় সে এতখানি অগ্রসর হইয়াছে?…

বিবেকের কশাঘাত সবাইকেই মুখ বুজিয়া হাত পাতিয়া লইতে হয় —ধনী দরিদ্র সবাইকেই। শোভেন্দ্রও লইল।

অনেকক্ষণ পরে নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে সে অপরাধীর মত ঘরের মধ্যে ঢুকিল, আর্দ্রস্বরে ডাকিল—সাবিত্রী!……

গলার স্বর শুনিয়াই সাবিত্রী চিনিতে পারিল। কিন্তু না ফিরাইল সে দৃষ্টি —না দেখা গেল তাহার শরীরে কোথায়ও এতটুকু স্পন্দন। একই ভাবে সে পড়িয়া রহিল। শুধু অবরুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে মাঝে মাঝে তাহার শরীরটা একটু কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শোভেন্দ্র অপরাধীর মত ক[illegible]।—সাবিত্রী, আমায় ক্ষমা কর!—তোমায় চিন্‌তে না পেরে আমি ভুল ক'রেছি—। আমি সারাজীবন ধ'রে আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রব।

সন্দিগ্ধ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে শোভেন্দ্রের দিকে একবার স্থিরনেত্রে তাকাইয়া দেখিয়াই সাবিত্রী আবার চোখ ফিরাইয়া লইল। সে বুঝিতেই পারিল না—দস্যুর কণ্ঠে এ কি বিপরীত সুর?…কি এর নূতন উদ্দেশ্য? …ছলনা না অভিনয়?

শোভেন্দ্র দেখিল, সেদিনকার সে সাবিত্রী যেন এ নয়।…একটা ফুটন্ত

গোলাপ ফুলকে কে যেন বৃন্তচ্যুত করিয়া কখন তলায় ফেলিয়া গিয়াছে! ...কিন্তু গোলাপ—গোলাপ। গোলাপ কখনও টগর হয় না। সদ্য মিলনের মন্ত্রপূত সিঁদুর সাবিত্রীর সারা কপালখানি জুড়িয়া তখনও জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে—অবিরত ক্রন্দনের ফলে চোখ দুইটি অসম্ভব রকম ফুলিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে।...এ যেন সেই সাবিত্রী, যে একদিন মৃত স্বামীকে পুনরায় ফিরিয়া পাইবার জন্য জীবন পণ করিয়াছিল।...

অনুতপ্ত কণ্ঠে শোভেন্দ্র বলিল—সাবিত্রী, জানি আমার এ অপরাধ ক্ষমার যোগ্য নয়—তবুও তোমায় এইটুকু ব'লে আমি সান্ত্বনা পাব যে, আজ আমি অনুতপ্ত। বেশী কিছু ব'লে আর পাপের মাত্রা বাড়াব না—তবে এ জীবন দিয়েও তোমাদের পুনর্মিলন আমি করিয়ে দেব। যে-ভাবে হয়...মুকুন্দকে আমি...

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কি বলিতে গিয়াও আর সে বলিতে পারিল না।

শোভেন্দ্রের মুখের উপরে একবার তীক্ষ্ণ ভয়াল অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাইয়া এতক্ষণে সাবিত্রী কথা বলিল। অস্ফুটে বলিল - তিনি কোথায়?...

—জানি না। তুমি এখানে আছ—তাও বোধ হয় জানতে পারেনি। কাল যে ভাবে হয় খুঁজে তাকে বার ক'রবই।...

দুঃখার্ত্ত নেত্রে সাবিত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শোভেন্দ্র অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল—অতীতের কথা ভুলে যাও সাবিত্রী, আজ থেকে তুমি আমার বোন—আমি তোমার দাদা।

তারপর আপনমনেই বলিল—জানি, এ পাষণ্ডকে ভাই ব'লে কোনদিনই তুমি ভাবতে পারবে না, কিন্তু শুধু তোমার মুখখানা

মনের মধ্যে এঁকে নিয়ে আমি এবার থেকে ভাল হবার চেষ্টা ক'রব সাবিত্রী। টাকা পয়সারই শুধু অভাব নেই আমার—কিন্তু আর সবকিছুরই আমার যে কত অভাব—এতদিনে আজ আমি তা বুঝতে পারলাম।···

শোভেন্দ্রের কণ্ঠে অনুতাপ, দুঃখ এবং সমবেদনা যেন ঝরিয়া পড়িল।······

সাবিত্রী ধীরে ধীরে উঠিয়া সরিয়া বসিল। মনে মনে ভাবিল—সত্যই কি এ পরিবর্তন, না—মাতালের ক্ষণিকের বৈরাগ্য।

শোভেন্দ্র ডাকিল—মধু!······

মধু ছুটিয়া আসিয়া দরজার বাহিরে দাঁড়াইল।

—এ বাড়ীতে বোতল আছে কতগুলো?

—এজ্ঞে, ডজন খানেক হবে।

—নিয়ে আয় ত সব গুলো—এখুনি নিয়ে আয়!···

পাশের ঘর হইতে মধু তারমোড়া কর্ক্-আটা কতকগুলি হুইস্কির পূর্ণ বোতল আনিয়া হাজির করিল।

সেগুলির দিকে একবার সত্যকার ঘৃণার চক্ষে তাকাইয়া শোভেন্দ্র এক এক করিয়া সমস্ত বোতলগুলি জানালা দিয়া বাগানের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। বলিল— আজ থেকে মদ ত্যাগ ক'রলাম সাবিত্রী।···

তারপর নিতান্ত অপরাধীর মত সাবিত্রীর দিকে করুণ-নয়নে তাকাইয়া বলিল – আর কিছু না হয়—একটু ফল···নিজেকে আর কত কষ্ট দেবে?······আমি পাশের ঘরে শুতে চ'ললাম।···শরীরটা বড্ড খারাপ বোধ হ'চ্ছে!···কিন্তু খাবে ত তুমি?

সাবিত্রী মাথা নীচু করিয়া বসিয়াই রহিল।

শোভেন্দ্র একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সমস্ত রাত্রি শোভেন্দ্রের কাটিল খণ্ডিত নিদ্রায়। ঘুম আসে না—যদি বা আসে একটু—অমনিই ভাঙ্গিয়া যায়। মনটা কত হাল্কা বোধ হইতেছে—কিন্তু সেই সঙ্গে মুকুন্দ আর সাবিত্রীর কথা মনে পড়িয়া একটা দারুণ অস্বস্তি বোধ হইতেছে।···কত কি চিন্তা······একটার পর একটা···যদি মুকুন্দ সাবিত্রীকে আর গ্রহণ না করে? যদি আদালতে মামলা করে?··· এমনিধারা কত কি।···

সাবিত্রীও দুই চোখের পাতা সমস্ত রাত্রির মধ্যে এক জায়গায় করিতে পারিল না। কতবার তাহার আঁখি পল্লব ভিজিয়া উঠিয়া আবার শুকাইয়া গেল। মনে পড়িল কালীদ'র কথা—হীরাদীঘির কথা—কলমীডাঙ্গার কথা···মহাদেবের কথা···মা'র কথা···আর যাহার কথা মনে পড়িল—তাহার কথা মনে হইতেই তাহার চোখে অশ্রুর ধারা নামিয়া আসিল। তাহার ব্যথিত নির্য্যাতিত হৃদয় বলিতে লাগিল—ওগো, কালরাত্রি ব'লে যাকে অন্য এক গাড়ীতে কিছুক্ষণের জন্যে রাখতেও তোমার মন কাল সরছিল না—তাকে হারিয়ে আজ সারাটা দিন কি ক'রে কাটালে?···এ অভাগিনীর জন্যে পাগল হ'য়ে বোধ হয় মাথা কুটে মরছ, না? তুমি কোথায়?···

তারপর ভাবিল শোভেন্দ্রের কথা।·· ও-ই ত তাহাদের এই সমস্ত দুঃখ-কষ্টের জন্য দায়ী। কিন্তু পাষণ্ডর হৃদয়ও আজ গলিয়াছে। কাল আবার যদি সুর বদলায়?···

শেষ রাত্রে নিদ্রা অতর্কিতে তাহাকে অচৈতন্য করিয়া টানিয়া লইয়া গেল স্বপ্নের জগতে। সে স্বপ্ন দেখিল—কে একটা লোক যেন "সাবিত্রী সাবিত্রী" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে পাগলের মত ছুটিতেছে···হঠাৎ

যেন কিসের একটা বিষম ধাক্কা খাইয়া লোকটি পড়িয়া গেল। কি যে হইল কিছু বোঝা গেল না—কিন্তু চারিদিকে রক্তের ধারা।······সে যেন ব্যস্তভাবে ছুটিয়া গেল, দেখিল, সে আর কেহ নয়—তাহারই স্বামী। সে যেন 'মাগো' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল······

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—সঙ্গে-সঙ্গে সাবিত্রী ধড়মড় করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল—তাহার অত্যন্ত ভয় করিতে লাগিল—বুকের মধ্যে দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল······কি যে করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

সেই মুহূর্ত্তে দরজায় মৃদু করাঘাত শুনিয়া সাবিত্রী সচকিত হইয়া উঠিল, শুনিল—শোভেন্দ্রই ভীতকণ্ঠে ডাকিতেছে – সাবিত্রী—সাবিত্রী, ও রামুর মা······

রামুর মা ও-পার্শ্বের বিছানায় শুইয়া ছিল। ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিল।

শোভেন্দ্র ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া বলিল—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে সাবিত্রী—দারোয়ান দেখেই দৌড়ে এসেছে—বাড়ীর চারধার পুলিশে একেবারে ঘেরাও ক'রে ফেলেছে···আমার আর নিস্তার নাই।

পুলিশের নাম শুনিয়া সাবিত্রীর অত্যন্ত ভয় হইল। অস্ফুটে সে বলিল—কি হবে তা হ'লে ?···রামুর মা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বসিয়া পড়িল।

তাহাকে এক প্রচণ্ড ধমক দিয়া শোভেন্দ্র বলিল—আগে একবার বহু কষ্টে বেঁচেছিলাম সাবিত্রী, কিন্তু এবার আর আমার রক্ষে নাই।···ভাল হ'তে গিয়েও যেন ভাল হ'তে পারলাম না, এই দুঃখ রইল শুধু !···

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমার মনে হয় মুকুন্দই পুলিশে খবর দিয়ে এ ব্যাপার ক'রেছে—আর তারই বা দোষ কি—সে ত ঠিকই ক'রেছে—তার উপযুক্ত কাজই ক'রেছে।

সাবিত্রী পুনরায় অস্ফুটে বলিল—এখন কি হ'বে ?

—কি আর হবে—বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাবে আমায়—তারপর জেলের ঘানি টান্‌তে টানতেই জীবনটা একদিন বেরিয়ে যাবে।···

শেষের দিকে শোভেন্দ্রের স্বর কাঁপিয়া উঠিল। সাবিত্রী দেখিল, শোভেন্দ্র ভয়ে বিবর্ণ হইয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

শোভেন্দ্র ধরা গলায় বলিল—আমায় ক্ষমা কোরো সাবিত্রী যদি পারো, —আমার আর ব'লবার কিছুই নাই।···

সমবেদনার স্বরে ভয়ার্ত্তকণ্ঠে সাবিত্রী বলিল - এখন কি কোনো উপায়ই নেই ?······

—আছে, কিন্তু তোমার অপমানের মাত্রা আরও বাড়িয়ে আমার পাপের বোঝা আর আমি বাড়াতে চাই না সাবিত্রী······

ব্যাকুল কণ্ঠে সাবিত্রী বলিল—আপনি বলুন······

—তুমি স্বেচ্ছায় আমার কাছে এসেছিলে, এই কথাটি ব'ললেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হ'বে—কিন্তু তোমার পক্ষে এ যে কত বড় মিথ্যা—আর কত ভয়ঙ্কর······

অনেকগুলি পদধ্বনি একত্রে শোনা গেল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে হুড়মুড় করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া আসিয়া পড়িল একদল পুলিশ।

দারোগা পুরোবর্ত্তী হইয়াই বলিলেন—এই যে শোভেন্দ্র বাবু, Good

morning. বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এ সময়ে আসতে বাধ্য হ'য়েছি। আপনার নামে একটা charge আছে!...

স্থির অবিচলিত কণ্ঠে মরিয়া হইয়া শোভেন্দ্র বলিল—বলুন!

—আপনি একটি স্ত্রীলোককে কাল খুলনা মেল থেকে লোক দিয়ে চুরি ক'রে এনে—

বাধা দিয়া সাবিত্রী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—মিথ্যা কথা, ও'র কোন দোষ নয়—আমি নিজে ইচ্ছে ক'রেই এসেছি...।

এতটা কিন্তু দারোগাবাবু আশা করেন নাই। বলিলেন—কি উদ্দেশ্যে আপনি ইচ্ছে ক'রে এসেছেন, জানতে পারি কি?

—শোভেন্দ্র বাবু আমার দাদা হন!...

দারোগার কণ্ঠে ব্যাঙ্গের সুর ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন—আমার জানবার অধিকার আছে ব'লেই জিজ্ঞেস্ ক'রছি—আপনার কি রকম দাদা হন্?...

—ধর্ম্ম সম্পর্কে......

—ও, বলিয়া দারোগা বাবু মৃদু হাস্য করিলেন। বলিলেন—আমি ভেবেছিলাম, বুঝি কোন 'তুতো' দাদার কথা ব'লবেন, যেমন মাসতুত, পিস্‌তুত, মামাত, পাড়া'ত... ...যেমনটি আমরা সচরাচর দেখতে পাই আর কি...! কিন্তু বড় একটা কথা উচ্চারণ ক'রে ফেল্‌লেন দেখে আমায় বাধ্য হ'য়েই ক্ষান্ত হ'তে হ'চ্ছে, কারণ ধর্ম্মের নামে আমাদের British Government ভারী ভাল মানুষ। শুধু মন্দির আর মস্‌জিদ্ ব'লে নয়, ধর্ম্মের কথা থাক্‌লেই এরা সেখান থেকে ধর্ম্মে আঘাতের ভয়ে পিছিয়ে দাঁড়ায়!—যাক্, আর দু'টি কথা আপনাকে জিজ্ঞেস্ ক'রব—আপনার

ধর্ম্মদাদার সঙ্গে তার নিজের বসত বাড়ীতে গিয়ে না উঠে এই বাগান-বাড়ীতে রাত কাটাচ্ছেন কেন ?

সাবিত্রী একথার কোন উত্তর না দিতে পারিয়া লজ্জা ঘৃণা এবং ভয়ের যুক্ত তাড়নায় থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অতঃপর শোভেন্দ্রের দিকে তাকাইয়া দারোগা বলিলেন—এবারও যেন বড্ড বেঁচে গেলেন শোভেন্দ্র বাবু! শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিলেন বোধ হয় ? যাই হোক্, আমি কিন্তু অন্য রকম রিপোর্ট পেয়েছিলাম…

শোভেন্দ্র জিজ্ঞাসু নেত্রে দারোগার মুখের দিকে তাকাইল।

—কি জানতে চান ? কে রিপোর্ট ক'রেছে ? আপনারই এক সাক্‌রেদ্ মশাই—যার ভাগে, ভাগের টাকা কম প'ড়েছে—নিতাই বাঁড়ুয্যে তার নাম। চিনতে পেরেছেন ? শশী চক্রবর্ত্তী আপনার পার্শ্বসহচর—সে-ই মোটা মার দিয়ে স'রে প'ড়েছে—আর ও ব্যাটা বুক চাপড়াতে চাপড়াতে থানায় গিয়ে প'ড়েছিল—বুঝতে পেরেছেন ?…

শোভেন্দ্রের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। দারোগা বলিলেন—সে যা হোক, আপনাদের দু'জনারই এখন থানায় যেতে হবে—চলুন।

কালের চক্র ঘুরিয়াই চলিয়াছে। প্রভাত উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিপ্রহর—দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া সন্ধ্যা—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি—আবার রাত্রি শেষ হইয়া নূতন মূর্ত্তিতে প্রভাত দেখা দেয়। তাল রাখিয়া সামঞ্জস্যের সহিত কেমন ধীরে ধীরে উহারা ঘুরিয়া চলিয়াছে।

প্রভাতে আসিয়া ডাঃ রায় মুকুন্দকে দেখিয়াই উৎফুল্লকণ্ঠে সহকারীকে

বলিলেন—আশা আছে জীবনের—নেহাৎ 'সেপ্‌টিক্' না হ'লে হাতখানা রাখা চ'লবে। Brain-এর চোট্‌টাই বেশী দেখ্‌তে পাচ্ছি!

ঠিক সেই সময়ে পুলিশ সাবিত্রীকে লইয়া গিয়া 'নারী কল্যান আশ্রমে' সমর্পণ করিল।

সাবিত্রী চোখের জলে বুক ভাসাইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিল। আশ্রমের আচার্য্য পরম ধার্ম্মিক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নবীন চৌধুরী সস্নেহে ডাকিলেন—এস, মা এস!

সাবিত্রী দুনিয়া অন্ধকার দেখিয়া সেইখানেই তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া গেল।

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন—এঁর স্বামীর সন্ধান পেলেই আপনাকে জানাবো চৌধুরী মশাই। বেচারী লজ্জায় একটা ডায়েরীও করেনি কোন থানায় —আচ্ছা নির্ব্বোধ বটে। কিন্তু এঁরই জন্যে main culprit বড্ড বেঁচে গেল চৌধুরী মশাই, আচ্ছা…নমস্কার।…

উনিশ

দিন যায়, দিন আসে। কাহারও জন্য ছুটিয়াও আসে না—কাহারও জন্য এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিবারও প্রয়োজন বোধ করে না।

দেখিতে দেখিতে ছয়টি মাস কাটিয়া গেল। ছয়টি মাস কালের গর্ভ হইতে আত্ম-প্রকাশ করিয়া কালের গর্ভেই লীন হইয়া গিয়াছে। বর্ষার কথা স্বপ্নে পর্য্যবসিত হইয়াছে—আকাশে বাতাসে অফুরন্ত সমারোহ লইয়া শরৎ আসিয়া বিদায় লইয়া গিয়াছে—তারপর আসিয়াছে শীত। শীতবুড়ীরও এবার সরিয়া পড়িবার পালা।

এই ছয় মাস বাদে একদিন নিঃস্ব রিক্ত সহায়-সম্বলহীন মুকুন্দ দুর্ব্বল শরীর ও মস্তিষ্ক লইয়া ক্যাম্প্‌বেল হাঁসপাতালের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

ডাঃ রায় জিজ্ঞাসা করিলেন—কৈ, আপনার আত্মীয়-স্বজন ত কেউই এলেন না?···

—নেই, কাজেই আসবারও কারুর প্রয়োজন নাই······বলিয়া মুকুন্দ একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসিতে গিয়া দেখিল, হাসির পরিবর্ত্তে কান্নাই ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। উদ্যত অশ্রু গোপন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

ডাঃ রায় বলিলেন—মরার মুখ থেকে বেঁচে উঠলেন, খুব সাবধানে থাকবেন। শারীরিক পরিশ্রম মোটেই ক'রবেন না—শুধু হেঁটে বেড়াবেন সকাল সন্ধ্যেয়—কোন পার্কে বা খোলা জায়গায়। চেঞ্জে যেতে পারলেই ভাল হয়। Substantial diet নিতে একটুও অবহেলা ক'রবেন না। আর brain exercise একেবারেই যেন না হয়!

মুকুন্দ মাথা নীচু করিয়া করজোড়ে ডাঃ রায়কে নমস্কার করিল। ডাঃ রায় প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলেন—আপনাকে যে driver চাপা দিয়েছিল, Compensation স্বরূপ সে আপনাকে এই ৫০০৲ টাকা দিয়েছে। টাকাটা পেলেন ব'লে এই কাগজে একটা সহি ক'রে দিন। সে driver-কে দিতে হ'বে। তারও শাস্তিভোগ হ'য়েছে যথেষ্ট।

বিস্ময়ে অভিভূত মুকুন্দ কি করিবে ভাবিতেছিল, ডাঃ রায় বোধ হয় তাহা বুঝিয়াই বলিলেন—এ টাকা নিতে আপনার কোনই আপত্তি থাকতে পারে না। ন্যায়তঃ এ আপনারই প্রাপ্য। যে ক্ষতি আপনার শরীরের ওপর হ'য়ে গেল—তার ক্ষতিপূরণ এ তুচ্ছ ৫০০৲ কিছুতেই নয়—হওয়া উচিত অনেক বেশী। কিন্তু তাই ব'লে এও ঠেলে ফেলা উচিত নয়। নিন্, সই করুন···

যন্ত্রচালিতের মত সহি করিয়া নোটগুলি পকেটে ফেলিয়া মুকুন্দ পুনরায় ডাঃ রায়কে নমস্কার করিয়া ধীরপদক্ষেপে বাহির হইয়া সার্কুলার রোডের উপরে আসিয়া দাঁড়াইল।

সেই কলিকাতা—সেই লোকজন, গাড়ীঘোড়া, বাস্ ট্রাম—হৈ চৈ—সবই ঠিকমত আছে। পরিবর্ত্তন এতটুকুও কোথায়ও হয় নাই······অথচ

কত বড় অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন ভাগ্যবিধাতা একমাত্র তাহারই অদৃষ্টে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন !

মুকুন্দ একটা গাছের তলায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং বোধ হয় বিগত জীবনের বিশেষ দিনের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটার উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইবার চেষ্টা করিল। তাহার মন নূতন করিয়া অতীতের মধ্যে ডুবিয়া গেল এবং মনের চোখের সম্মুখ দিয়া অতীতের সুখময় দিনগুলি ছায়াছবির মত ভাসিয়া চলিল।...কিন্তু সমস্ত ভাবনাকে কেন্দ্র করিয়া যে ছবিখানি তাহার মানসপটে আগুনের লেখায় জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল—তাহা সাবিত্রীর...

মুকুন্দ কিছুতেই আর চোখের জল সম্বরণ করিতে পারিল না—ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সাবিত্রী...তাহার হৃদয়ের লক্ষ্মী—কুড়ানো মণি সাবিত্রী—হায়, আজ সে কোথায়?...বাঁচিয়া আছে?... যদি থাকে—কি ভাবে—কোথায়—কী জীবন যাপন করিতেছে?...চোখে রুমাল দিয়া মুকুন্দ কিছুক্ষণ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল। মনে মনে বলিল—ঈশ্বর, চেষ্টা করা দূরের কথা—হতভাগিনীর কাছে একটু ক্ষমা চাইবারও অবসর আমায় দিলে না?...এমনিভাবেই পঙ্গু ক'রে আমায় এতদিন ফেলে রাখলে?... এ ভাবে না রেখে এ অভিশপ্ত জীবনে কেন পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলে না?

হঠাৎ আর একটি লোকের ছবি তাহার অন্তরে উঁকি মারিতেই মুকুন্দর চোখের জল মুহূর্ত্তে উবিয়া গেল। অভিমান ক্রোধ এবং আক্রোশে তাহার সর্ব্ব-শরীর জ্বলিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল—তাহাদের উভয়ের এ দুর্ভাগ্যের মূল—সেই লম্পট শোভেন্দ্র রায়। একটা কথা মুকুন্দর মনে খুব বড় হইয়া দেখা দিল—'প্র তি শো ধ'।

*   *   *   *

সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে এবং ধীর পায়ে হাটিতে হাটিতে সে শিয়ালদ' ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। এই সেই ষ্টেশন—এই ষ্টেশনেই সব চেয়ে বড় পরীক্ষা একদিন তাহার জীবনে হইয়া গিয়াছে—ইহা ভাবিতেও মুকুন্দর নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। কিছুক্ষণ সে কর্ম্মব্যস্ত যাত্রীজনতার দিকে হতাস দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। তারপর কি ভাবিয়া নর্থ ষ্টেশনের একখানি বেঞ্চ্ দখল করিয়া সটান শুইয়া পড়িল। শুইয়া সে আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল—এখন এ অবস্থায় কোথায় যাইবে? …কাহার কাছে?

গাড়ীর ঘণ্টা পড়িল। মুকুন্দ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল—যাত্রীরা গাড়ী ধরিবার জন্য ছুটিতেছে। নৈহাটি লোক্যাল এখুনি ছাড়িবে। হঠাৎ তাহার মনে হইল, দমদম থানায় সাবিত্রীর খবর একবারটি লইলে হয় না? হয়ত তাহারা সন্ধান দিতেও পারে!……ভাবিবার সময় নাই। মুকুন্দ একখানা নোট বাহির করিয়া একখানি ইণ্টার রিটার্ণ টিকিট কিনিয়া তাড়াতাড়ি প্লাট্‌ফর্ম্মে ঢুকিয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিল।

কতটুকুই বা পথ—দেখিতে দেখিতে ট্রেণ উল্টাডাঙ্গা ষ্টেশনে আসিয়া থামিবামাত্র আবার ছুট দিল। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই দমদম। আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব লইয়া মুকুন্দ গাড়ী হইতে নামিল এবং ষ্টেশন হইতে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া সম্মুখে একখানি রিক্‌সা পাইয়া তাহাতেই চড়িয়া বসিল।

থানার সম্মুখে আসিয়া রিক্‌সা থামিতেই মুকুন্দর বুকের স্পন্দন দ্রুত-তালে চলিতে লাগিল। অবসন্ন দুর্ব্বল শরীর—মাথার চুল এলোমেলো,

আধ-ময়লা জামা কাপড়—কে বলিবে এই সেই সুদর্শন স্বাস্থ্যবান্ যুবক ভূতপূর্ব্ব মেডিক্যাল ষ্টুডেন্ট্, মুকুন্দ ব্যানার্জ্জী।......অতীতের ইতিহাস অতীতের গর্ভেই মুখ লুকাইয়া যবনিকা টানিয়া দিয়াছে।

অফিসার-ইন্-চার্জ্জ্ আফীসে বসিয়া একটা রিপোর্ট পড়িতেছিলেন, মুকুন্দ কম্পিত পদে দূর হইতে নমস্কার করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—আসতে পারি, স্যার?...

মুখ না তুলিয়াই দারোগা বাবু বলিলেন—হুঁ...কি বলুন?

মুকুন্দর কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। বলিল—দেখুন, আমার স্ত্রী আজ ছ'মাসের ওপর হ'ল......

মুকুন্দ একটু দম লইবার জন্য চুপ করিল। দারোগা ইত্যবসরে বলিলেন—কি?...নিরুদ্দেশ না দেহত্যাগ?

মুকুন্দ বলিল—নিরুদ্দেশ—তবে...

বাধা দিয়া দারোগা বলিলেন—ডায়েরী ক'রেছিলেন—তাই খবর নিতে এসেছেন?...

—আজ্ঞে না স্যার, ডায়েরী ক'রবার আর সুযোগ পেয়েছিলাম না। আমি এতদিন হাঁসপাতালে...

দারোগা চোখ বড় করিয়া চাহিয়া বলিলেন—কোন্ হাঁসপাতাল? রাঁচী না বহরমপুর? mental hospital বুঝি?—এদ্দিন ডায়রী করবার সময় যখন হয়নি?

মুকুন্দ কণ্ঠস্বর দৃঢ় করিয়া বলিল—ক্যাম্প্‌বেল হাঁসপাতাল থেকে discharged হ'য়ে এই আসছি। দরকার বোধ ক'রলে আপনি ফোন্ ক'রে জানতেও পারেন।

দারোগা বলিলেন—কি হ'য়েছিল আপনার ?

মুকুন্দর চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল, বলিল—গাড়ী চাপা প'ড়েছিলাম, কিন্তু এ সব কথা অবান্তর স্যার, আমার কাজের কথা কিছুই বলা হয়নি।

—বলুন—

মুকুন্দ তখন মোটামুটি সংক্ষেপে ব্যাপারটা তাঁহাকে বলিল। সমস্ত শুনিয়া দারোগা বলিলেন—আপনার ঠিকানা দিয়ে একটা দরখাস্তে সব লিখে আমাকে দিয়ে যাবেন। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রব এবং উপযুক্ত তদন্তের ব্যবস্থা ক'রব।

নমস্কার করিয়া মুকুন্দ বাহির হইয়া আসিল।

আবার রিক্শা— আবার সেই ষ্টেশন।

…এই সেই দমদম জংসন ষ্টেশন— এই ষ্টেশনেই একদিন ভাগ্যবিধাতা তাহার দুরদৃষ্টের চরমলিখন লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—। ভাবিতে ভাবিতে মুকুন্দর বুক ভাঙ্গিয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল

ষ্টেশনের সামান্য উত্তরে মেন লাইন হইতে আর একটি শাখা-লাইন বাহির হইয়া সর্পিল গতিতে পূর্ব্বদিকে চলিয়াছে—ষ্টেশন হইতে লক্ষ্য করিলে বেশ দেখা যায়। মুকুন্দ অপলক চোখে সেদিকে তাকাইয়া রহিল। এই-ই সেই খুলনা লাইন—এই পথেরই ইতিহাস তাহার জীবনে যে কত বড় হইয়া আছে—ভাবিতেও মুকুন্দর চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল।

পার্শ্বেই একখানা বেঞ্চি। কয়েকটি লোক অনেকক্ষণ হইতেই সেখানে বসিয়াছিল এবং মুকুন্দকে মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য

করিতেছিল। মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া একজন বলিল—বসুন না স্যার, দাঁড়িয়ে কেন ?···স্বপ্নাবিষ্টের মত মুকুন্দ দুই পা সরিয়া আসিয়া এক কোণে বসিয়া পড়িল।

গায়ে পড়িয়া আলাপ জমাইবার প্রবৃত্তি বা মনের অবস্থা মুকুন্দর ছিল না, কিন্তু অন্য পক্ষ যেন রীতিমত উৎসাহিত হইয়া উঠিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই—বসুন মশাই—বলিয়া তাহারা ব্যস্তসমস্তে উঠিয়া গেল।

মুকুন্দকে সত্য সত্যই যে তাহারা বসাইয়া দিয়া গেল—মুকুন্দ টের পাইল তখন, যখন কলিকাতাগামী একখানি ট্রেনে উঠিয়াই সে হঠাৎ আবিষ্কার করিল যে, তাহার পকেটে সেই টাকাগুলি ত' নাই-ই, রিটার্ণ টিকিট খানিও নাই।······হতভম্ব মুকুন্দ এদিকে ওদিকে চাহিবারও অবসর পাইল না—গাড়ী যেন পাগলা হাতীর মতই ছুট্ দিল।

একদৌড়ে—যেন এক নিশ্বাসেই ছুটিয়া আসিয়া ট্রেন শিয়ালদায় থামিল।···মুকুন্দ প্রকৃত ঘটনাই টিকেট-কালেক্টারকে বলিল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া করিয়া যাহারা অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের বিশ্বাস করান খুবই শক্ত। অবশেষে গুটিকয়েক মিষ্টিমধুর বচন শুনিয়া এবং কনষ্টেবলের কলের একটি গুঁতা খাইয়া সজল চোখে মুকুন্দ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে শুধু একবার বলিল—ভগবান! আরও যে কত বাকী আছে ?···

একটু আগেও যাহার কাছে পুরাপুরি পাঁচশ' টাকা ছিল—সামান্য এক পয়সার মুড়ী কিনিয়া খাইবার মত একটি পয়সাও তাহার কাছে এখন নাই —নিষ্ঠুর নিয়তির ইহা অপেক্ষা চরম বিচার আর কি হইতে পারে ?

হঠাৎ মুকুন্দ কি ভাবিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মনে মনেই

সে সঙ্কল্প করিল।...... ভাগ্য? ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই?—বেশ শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে আপত্তি কি?...

নিজের জীবনের উপর যখন মানুষের ধিক্কার জন্মিয়া যায়—তখনই সে মরিয়া হইয়া উঠে। নিজের বলিতে বিশেষ কেউই নাই – তবুও সংসারে দুই একজন যাহারা ছিল, তাহাদের কথা জোর করিয়াই মন হইতে দূর করিয়া দিয়া পাগলের মত নিরুদ্দেশভাবে জোরে জোরে পা ফেলিয়া মুকুন্দ হ্যারিসন্ রোড্ বাহিয়া চলিল।

বিশ

তারপর একে একে পাঁচটি বছর কাটিয়া গিয়াছে।

নারী কল্যান অশ্রমের আচার্য্য বৃদ্ধ নবীন চৌধুরী আশ্রমে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট গৃহের এককোণে তক্তপোষের উপর কাং হইয়া শুইয়া একমনে ভাগবত পাঠ শুনিতেছিলেন। বাংলা পদ্যে সুর করিয়া ভাগবত পড়িতেছিল আশ্রমেরই একটি মেয়ে নাম সাবিত্রী। আরও অনেকগুলি মেয়ে মেঝের উপর মাদুর পাতিয়া বসিয়া একমনে পাঠ শুনিতেছিল।

নিত্যই এমনিধারা হয়। আশ্রমের মেয়েদের দিবানিদ্রা নিষেধ। হাতে কাজ না থাকিলে দুপুরের পর সকলে মিলিয়া আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হয়। তখন, কোনদিন রামায়ণ, কোনদিন বা মহাভারত, কোনদিন গীতা কোনদিন বা ভাগবত পড়া হয়। পড়িবার ভার পড়ে সাবিত্রীর উপর। ভক্তিগদগদ চিত্তে ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিতে তাহার মত আর কেহই পারে না। বাস্তবিক সাবিত্রীর মত ভক্তিপরায়না, ধর্ম্মনিষ্ঠা মেয়ে আশ্রমে আর দ্বিতীয় ছিল না। কথাপ্রসঙ্গে আচার্য্য প্রায়ই হাসিয়া বলিতেন—সাবিত্রী শুধু নামে নয়—কাজেও, ও আমাদের এযুগের সাবিত্রী।

কথাটা কিন্তু সাবিত্রীর মোটেই ভাল লাগিত না। জোর করিয়া

যাহা ভুলিতে যাওয়া যায়—তাহাই যেন স্মৃতিপটে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া বিদ্যমান থাকিয়া ইচ্ছা করিয়াই প্রতিশোধ লইতে থাকে।

সাবিত্রীরও হইয়াছিল তাহাই। হারানোদিনের ইতিহাসের অতি-দুঃখময় অক্ষর গুলি যতই সে তাহার স্মৃতিরপট হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিত, ততই যেন সেইগুলি জ্বল্ জ্বল্ করিয়া তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিতে থাকিত।…সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখে নিবিড় বেদনার ছায়া ঘনাইয়া উঠিত—আর হইত তাহার অদৃষ্টের প্রতি এক অব্যক্ত মর্ম্মান্তিক অভিমান।

…হীরাদীঘি—কালীদহ—মা—মামা-মামী—বিবাহ—স্বামী……

তাহার জীবনে এসবই যেন স্বপ্নের মত মিলাইয়া গিয়াছে; আজ সে এই অনাথা আশ্রমের আশ্রিতা—বন্দিনী।

নিরুপায় হইয়া সাবিত্রী যেন আত্মরক্ষা করিবার জন্যই অবসর সময়ে ধর্ম্মগ্রন্থে ডুবিয়া থাকিবার চেষ্টা করিত এবং হাসি দিয়াই যেন কান্না ঢাকিবার চেষ্টা করিত।

দশমস্কন্ধের একটি অধ্যায় সাবিত্রী পড়িতেছিল। পাঠ শেষ করিয়া গ্রন্থখানিকে ভক্তিভরে কপালে ঠেকাইয়া বই'এর আলমারিতে তুলিয়া রাখিয়া আসিয়া আবার বসিল। গ্রন্থপাঠের পর আচার্য্য প্রতিদিনই বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মেয়েদের সদুপদেশ দেন—বহু সাধুদের ও সতীদের জীবন-কথা আলোচনা করেন। আলোচনা করিতে করিতে নিষ্ঠাবান ধর্ম্ম-পরায়ণ বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণের যেন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়। ভাবের আবেগে তাঁহার দুইচক্ষু বাহিয়া অশ্রুর ধারা নামিয়া আসে। মেয়েদেরও চক্ষু

তখন অশ্রুসজল হইয়া উঠে। মুহূর্ত্তের জন্য বোধ হয় তাহারা তাহাদের দুরদৃষ্টের কথাও ভুলিয়া যায়।

ক্ষণকাল পরে বৃদ্ধ বলিলেন— সাবিত্রী, তুমি আর দেরী কোরো না মা—অতি প্রয়োজনীয় দু'চারটি জিনিষ যা—তাই শুধু আমার জন্যে গুছিয়ে দাও—গাড়ী ত সন্ধ্যের পরই—আবার ভিড়ও ত তেমনি হবে—বহুদূরের রাস্তা।···তারপর অন্যান্য মেয়েদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—আজ আর তোমাদের কিছু ব'লব না মা। মনটা আজ প্রফুল্ল থাক্‌লেও বেশ একটু চঞ্চল হ'য়েছে।

সব মেয়েরাই আচার্য্যকে 'বাবা' বলিয়া ডাকে।

সাবিত্রী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কেন বাবা?

আচার্য্য ঈষৎ হাসিলেন, বলিলেন—কেন—তুমি হয় ত কিছু কিছু বুঝবে মা। কোথায় ক'লকাতা—আর কোথায় প্রয়াগ। এই বুড়ো হাড় ক'খানা নিয়ে যদি আর সেখান থেকে না ফিরি তবে এই ভেবে চোখ বুজেও ত শান্তি পাব না মা—যে, আমার এই এতগুলো মেয়েকে কে এমনি ভাবে আগলে রাখবে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—হয়ত আচার্য্যের অভাব হবে না—আশ্রমও ঠিক এমনিভাবেই চলবে, কিন্তু—

একটি মেয়ে বলিল—আমাদের ফেলে এখন প্রয়াগে না হয় নাই গেলেন বাবা!

বৃদ্ধ পুনরায় হাসিলেন, বলিলেন—দুর্ব্বলতাকে কখনো প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় মা। প্রয়াগধামে এই কুম্ভমেলা—এ ত আর আমার জীবনে দু'বার আসবে না মা। শেষপথে যাত্রার সময়ে সুযোগ যদিই বা পেলাম

তবে আর ছাড়ি কেন ? ক'টা দিন বই ত নয়। আমাকে ছেড়ে থাকতে তোমাদের যে কষ্ট হবে—আমার হবে তার চেয়েও বেশী। মনে ভাববো, আমার মেয়েদের শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে এসেছি।

কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিল না। তারপর যে যাহার কাজে উঠিয়া গেল।

সকালে ও বৈকালে আশ্রমের মেয়েদের কাজকর্ম্ম করিতে হয়। সাধ্যানুযায়ী যে যাহা পারে তাহাই করে। আশ্রমে তোয়ালে—গামছা ইত্যাদি বুনিবার মত দুইখানি তাঁত আছে। মেয়েরা অনেকে তাঁতের কাজ শিখিয়াছে। এই নারী কল্যাণ আশ্রমের তাঁতের তৈরী গামছা ইত্যাদি বাজারে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থাও আছে। কয়টি মেয়ে সুপারি কাটে, কাগজের ঠোঙা বাঁধে, রুমালের উপর নক্সা তোলে। এগুলির জন্যও দোকান ঠিক করা আছে। সপ্তাহে একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে আসিয়া দোকানদাররা লইয়া যায়। আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ই সমস্ত দেখাশুনা করেন।

সকলে এক এক করিয়া চলিয়া গেলে সাবিত্রী বৃদ্ধের অতি সন্নিকটে গিয়া মুখ নীচু করিয়া বলিল—একটি কথা ব'লব বাবা ?···

— কি মা ?

সাবিত্রী বলিল—ঐ সুদূর প্রয়াগ—একা একা ত আপনার খুবই কষ্ট হবে বাবা—কেই বা আপনাকে দেখবে !···

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন—যদি এ জীবনটা কুম্ভমেলায়ই উৎসর্গ ক'রতে পারি মা—ভাববো, আমার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ছিল। চিরদিন দেশসেবা জনসেবায় জীবন কাটিয়ে এলাম—আর এই শেষ সময়টায় ভগবানের কাছে

শুধু এই প্রার্থনা মা, আমার উদ্দেশ্য যেন সফল হয়। আমি চাই—এই আশ্রমটি এমন ক'রে গ'ড়ে উঠুক যে, নিরাশ্রয়া অবলা মেয়েদের খাওয়া পরার জন্যে আর অপরের মুখের দিকে না তাকিয়ে থাকতে হয়।···সে ভার একমাত্র তোমারই ওপর আমি দিয়ে যাব মা।...

সাবিত্রীর চোখের দুই কোণ জলে ভরিয়া উঠিল। সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বৃদ্ধ বলিলেন—তোমার মনে যে কি ব্যথা মা—সবই বুঝি আমি। কি ক'রব মা, নিজে ত সন্ধান নিয়েছি, পুলিশ দিয়েও যতদূর চেষ্টা করা দরকার ক'রেছি—কিছুতেই তোমার হতভাগ্য স্বামীর সন্ধান পেলাম না। কোথায় যে সে হতভাগাটা···দেখতে দেখতে প্রায় পাঁচটা বছর কেটে গেল।···

সাবিত্রী চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন—সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, বেহুলা—এঁদের জীবনী বহুবার তোমাদের শুনিয়েছি, কিন্তু এইটুকু শুধু মনে রেখো মা যে, ঐ সব সতীদের চেয়ে কোন অংশেই তোমরা নীচু নও। বরং আমার মনে হয়, এমনিধারা কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন তাঁদেরও হ'তে হয় নি। অদৃষ্টের এত বড় বিড়ম্বনা—এত বড় নির্য্যাতন বোধ হয় তাঁদেরও ভোগ ক'রতে হয় নি।

বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিলেন—এই আশ্রমের আর সব অবলা মেয়েগুলোর কথাও একবার ভাবো ত মা— কি অবস্থার ভেতর দিয়ে তারা আজ এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে!···হয়ত একদিন আসবে, যেদিন তোমাদেরও এই অগ্নি-পরীক্ষার শেষ হবে আর সমাজও তার ভুল বুঝতে পারবে। বৃদ্ধের চক্ষুদ্বয়

আর্দ্র হইয়া উঠিল, বলিলেন—আমার সঙ্গে যাবি মা? প্রয়াগে কুম্ভমেলায়?

সাবিত্রী সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বৃদ্ধ বলিলেন—তাই চল্ মা, মনে অনেকখানি শান্তি পাবি। বাপ-বেটিতে ঘুরে আসিগে, চল্!…

সাবিত্রী নীচু হইয়া বৃদ্ধের পায়ের ধুলা মাথায় লইল। সস্নেহে মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—ঈশ্বর নিশ্চয়ই আছেন মা—তিনি সবই দেখতে পান—তিনিই তোমাদের মঙ্গল ক'রবেন। তাঁর চরণ সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার জন্যে কামনা ক'রছি—তিনি যেন তোমার অদৃষ্ট পূর্ণ করেন!…

বৃদ্ধ চক্ষু মুদিয়া পরম ভক্তিভরে যুক্তকর কপালে ঠেকাইলেন।

একুশ

মাঘ মাস।

ত্রিবেণী সঙ্গমের বিস্তৃত ক্ষেত্রে কুম্ভমেলা বসিয়াছে। দক্ষিণ-বাহিনী গঙ্গা এবং পূর্ব্ব-বাহিনী যমুনা এখানেই আসিয়া মিশিয়াছে। মহাপুণ্যতোয়া সরস্বতীও একদিন এই সঙ্গমেই আসিয়া মিলিয়াছিল—এইজন্যই প্রয়াগের 'ত্রিবেণী' নামটি আজও অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে।

বার বৎসর বাদে এই পূর্ণকুম্ভ যোগ—ভারতের চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে ধর্ম্ম-পিপাসু নরনারী ছুটিয়া আসিয়াছে। প্রয়াগের এই বিরাট জন-সম্মেলন—এ যে কত বড়, চোখে না দেখিলে ধারণা করা যায় না। শুধু ভারতবর্ষে নয়—সমগ্র পৃথিবীতে একত্রে এত লোকের সমাগম আর কোথায়ও হয় কি না সন্দেহ। এই প্রয়াগের সঙ্গেই প্রাচীন ভারতের কত যে গৌরবময় ইতিহাস জড়িত রহিয়াছে, তাহা ভাবিতেও মন এক অপূর্ব্ব পুলকে ভরিয়া উঠে।

প্রয়াগ কুম্ভের প্রধান অঙ্গ এই ত্রিবেণীতে স্নান—লক্ষ লক্ষ স্নানার্থী নরনারী—হাজারে হাজারে সাধু সন্ন্যাসী দেশ-দেশান্তর হইতে আসিয়া জুটিয়াছে।

কিন্তু তাহাদের কথা আমরা বলিতে বসি নাই। যাহাদের লইয়া আমাদের এই কাহিনী—তাহাদের কথাই বলিতেছি।

স্বেচ্ছাসেবকদের ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং সাহায্যে কুম্ভস্নান সমাপন করিয়া উঠিয়া আচার্য্য সস্নেহে সাবিত্রীকে বলিলেন—মা, ভারতের এই পুণ্যতীর্থে—মহাপুণ্যতোয়া গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর এই মিলনক্ষেত্রে আজ এই শুভক্ষণে দাঁড়িয়ে তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'রছি মা, ঈশ্বর যদি থাকেন—যদি চন্দ্র-সূর্য্য তাঁরই আদেশে আকাশে ওঠে, 'তা হ'লে নিশ্চয়ই তিনি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ ক'রবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—ভগবানকে একান্তে কায়মনে স্মরণ ক'রে এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে কুম্ভস্নান ক'রলে মানুষ তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পায়—তার পাপ তাপ দূর হ'য়ে যায়।

বৃদ্ধ পরম ভক্তিভরে ঊর্দ্ধনেত্রে যুক্তকর কপালে ঠেকাইলেন। সাবিত্রী সাশ্রুনেত্রে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল।

ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আচার্য্য বলিলেন—ভেবেছিলাম দিন কয়েক বাপ-বেটিতে এখানে থাকবো মা—কিন্তু, কলেরার যে ধুম লেগে গেছে যাত্রীদের ভেতর—তাতে ত আর থাকতে সাহস হ'চ্ছে না। লোক ত প্রাণ-ভয়ে ছুটতে আরম্ভ ক'রছে।

ম্লান হাসিয়া সাবিত্রী বলিল—আপনার যে ক'দিন ইচ্ছে এখানে থাকুন বাবা—আমাদের কিছু হবে না। আর যদি হয়-ই, ভাববো পূর্ব্বজন্মের পুণ্য ছিল।

সস্নেহে সাবিত্রীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বৃদ্ধ বলিলেন—ঠিক কথাই ব'লেছিস্ মা, কিন্তু আমার জন্যে ত ভাবিনে—ভাবি শুধু তোরই জন্যে। ভাবি, কার ধন যেন গচ্ছিত রেখেছি—দাবী ক'রলেই বিনা স্বার্থে ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু মা, কেন জানিনা, আমার আশ্রমের এত মেয়ের ভেতর শুধু তুই-ই আমার মনটা একেবারেই দখল ক'রে

নিয়েছিস্! আজ এই প্রয়াগ-তীর্থে দাঁড়িয়ে কি ব'লতে ইচ্ছে ক'রছে জানিস্ মা—?—কেবলই ব'লতে ইচ্ছে ক'রছে, আর জন্মে আমার মেয়ে হ'য়েই আসিস্। এবারে যেন মনের সাধ মিটিয়ে তোকে পেলাম না।

সাবিত্রীর চোখের কোণ বাহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বলিল—আমি ত আপনারই মেয়ে বাবা।......

তারপর পিতা-পুত্রীর মতই মনের এক সুগভীর বেদনাময় অনুভূতি লইয়া আচার্য্য ও সাবিত্রী ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া গেল।

এর পরবর্ত্তী ঘটনা—যেমনই করুণ তেমনিই মর্ম্মান্তিক।

নিয়তি অপরিহার্য্য সত্য—কিন্তু তাহার আহ্বান সময়ে সময়ে এতই আকস্মিক যে, মানুষ তাহার চিরপরিচিত নিজস্ব দুনিয়ার দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইবারও অবসর পায় না।

এ-ক্ষেত্রেও হইল তাহাই। সন্ধ্যার পর বার দুই ভেদবমীর পর আচার্য্য চক্ষু কপালে তুলিলেন এবং শীর্ণ হাতখানি বাড়াইয়া সাবিত্রীর হাতখানি ধরিয়া বলিলেন—আমি ত অনন্তের পথে চ'ললাম মা, সময় চাইলেও ত সময় পাওয়া যাবে না আর। তোমায় এইখানেই ফেলে গেলাম মা—কি ক'রব, নিরুপায়···ভগবান আছেন···আমার আশীর্ব্বাদ···

ধর্ম্মশালার কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বেই রামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রমে খবর পাঠাইয়াছিলেন। সেবাশ্রমের কর্ম্মী এক স্বামীজী প্রায় ছুটিতে ছুটিতে আসিলেন, উদ্দেশ্য রোগীকে সেবাশ্রমের আরোগ্য-শালায় স্থানান্তরিত করা। কিন্তু আসিয়া দেখিলেন—আর দেরী নাই, সময় উপস্থিত।

স্বামীজী তাড়াতাড়ি রোগীর হাতখানি নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন এবং নাড়ী পরীক্ষা করিতে গিয়া নাড়ীর সন্ধান পাইলেন না।

বৃদ্ধের জ্ঞান তখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। কোটরগত চক্ষু দুইটি স্বামীজীর মুখের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া মুমূর্ষু বলিলেন—আমার বড় পুণ্য স্বামীজী যে, এ জগৎ থেকে বিদায় নেবার আগে আপনার মত দেবতার সাক্ষাৎ পেলাম। আমার জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ফলে আজ এই প্রয়াগধামের কুম্ভযোগে এই তীর্থমৃত্যু……শুধু এই আমার 'মা'-টির জন্যে যা দুঃখ স্বামীজী…মরণকালে একটি ভিক্ষা আমায় দেবেন সন্ন্যাসী ?

বৃদ্ধের কথা জড়াইয়া আসিয়াছে।

স্বামীজী মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিলেন—কি ? বলুন !…

বৃদ্ধ আর চোখের দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলেন না। জড়িত স্বরে বলিলেন —আমার মেয়েটীকে আপনাকে ক'লকাতা পর্য্যন্ত পৌছে……

মৃত্যু-পথ-যাত্রীর আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মুহূর্ত্তপরেই সাবিত্রীর কোলে মাথা রাখিয়া বৃদ্ধ চিরদিনের মত চক্ষু মুদিলেন। মৃত্যু তাঁর সর্ব্বাঙ্গে শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দিল।

সাবিত্রী না পারিল চিৎকার করিয়া কাঁদিতে—না পারিল কাহাকেও কিছু বলিতে। আচার্য্যের মৃত-দেহের উপর ডানহাতখানি রাখিয়া পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় সে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। কি হইয়া গেল এবং এখনই বা কি হইবে—এই কথাটিই কিছুতেই সে ভাবিতে পারিল না।

স্বামীজীও কি করিবেন—কি বলিবেন—কি করিয়া ঐ মেয়েটির চোখের উপর তাহার পিতার নিদারুণ শেষকৃত্যে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইবেন—তাহাও ভাবিয়া পাইলেন না।

বাইশ

এলাহবাদ ষ্টেশন হইতে যাত্রীদের জন্য ক্রমাগত স্পেশ্যাল ট্রেণ ছাড়িতেছে।...

সাবিত্রী প্লাটফর্ম্মে বসিয়া ছিল। স্বামীজী টিকিট কিনিয়া লইয়া আসিলেন। তারপর সাবিত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—আসুন!

সাবিত্রী অন্যমনস্কভাবে বসিয়াছিল। শুধু যে সে আচার্য্যের আকস্মিক মৃত্যু এবং তাঁহার অন্তিম সময়ের কথাগুলিই শুধু ভাবিতেছিল, তাহা নয় —স্বামীজীর চিন্তাও তাহার মনের অনেকখানি জুড়িয়া বসিয়াছিল।...

কি অদ্ভুত মানুষ! .....কত উঁচু হইয়াও সর্ব্বদা কত নীচু! এই সুদূর বিদেশে একান্ত স্বজনের মত কি ভয়ঙ্কর বিপদ হইতেই না উদ্ধার করিলেন!

কিন্তু সে কথা যাক্। আচার্য্যের মৃত্যু সময় হইতে ষ্টেশনে আসা পর্য্যন্ত যতবারই সে স্বামীজীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছে, ততবারই সে যেন চমকিয়া উঠিয়াছে। দুশ্ছেদ্য যবনিকা ভেদ করিয়া তাহার মনশ্চক্ষুর উপর কেবলই ভাসিয়া উঠিয়াছে, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার বিস্মৃত-প্রায় একখানি মুখ।......

সাবিত্রী কেবলই ভাবিতে লাগিল—কত মানুষের সহিত কত

মানুষেরই ত চেহারার সাদৃশ্য থাকে—কিন্তু এমনটি? এমন হুবহু? আশ্চর্য্য……চিবুকের নীচেকার সেই তিলটি পর্য্যন্ত।……

যতবারই সে তাহার স্বামীর বিস্মৃত-প্রায় মুখখানি চিন্তা করিয়া স্পষ্টভাবে মনের মধ্যে পাইতে চেষ্টা করে, ততবারই কেমন যেন ঘুলাইয়া যাইতে থাকে। অবশেষে স্বামীর মুখের পরিবর্ত্তে স্বামীজীর মুখখানিই সাবিত্রীর মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

স্বামীজীর আহ্বানে সাবিত্রী আবার চমকিয়া উঠিল এবং নীরবে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া সজলচোখে একখানি সেকেণ্ড্ ক্লাস্ কামরায় গিয়া উঠিল।

স্বামীজী বলিলেন—সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিটই ক'রতে হ'ল! কি ক'রব—থার্ড ক্লাস্ এর কথা বাদই দিলাম—ইন্টারেও যা ভিড়—ঢোকে কার সাধ্য!……এটা হাওড়া স্পেশ্যাল—সুবিধেই হবে। ভোর নাগাদ হাওড়ায় পৌঁছুনো যাবে।

তারপর বেঞ্চের কোণে একখানা গদীমোড়া চেয়ারে বসিয়া বলিলেন—ভেবেছিলাম—কলকাতার যাত্রী কোন বাঙ্গালী পরিবারের সঙ্গে আপনাকে পাঠিয়ে দেবো—কিন্তু আপনার বাবার অন্তিম অনুরোধে……আমাকেই যেতে হ'ল।…

সাবিত্রী বেঞ্চের এক কোণে বসিয়া পড়িয়া অন্যদিকে অকারণে তকাইয়া রহিল। স্বামীজীর মুখের দিকে তাকাইতেও যেন আর তাহার সাহস হইতেছিল না।

স্বামীজী পুনরায় বলিলেন—আপনার যদি এখানে অসুবিধে হয়—'মেল'এও যেতে পারেন। তবে সেটায়ও ভীড় দেখলাম খুবই।

সাবিত্রী এবারও কোন কথা বলিল না। স্বামীজী লক্ষ্য করিলেন—সহযাত্রিণীর চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে এবং উদ্গত অশ্রু চোখের কোণে টলমল করিতেছে। ভাবিলেন—সদ্য পিতৃ-বিয়োগে—এ অশ্রুজল ত একান্তই স্বাভাবিক।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ওদিক্‌কার বেঞ্চে দুইজন হিন্দুস্থানী; একজন সাধুর সহিত এক পরমাসুন্দরী বাঙ্গালী রমণীকে দেখিয়া কিছুক্ষণ মুখ চাওয়া-চাওয়ী করিয়া অবশেষে তাহারা নিরাশ হইয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছে। গাড়ী উল্কাবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

এতক্ষণ স্বামীজী ততটা লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু এত কাছাকাছি থাকিয়া পরপর কয়েকবার সহযাত্রিণীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হঠাৎ তিনিও যেন কেমন সচকিত হইয়া উঠিলেন। মনে পড়িল—একদিন এই অতি-সুন্দর মুখখানির মতই একখানি মুখ তাহার জীবনে অতি-পরিচিত—একান্ত আপনার ছিল।······কি আশ্চর্য! চেহারার সঙ্গে চেহারার কি অদ্ভুত মিল! এমনটিও হয়?

আরও বার দুই চকিত অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলিয়া সাবিত্রীকে পরিপূর্ণভাবে দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন—একটা কত বড় ভুল যে হ'য়ে গেল ভেবে দেখুন! বুদ্ধি ক'রে যদি একটা 'তার' ক'রে দিতাম আপনাদের বাড়ীতে কিংবা আপনার স্বামীকে—তা হ'লে আপনাকে তাঁরা নিয়ে যেতে পারতেন হাওড়া ষ্টেশন থেকে। সেই কিন্তু ভাল ছিল!—কারণ আপনার বাবা নেই—এক্ষেত্রে আপনাদের বাড়ীতে গিয়া উঠবার সঙ্গে সঙ্গে একটা যে কান্নাকাটি অশান্তির সৃষ্টি হবে—তার ভেতর আমার আর গিয়ে দাঁড়াবার ইচ্ছে নেই।

সাবিত্রী এবারও কথা বলিতে পারিল না। বলিবার মত কিছুই ছিল না। সে কেবলই ভাবিতে লাগিল—কথা বলিবার সেই ধরণটি —সেই গলার স্বর—সেই চোখের চাউনী……উঃ, জগদীশ্বর!…এ যদি স্বপ্নও হয়—সে স্বপ্ন যেন আর না ভাঙ্গে!—তাহার দৃঢ় ধারণা জন্মিল—হয়ত ইনিই তাহার স্বামী…সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন……

স্বামীজী ম্লানমুখে বসিয়া রহিলেন এবং কিছুক্ষণের জন্য তাহার মন অতীতের সেই হারাণোদিনের রত্নগুলি বৃথাই খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিজেই যেন নিজের মনকে শাসাইয়া মনে মনে বলিলেন—অতীত, অতীতের ভেতর ডুবে গেছে—ডুবে যাক্। সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে আজ একটি পরের স্ত্রীকে নিয়ে অনর্থক মনের ভেতর কাব্য-সৃষ্টি ক'রে নিয়ে লাভ?……

কিন্তু মনের ধর্ম্মই এই, সব সময়ে সে শাশন মানিতে চায় না।… …অতীতের সেই সুখ-দুঃখময় দিনগুলির কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন যে তাঁহার চোখ দু'টি অশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছে—স্বামীজী তাহা টের পান নাই।…যতবারই তিনি সাবিত্রীর মুখখানি মনে আনিতে চেষ্টা করেন—ততবারই সেই মুখখানির পরিবর্ত্তে ভাসিয়া উঠে এই সহযাত্রিণীরই মুখ!…

গাড়ী চলিয়াছে—হু হু শব্দে সব কিছুকেই পিছনে ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে।… চলন্ত গাড়ীর গায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া বাতাস যেন গুমরিয়া মরিতেছে।…বহুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া অলক্ষ্যে চোখ মুছিয়া স্বামীজী সহযাত্রিণীর দিকে চকিতে মুখ ফিরাইলেন, দেখিলেন—তিনিও তাহারই দিকে অপলক চোখে তাকাইয়া রহিয়াছেন।

সাবিত্রী মুখ ফিরাইয়া লইল।

স্বামীজীর মনের মধ্যে একটা প্রবল ঝড় বহিয়া সব কিছুই যেন ওলট-পালট করিয়া ফিরিতেছিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সাবিত্রীকে বলিলেন—দেখুন, একটি কথা ব'লব? অপরাধ নেবেন না ত?…

সাবিত্রীর বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল……কি যেন বলিবেন?…গলার স্বর পরিষ্কার করিয়া বলিল—বলুন, আপনার কথায় অপরাধের কোন প্রশ্নই আসতে পারে না।

স্বামীজী বলিলেন—আচ্ছা, এ সংসারে মানুষের মত মানুষও কি থাকে?……

ঠিক এই প্রশ্নটি শুনিবার জন্যই যেন সাবিত্রীর সমস্ত ইন্দ্রিয় উন্মুখ হইয়াছিল। নিরুদ্ধ নিশ্বাসে আরক্ত-মুখে সমস্ত চেতনাকে আয়ত্তের মধ্যে অতি কষ্টে আনিয়া সাবিত্রী বলিল—কখনও কখনও সে রকম দেখা যায় বৈ কি—কিন্তু কেন বলুন ত?

স্বামীজী বলিলেন—সদ্য শোক পেয়েছেন আপনি—মন আপনার অত্যন্ত বিষণ্ণ শোকাচ্ছন্ন—এক্ষেত্রে একটু কাব্যের মতনই শোনাবে—বিশেষ আমার মত একজন সংসারত্যাগী সেবাধর্ম্ম-অবলম্বী সন্ন্যাসীর মুখ থেকে, অথচ আপনাকে না ব'লতে পারলেও যেন ভাল লাগছে না! যদিও আজ আমি এমন এক সম্প্রদায়ের কর্ম্মী—যাঁরা সংসার ত্যাগী, বিবাহ করেন না—কিন্তু আমিও একদিন অগ্নি, ব্রাহ্মণ, নারায়ণ সাক্ষী ক'রে একটি মেয়েকে গ্রহণ ক'রেছিলাম—আর…

কি বলিতে গিয়া স্বামীজী চুপ করিলেন।

তারপর বলিলেন—আর তারই জন্যে আমার জীবনের ধারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে।…ছিলাম মুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়—আজ আমি স্বামী হেমানন্দ।

সাবিত্রীর মুখখানা মুহূর্ত্তে জবা ফুলের মত লাল হইয়া উঠিল। চকিত

কাঁপিতে লাগিল।···হায়, যে স্বামীকে পাইবার জন্য এই দীর্ঘ পাঁচটি বৎসরের প্রতিটি মুহূর্ত্ত তাহার দেহমনপ্রাণ উন্মুখ হইয়া ছুটাছুটি করিয়াছে—আজ তাঁহারই আশ্রয়ে তাঁহারই সম্মুখে রেলগাড়ীর একই কক্ষে সে বসিয়া। অদৃষ্টের কি অদ্ভুত খেলা !···

সাবিত্রী নিজেকে প্রাণপণ শক্তিতে সংযত করিয়া ঔৎসুক্যভরে বলিল—তিনি কি······

আর্দ্র কণ্ঠে স্বামীজী বলিলেন—তাকে আমি হারিয়েছি। বিয়ের পর দিন ছিল কালরাত্রি। সেই রাত্রে ক'লকাতা ফিরছিলাম তাকে নিয়ে। মেয়েদের গাড়ী থেকে তাকে মিথ্যে কথায় ফুস্‌লিয়ে দমদম ষ্টেশনে নামিয়ে নিয়ে যায় আমারই পরিচিত এক জমিদারের অনুচররা। তারপর সে যে কোথায়—বেঁচে আছে কি নেই—তা আজও জানি না।······সব কথা আপনাকে বলতে গেলে সে এক রীতিমত উপন্যাস হ'য়ে দাঁড়াবে—কিন্তু আশ্চর্য্য এইটেই দেখুন যে, আপনি যদি কৌতুক ক'রেও হঠাৎ ব[illegible]সেন—আমিই সেই সাবিত্রী—তা হলেও আমার অবিশ্বাস ক'রবার [illegible] থাকবে না—এমনিই সাদৃশ্য তার সঙ্গে আপনার চেহারার, অবশ্য আমার এ ধৃষ্টতার জন্যে আপনি আমায় ক্ষমা ক'রবেন।

এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইয়া সাবিত্রী বলিল—আচ্ছা, তাঁর সন্ধান ক'রলেন না কেন ?···

স্বামীজীর মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন—সব কথা ব'লতে গেলে সে একখানা পাঁচালী হ'য়ে দাঁড়াবে—অদৃষ্টেরই পাঁচালী ব'লতে হবে। সেই কালরাত্রি ত প্রভাত হ'ল—আমিও শিয়ালদা ষ্টেশনে নেমে আবিষ্কার ক'রলাম—গাড়ীর ভেতর আমার স্ত্রী নেই। তারপর একজন মহিলা যাত্রীর মধ্যে জানলাম—[illegible]

অবস্থা কি? পাগলের মত ছুটলাম দমদম যাবো বলে একটা মটোর ধরতে। কিন্তু এমনই গ্রহের ফের যে, সে চেষ্টাটুকুও ভগবান আমায় আর ক'রতে দিলেন না, একখানা মোটর হুঁস্ ক'রে এসেই আমায় রাস্তার ওপর চাপা দিলে। তারপর যে কি হ'ল মনে নেই। জ্ঞান হ'ল কবে—তাও জানি না। ছ'মাস বাদে হাসপাতাল থেকে বেরুলাম এক নতুন মানুষ হয়ে।···

সাবিত্রীর মুখের দিকে হঠাৎ দৃষ্টিপাত করিয়াই অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত স্বামীজী বলিলেন—ও কি? আপনি ওরকম ক'রছেন কেন? শরীর কি ভাল বোধ হচ্ছে না?···

—ও এমনি, বলুন তারপর—বড্ড ইচ্ছে ক'রছে শুনতে।

—তারপরের তিনটি মাসে যে কত ঝড় ঝাপটা ব'য়ে গেল এই শরীরের ওপর দিয়ে, সে কথা আর ভেঙ্গে কি ব'লব!···সব চেয়ে বেশী কষ্ট পেলাম পয়সাকড়ির। এত চেষ্টা চরিত্র করেও একটা সামান্য চাকরীও জোটাতে পারলাম না। এই তিনটে মাস বৃথাই ঘুরলাম সাবিত্রীর সন্ধান ক'রে, কিন্তু কোন সন্ধানই পেলাম না হতভাগিনীর। তখন নিজের জীবনের ওপরই একটা মহাধিক্কার জন্মে গেল। ভাবলাম আত্ম-হত্যা ক'রব কিন্তু তাও পারলাম না। অদৃষ্ট-চক্রে গিয়ে প'ড়লাম এক বেশ্যার আশ্রয়ে। কত বড় পরিবর্ত্তন যে এল আমার জীবনে—কোথায় ছিলাম আর কোথায় নেমে পড়লাম।···জালিয়াতী জুয়া আর গুণ্ডামীতে সাকরেদদের সঙ্গে ছ' মাসেই দিব্যি হাত পাকিয়ে নিলাম। তখন কি মনে হত না—কোথা থেকে কোথায় নেমে এসেছি। মনে হ'ত এই জীবনই বোধ হয় ভাল।···দুটো বছর দেখ্‌তে দেখতে চলে গেল।

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সাবিত্রী নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।···দিন

স্বামীজী বলিতে লাগিলেন—তারপর একদিন আর এক পরীক্ষা এসে দাঁড়াল আমার সুমুখে। সব সংবাদ রাখার জন্যে আড্ডায় একখানি খবরের কাগজ নেওয়া হ'ত। একদিন দেখি তাতে বেরিয়েছে, "ভাই মুকুন্দ, আমি মৃত্যু-শয্যায়—যেখানেই থাক একবার এস। শোভেন্দ্র রায় (শ্রীনগর)।"

প'ড়েই ত আমার মাথার রক্ত গরম হ'য়ে উঠল ; এইই ত আমার সমস্ত দুর্ভাগ্যের মূল। হঠাৎ এ আহ্বানের নতুন কোন উদ্দেশ্যও হয়ত থাকতে পারে। যাই হোক, সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে কতদিন পরে আবার একদিন শ্রীনগরের জমিদারদের ক'লকাতার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'লাম। ছেলেবেলায় মা-বাবাকে হারিয়ে এদেরই আশ্রয়ে এক-দিন মানুষ হ'য়েছিলাম।··· তারপর আমলারা ত আমাকে দেখেই শুষ্ক মুখে—আরে মুকুন্দ যে—ব'লে উপরে নিয়ে গেল।···ওপরে গিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম, তাতে আমার মত পাষণ্ড'র হৃদয়ও গলে গেল। শোভেন্দ্রের থাইসীস্—একেবারে শেষ অবস্থা—এখন-তখন। দেখে চিনবারও উপায় নেই। আমায় দেখে চিনল, ব'লল—এসেছ মুকুন্দ ?······তুমি আসবে আমি জানতাম। তারপর ব'ললে—শেষ সময়টায় ক্ষমা চেয়ে আর তোমাকে অপমান ক'রতে চাইনা মুকুন্দ। বাবা তোমাকে ছেলের মতই মানুষ ক'রেছিলেন। একটা উইল ক'রে গেলাম। সিকি সম্পত্তি তোমার নামেই লিখে দিয়েছি। আর একটি অনুরোধ তোমাকে, শিয়রে যাকে বসা দেখছ—ও তোমার বৌদি। কিছুদিন আগে মাত্র আমাদের বিয়ে হ'য়েছে। ভেবেছিলাম এবার ভাল হ'য়ে ঘর-সংসার ক'রব—কিন্তু ভগবান সে সুযোগ আর আমায় দিলেন না। আমি জানি—তোমার